শারদীয়া সংখ্যা

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"



আশ্বিন ১৩৯৭ ৯২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা



বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে। ... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, চেরাপুঞ্জি

শেলায় দুর্গাপূজা

মেঘালয় রাজ্যে খাসি পাহাড়ের দক্ষিণ পাদদেশে পার্বত্য শেলা নদীর তীরে অবস্থিত শেলা গ্রামের নৈসর্গিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। খাসি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে কমলালেবু, আনারস, কাঁঠাল ও সুপারি বাগান দিয়ে ঘেরা এই গ্রামে অনেক শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত খাসিয়া পরিবার দীর্ঘকাল ধরে বাস করছেন। দেশ বিভাগের আগে এই গ্রামের লোকেরা পড়াশুনা ও ব্যবসা ব্যপদেশে শ্রীহট্ট, ঢাকা ও কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আজও এই গ্রামের বাৎসরিক চণ্ডীপূজা ও মেলায় উপজাতি সম্প্রদায়ের অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ দূরবর্তী গ্রামগুলি থেকে এসে অংশ নেন। হিন্দুদের বিবিধ পূজাপার্বণ গ্রামবাসীর অনেকেই স্বগৃহে উদ্‌যাপন করেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী স্বামী প্রভানন্দজী (কেতকী মহারাজ) ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে শেলায় এসে স্কুল ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে চেরাপুঞ্জিতে এবং ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে শিলং-এ তিনি আশ্রম স্থাপন করেন। কেতকী মহারাজের ত্যাগ ও সেবার কাহিনী খাসি পাহাড়ে কিংবদন্তি হয়ে আছে। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় শেলা গ্রামের কয়েকজন ভক্ত বেলুড় মঠে গিয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কৃপালাভে ধন্য হন। পরবর্তী কালে এই গ্রামের অনেকেই পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দজী, বিরজানন্দজী, শঙ্করানন্দজী, বিশুদ্ধানন্দজী, মাধবানন্দজী ও বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কৃপালাভে ধন্য হয়েছেন।

শেলাগ্রামের অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষই সেকালে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা দেখার জন্য সমীপবর্তী শ্রীহট্ট শহরে যেতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক সময় তাঁরা হিন্দু হোটেলে স্থান না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে অন্য হোটেলে থেকে দুর্গাপূজা দেখতেন। শেলবাসী হিন্দু উপজাতি সম্প্রদায়ের এই দুঃখ নিরসনকল্পে স্বামী প্রভানন্দজী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে শেলা আশ্রমে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। বলা বাহুল্য আবালবৃদ্ধবনিতা গ্রামবাসী সকলেই অধীর আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে এই পূজাকে অভিনন্দন জানায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আশ্রমগুলির মধ্যে শেলা আশ্রমেই প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ উদ্‌যাপিত এই পূজায় একদিকে যেমন শেলা গ্রামের উপজাতি ভক্তেরা পরম্পরায় আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রেখেছেন, অপরদিকে তেমন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক সুবিদিত সন্ন্যাসীও বিভিন্ন সময়ে এই পূজায় উপস্থিত থেকেছেন। এককথায় বলতে গেলে বর্তমান চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের স্থায়ী উপকেন্দ্র শেলা আশ্রমের শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও কালীপূজা উপলক্ষে তটিন তটে বনানী বেষ্টিত পার্বত্যগ্রাম শেলা যেন আনন্দে মেতে ওঠে। প্রবাসী গ্রামবাসীরা প্রায় সকলেই এই কয়দিনের জন্য গ্রামে ফিরে আসেন। ভজন, সংগীত, পৌরাণিক অভিনয়, আতসবাজী ও দীপাবলীতে আশ্রমের সাথে সাথে সমস্ত গ্রামও উদ্বেল হয়ে ওঠে। দূর ও সমীপবর্তী গ্রামগুলি থেকে নতুন পোশাকে বহু উপজাতি ভক্তের এই কয়দিন আশ্রমে আনাগোনায় পার্বত্য গ্রামগুলির পথঘাট মুখর হয়ে ওঠে। ভোগ-রাগ, নৈবেদ্য, উপকরণ প্রভৃতি সকল আয়োজনই খাসি ভক্তেরা নিজেরাই করেন। ⁄বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় শেলা নদীতে খাসি ভক্তদের প্রতিমা নিরঞ্জন সত্যই দর্শনীয়। শেলা আশ্রমের দুর্গাপূজা একটি অতুলনীয় অনুষ্ঠান যা ধর্মপ্রাণ দেশবাসী সকলের একান্ত সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ সহানুভূতি দাবি করতে পারে।

চেরাপুঞ্জি, মেঘালয়
৩১ আগস্ট, ১৯৯০

স্বামী সুমেধানন্দ
সম্পাদক

সূচীপত্র ॥ উদ্বোধন ৯২তম বর্ষ আশ্বিন

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০-০০৩ হইতে প্রকাশিত
প্রচ্ছদ অলংকরণ ও মুদ্রণঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য □ ছত্রিশ টাকা □ সডাক □ বিয়াল্লিশ টাকা □ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) □ এক হাজার টাকা
প্রতি সংখ্যা □ পাঁচ টাকা আশ্বিন সংখ্যা □ চল্লিশ টাকা

প্রচ্ছদ ☐ **মহিষাসুরমর্দিনী** ☐ **শিল্পী** ☐ **গণেশ হালুই**



কুমারটুলির জনৈক পটুয়া কতৃক অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র

সপরিবারে মহিষাসুরমর্দিনী

কবিরাজ ৺কালীভূষণ সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত

উদ্বোধন

আশ্বিন, ১৩৯৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ ৯২তম বর্ষ—৯ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি (দ্ধ) তরসে নমঃ॥

আমি সেই বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক পরিদৃষ্টা অগ্নিবর্ণা, স্বীয় তাপে অর্থাৎ তেজে শত্রুদগ্ধকারিণী, কর্মফলদাত্রী দুর্গাদেবীর শরণাগত হই। হে সুতারিণি, হে সংসার-ত্রাণকারিণি দেবি, আমি তোমাকে প্রণাম করি। **কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় মহানারায়ণ উপনিষদ্ (২।২)**

কথাপ্রসঙ্গে

সত্যের আপিহিত মুখ

মহিষাসুর ও মহিষাসুরমর্দিনীর উপাখ্যান পৌরাণিক উপাখ্যান। মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, বরাহ-পুরাণ, বামন-পুরাণ, কালিকা-পুরাণ এবং দেবীভাগবতে বলা হইয়াছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রমুখ সকল দেবতার দেহজাত তেজঃরাশি সম্মিলিত হইয়া মহিষাসুর-বিনাশের নিমিত্ত মহিষাসুরমর্দিনী বা মহিষ-মর্দিনীর আবির্ভাব সংঘটিত করিয়াছিল। তবে এই সুবিখ্যাত উপাখ্যানের সুপ্রসিদ্ধ আকরগ্রন্থ হইল 'চণ্ডী' যাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত তেরটি (৮১—৯৩) অধ্যায়। 'দেবীমাহাত্ম্য' এবং 'দুর্গাসপ্তসতী' নামেও চণ্ডী সুপরিচিত। চণ্ডীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনায় দেখি মেধা ঋষি রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যকে বলিতেছেনঃ

দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে॥

—পুরাকালে যখন মহিষাসুর অসুরগণের এবং পুরন্দর অর্থাৎ ইন্দ্র দেবগণের অধীশ্বর ছিলেন, তখন দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে পূর্ণ একশত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল।

তত্রাসুরৈর্মহাবীর্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ॥

—সেই যুদ্ধে মহাপরাক্রান্ত অসুরগণ দেবসৈন্যকে পরাজিত করেন এবং সমস্ত দেবতাকে পরাজিত করিয়া মহিষাসুর ইন্দ্রত্ব লাভ করেন অর্থাৎ স্বর্গের অধিপতি হন।

কে এই মহিষাসুর? মহিষাসুরের জন্ম-সম্পর্কে পুরাণাদিতে যে কাহিনী রহিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, মহিষীর গর্ভে তাঁহার জন্ম। চণ্ডীতে মহিষাসুরের জন্মকথা নাই। বরাহ-পুরাণ, কালিকা-পুরাণ, বামন-পুরাণ এবং দেবীভাগবতে মহিষাসুরের যে জন্মবৃত্তান্ত রহিয়াছে তাহা নিম্নরূপঃ

(১) আদি কল্পে সম্বৎসর নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম সুপার্শ্ব। সুপার্শ্বের পুত্রের নাম সিন্ধুদ্বীপ। ঋষির বংশে জন্ম

হইলেও সিন্ধুদ্বীপ ছিলেন অসুর। সিন্ধুদ্বীপের কন্যার নাম মাহিষ্মতী। তিনি ছিলেন দৈত্য বিপ্রচিত্তির অগ্রজা। [চণ্ডীতে (১১।৪৩—৪৪) দেবীর মুখে বিপ্রচিত্তির-বংশীয় দানবগণকে বধ করার অঙ্গীকার রহিয়াছে।] মাহিষ্মতী একদিন অম্বর নামে এক ঋষির আশ্রমে সখীগণ-সহ ভ্রমণ করিতে যান। আশ্রমের রমণীয় পরিবেশ দেখিয়া তাঁহার তথায় বাস করিবার সুতীব্র লোভ হয়। তিনি মহিষীর রূপ ধারণ করিয়া ঋষিকে ভয় দেখাইতে উপস্থিত হইলে ঋষি ধ্যাননেত্রে মাহিষ্মতীর প্রকৃত পরিচয় অবগত হন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন, পাপীয়সি! তুই যেমন মহিষীরূপে ধারণ করিয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছিস, তেমনই আমার অভিশাপে শতবর্ষ পর্যন্ত মহিষীরূপেই অবস্থান করিবি। অভিশাপ শুনিয়া মাহিষ্মতী আতঙ্কিত হইয়া ঋষির চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং শাপমুক্তির জন্য কাতর অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে ঋষির দয়া হইল। তিনি বলিলেন, মহিষীরূপে এক পুত্র প্রসবান্তর তাঁহার শাপমুক্তি ঘটিবে। মাহিষ্মতীর গর্ভেই মহিষাসুরের জন্ম হয়। (বরাহ-পুরাণ, ৯৫ অধ্যায়)

(২) রম্ভ নামে এক দৈত্য দীর্ঘকাল মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বরদান করিতে চাহিলে অপুত্রক রম্ভাসুর তাঁহার তিন জন্মে প্রবল পরাক্রান্ত এক পুত্রসন্তান লাভের বর প্রার্থনা করেন। মহাদেব রম্ভাসুরের প্রার্থনা অনুমোদন করেন। উপর্যুপরি তিন জন্মে (তিন কল্পে বা মন্বন্তরে) রম্ভাসুর রম্ভ নামেই জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রতি জন্মেই মহিষীর গর্ভে তাঁহার পুত্ররূপে মহিষাসুরের জন্ম হয় এবং দেবগণের তেজসম্ভূতা হইয়া দেবী আদ্যাশক্তি যথাক্রমে উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী এবং দুর্গা রূপে প্রতি কল্পে মহিষাসুরকে বধ করেন। (কালিকা-পুরাণ, ৬০ অধ্যায়)

(৩) রম্ভ ও করম্ভ নামে দুই প্রবল পরাক্রান্ত অপুত্রক অসুর ভ্রাতৃদ্বয় পুত্রলাভের জন্য বহুকাল ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব হারাইবার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি তপস্যারত করম্ভকে হত্যা করিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে রম্ভ ক্রোধ ও দুঃখে আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হইলে অগ্নি তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং রম্ভের কঠোর তপশ্চর্যার জন্য বরদান করিতে চাহিলেন। তখন রম্ভ অগ্নিদেবকে বলিলেনঃ 'আমার যেন ত্রিলোকবিজয়ী এক পুত্র জন্মায় এবং শক্তি ও তেজস্বিতায় সে যেন দেবতাদেরও অতিক্রম করে।' অগ্নি বলিলেনঃ 'তথাস্তু'। অতঃপর রম্ভাসুর এক সুন্দরী মহিষীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। সেই মহিষীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম হয়। (বামন-পুরাণ, ১৭শ অধ্যায়) মহিষাসুরের জন্ম সম্পর্কে প্রায় একই কাহিনী দেবীভাগবতেও পাওয়া যায়। (৫ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়)

অতঃপর মহিষমর্দিনীর জন্ম-প্রসঙ্গ।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহিষাসুর অপ্রতিরোধ্য পরাক্রম ও শক্তির অধিকারী হইয়া উঠেন। ক্রমে সমগ্র পৃথিবী তাঁহার করায়ত্ত হইল। অতঃপর তিনি স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া দেবতাদের পরাভূত ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিলেন। স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া মহিষাসুরের ক্ষমতাগর্ব গগনচুম্বী হইল। তাঁহার নির্যাতন ও অত্যাচারে বিতাড়িত দেবগণের নাভিশ্বাস উঠিল।

ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ॥
(চণ্ডী, ২।৪)

—অনন্তর পরাভূত দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া শিব ও বিষ্ণুর সমীপে যাইলেন।

মহিষাসুরের দৌরাত্ম্যে তাঁহারা যে দুর্দশা ও দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন শিব ও বিষ্ণুর নিকট তাহা বর্ণনা করিয়া দেবগণ প্রার্থনা জানাইলেন : "শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্ম বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্।" (চণ্ডী, ২।৮) —আমরা আপনাদের শরণাপন্ন হইয়াছি। এখন আপনারা দেবশত্রু মহিষাসুরের বিনাশের উপায় বিশেষভাবে চিন্তা করুন।

দেবতাদের কাতরোক্তি এবং মহিষাসুরের

অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া দুই পরম-দেবতা অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। চণ্ডীতে (২।৯-১২) অপূর্বভাবে ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছেঃ

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভূশ্চ ভ্রুকুটীকুটিলাননৌ॥
ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছতঃ॥
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্ত দিগন্তরম্॥

—[ব্রহ্মা প্রমুখ] দেবগণের মুখে এই প্রকার বাক্যসকল শুনিয়া মধুসূদন এবং মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সেই ক্রোধে তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভ্রুকুটিকুটিল হইয়া উঠিল (অর্থাৎ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল)।

অনন্তর অতি ক্রোধান্বিত বিষ্ণুর এবং পরে ব্রহ্মা ও শিবের মুখমণ্ডল হইতে মহাতেজ নিঃসৃত হইল।

ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতেও মহাতেজ নির্গত হইয়া একত্র মিলিত হইল।

সেই (সম্মিলিত সুবিপুল) দীপ্যমান তেজঃপুঞ্জকে সেখানে দিগন্তব্যাপী লেলিহান শিখাযুক্ত জ্বলন্ত পর্বতের মতো দেবতারা অবস্থিত দেখিলেন।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥
(চণ্ডী, ২।১৩)

—সকল দেবতার শরীর-নির্গত ত্রিলোকব্যাপী সেই অতুলনীয় তেজরাশি সংহত হইয়া ক্রমে একটি নারীমূর্তিতে রূপান্তরিত হইল।

সেই নারীই দুর্গা। মহিষাসুরের নিধনার্থে তাঁহার আবির্ভাব হইল। দেবগণ আপন আপন শ্রেষ্ঠ আয়ুধ দুর্গাকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর এক রোমহর্ষক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মহিষাসুর তাঁহার হস্তে নিহত হইলেন। বামন-পুরাণ (১৮ অধ্যায়), দেবী ভাগবত (৫।৮) এবং কালিকা-পুরাণে (৬০ অধ্যায়) মহিষমর্দিনীর আবির্ভাব সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি এইরূপই। তবে চণ্ডীর বর্ণনা কাব্যগুণ এবং ভাবগাম্ভীর্যে উৎকৃষ্টতর বলিয়া আমরা চণ্ডীর বর্ণনাই উল্লেখ করিলাম।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে মন্খম নামে এক প্রাচীন জাতির কাছে মহিষ অত্যন্ত পবিত্র পশুরূপে পরিগণিত হইত। স্থানীয় লোককাহিনী অনুসারে দেবী ভির্গো (দুর্গা?) ইহাদের জয় করিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের মহিষাসুর ও মহিষাসুরমর্দিনীর কোন সম্পর্ক রহিয়াছে কিনা গবেষকগণ ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

দেবীর এই আবির্ভাব কখন হইয়াছিল? পুরাণমতে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সত্যযুগের আদিতে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে তেজঃরূপে দেবী প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (কালিকা-পুরাণ, ৬০।৫৬, ৭৯) পরবর্তী শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে উক্ত তেজঃপুঞ্জ হইতে দেবী দুর্গামূর্তি ধারণ করেন এবং নবমী তিথিতে তিনি মহিষাসুরকে বধ করেন। (কালিকাপুরাণ, ৬০।৮০-৮১)

বিজ্ঞানের যুগে মানুষ এই কাহিনীকে অবাস্তব এবং কল্প-কাহিনী বলিয়া উড়াইয়া দিবে। বস্তুতঃ যেভাবে আমাদের পুরাণগুলিতে কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে ঐরূপ ঘটা আদৌ সম্ভব কিনা সেবিষয়ে যে-কেহই প্রশ্ন তুলিতে পারেন। প্রশ্ন উঠুক ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহাতে মহিষাসুর এবং মহিষাসুরমর্দিনীর জন্মকথা অলীক হইয়া যাইবে না। কারণ পুরাণ-কাহিনীগুলির প্রধান উদ্দেশ্যই হইল ঐতিহাসিক সত্যতা অপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকেই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা। প্রকৃতপক্ষে পুরাণকাহিনীগুলির মূল তাৎপর্য সেইখানেই। পুরাণগুলিতে সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কালিকা-পুরাণে (৬০।৪০-৪৩) রাম কর্তৃক রাবণবধ প্রসঙ্গে কথিত বক্তব্যটি এখানে স্মরণীয়।

পূরা কল্পে যথাবৃত্তং প্রতিকল্পং তথা তথা।
প্রবর্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ॥
প্রতিকল্পং ভবেদ্রামো রাবণশ্চাপি রাক্ষসঃ।
তথৈব জায়তে যুদ্ধং তথা ত্রিদশসঙ্গমঃ॥
এবং রামো সহস্রাণি রাবণানাং সহস্রশঃ।
ভাবিভব্যানি ভূতানি তথা দেবী প্রবর্ততে॥

—পূর্ব কল্পে যেমন ঘটিয়াছিল (দেবী কর্তৃক মহিষাসুর প্রভৃতি দানবগণকে নিধন), প্রতিকল্পেই সেইরূপ ঘটিয়া থাকে (যেমন ত্রেতাযুগে আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমীতে রামচন্দ্রের প্রার্থনায় দেবীর আবির্ভাব এবং নবমীতে তাঁহার আশীর্বাদে রাবণ-নিধন)। প্রতিকল্পেই দৈত্যগণের নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃত্তা হন এবং রাবণরূপী রাক্ষস ও রামও প্রতিকল্পে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রতিকল্পে উভয়ের ঐরূপ যুদ্ধ হয় এবং পূর্বের মতো দেবতাদিগের সঙ্গে রামচন্দ্রের মৈত্রী হয়।

এইরূপ হাজার হাজার রাম ও হাজার হাজার রাবণ পূর্বে হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে ; অতীত ও ভবিষ্যতে দেবীরও একইরূপ প্রবৃত্তি।

উপরি-উক্ত পুরাণ-প্রমাণ হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, মহিষাসুর ও মহিষাসুরমর্দিনীর সংগ্রাম এবং পরিশেষে মহিষাসুরমর্দিনী কর্তৃক মহিষাসুরের পরাভব প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরস্থিত দেবতা ও দানবের—শুভশক্তি ও অশুভশক্তির সংগ্রাম এবং পরিশেষে শুভশক্তির নিকট অশুভশক্তির পরাজয়ের প্রতীক। পুরাণের সংগ্রাম-কাহিনীর বাস্তবতা লইয়া অবশ্যই বিচার চলিতে পারে, কিন্তু আমাদের অন্তর্জগতে যে নিরন্তর শুভ ও অশুভের সংঘর্ষ চলিতেছে এবং সেই সংঘর্ষে আমরা প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হইতেছি তাহার বাস্তবতা আমরা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব? এই সংগ্রাম যেমন অনাদি, তেমনই ইহা অনন্তও। এবং এই সংগ্রাম পুরাণ-কথিত সংগ্রাম অপেক্ষা কঠিনতর। যতদিন সৃষ্টি রহিবে ততদিন মানুষের মধ্যে এই সংগ্রাম চলিতে থাকিবে।

পুরাণ-প্রমাণ অনুসারে মহিষাসুরের জন্মের পশ্চাতে তাঁহার অসুর জনক-জননীর অন্তরে ক্রিয়াশীল ছিল ভোগলিপ্সা, ইন্দ্রিয়-পরতা এবং ক্ষমতালোলুপতা। পক্ষান্তরে দেবতেজঃসম্ভূতা মহিষমর্দিনীর জন্মের পটভূমিতে ছিল সকল দেবতার জগৎ-কল্যাণেচ্ছা। সেই হেতু আমাদের পুরাণকারগণ আমাদের অন্তরস্থিত অশুভশক্তিকে পশুরূপে অর্থাৎ ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ভোগসর্বস্ব, ক্ষমতালোলুপ মহিষাসুররূপে এবং শুভশক্তিকে সকল দেবগণের অঙ্গ-নিঃসৃত তেজঃপুঞ্জের সাকার প্রকাশরূপে অর্থাৎ নিখিল দেবসত্তার সমষ্টিভূত বিগ্রহ দুর্গারূপে কল্পনা করিয়াছেন। উভয় শক্তিই মানুষের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যখন অশুভশক্তি কর্তৃক শুভশক্তি নির্জিত হয় (যেমন মহিষাসুর কর্তৃক স্বর্গস্থ দেবগণ হইয়াছিলেন), তখন ব্যক্তিজীবনে, পরিবারজীবনে, সমাজজীবনে এবং রাষ্ট্রজীবনে ঘোর অধঃপতন নামিয়া আসে ; যখন ইহার বিপরীতটি সংঘটিত হয় অর্থাৎ শুভশক্তি কর্তৃক অশুভশক্তির পরাভব হয় তখন সর্বত্র কল্যাণ ও মঙ্গল প্রবাহিত হয়।

এই সংগ্রাম অবশ্যই ক্লান্তিহীন ; কিন্তু সংগ্রাম না থাকিলে যে জীবনও অর্থহীন হইয়া যায়। তবে যাহাতে সেই সংগ্রামে মানুষ হতোদ্যম না হইয়া পড়ে, শুভের প্রকাশ ও প্রভাব সম্পর্কে আস্থা না হারাইয়া ফেলে তাই দেবী চণ্ডীতে (১১।৫৪-৫৫) নিজমুখে অঙ্গীকার করিয়াছেন :

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

—এইভাবে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাববশতঃ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে তখনই আমি আবির্ভূতা হইয়া দেবশত্রু বিনাশ করিব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, গীতাতেও (৪।৭-৮) ভগবানের স্বকণ্ঠে অনুরূপ অঙ্গীকার আমরা শুনিয়াছি। কুরুক্ষেত্র আসলে মানবের হৃদয়রূপে চিরন্তন রণক্ষেত্র এবং কৃষ্ণ নিখিল বিশ্বের সমষ্টিভূত শুভশক্তির প্রতীক। চণ্ডী ও গীতায় যে ঐশী অঙ্গীকার উচ্চারিত তাহা বস্তুতঃপক্ষে একই মুদ্রার উভয় পৃষ্ঠভূমিমাত্র। উভয়েই এক অদ্বয় সত্যের নিত্য উচ্চারণ। অর্থাৎ পুরাণ-কাহিনীর অন্তরালে অপিহিত অর্থাৎ নিহিত এক পরম গভীর সত্যের মুখ।

ভগবানলাভের উপায়

স্বামী ভূতেশানন্দ

ভক্তেরা প্রায়শঃই আমাদের প্রশ্ন করেন, জপ-ধ্যানে মন বসে না, কি করব? এই প্রশ্ন আমাদের অনেকেরই মনে ওঠে। তার উত্তরে আমরা বলি, মন এমন একটি যন্ত্র যে তাকে যেভাবে ব্যবহার করি সে সেইভাবেই কাজ করে। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরে জপধ্যানের চেষ্টা আমরা কতক্ষণ করি আর কতক্ষণই বা অন্য কাজে ব্যয় করি এটা ভাবতে হবে। মন সর্বদা যে-বিষয়ে চিন্তা করে জপধ্যানে বসলেও সেই বিষয়েরই ফুট উঠবে এটাই স্বাভাবিক। তাই জপধ্যান করতে বসলে ভগবানের কথা মনে আসে না, মন তাতে স্থির হয় না।

কিন্তু এর প্রতিকার কি? প্রতিকারের একটি সোজা উপায় হচ্ছে মনকে আরো কিছু বেশি সময় ভগবৎচিন্তায় নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মন কিরকম জান? যেন ধোপাঘরের কাপড়। তাকে যে রঙে ফেলে রাখবে সে সেই রঙে রঞ্জিত হয়ে যাবে। মনকে যদি বেশি সময় সাংসারিক চিন্তায় ফেলে রাখি ধ্যানজপের সময় সেই চিন্তাই চলবে। তাই উপায় হলো যত বেশি সম্ভব ঈশ্বর-চিন্তার অভ্যাস করা। ঠাকুর বলতেন যে, খানিকটা মন সবসময় তাঁর দিকে ফেলে রাখতে হয়। মনে যাতে স্থায়িভাবে ভগবানের চিন্তা চলতে থাকে তার চেষ্টা করতে হয়। আমাদের মনে হবে তাহলে সংসারের কাজ চলবে কি করে? ঠাকুর বলেছেন, "যদি চোদ্দ আনা মন ভগবানের কাছে রেখে দু-আনা দিয়ে সংসারের কাজ কর তো ভেসে যাবে।" কিন্তু আমরা তার ঠিক বিপরীতই করি। চোদ্দ আনা বা পনেরো আনা মন সংসারে ফেলে রাখি আর দুই-এক আনা দিয়ে তাঁর চিন্তা করতে চাই। কোন মূল্যবান বস্তুই সুলভে পাওয়া যায় না আর পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুকে অত সহজে কি পাওয়া যায়? সুতরাং তাঁর চিন্তা করতে হলে মনকে তাঁর দিকে সর্বক্ষণ না পারি, সবচেয়ে বেশি সময় লাগিয়ে রাখতে হবে। তাতে সংসারের কাজ ব্যাহত হবে না, বরং আরো সুষ্ঠুভাবে হবে। তাঁর দিকে মন রাখলে মনে স্বার্থপরতা আসবে না। আর কাজ যখন নিঃস্বার্থভাবে করা যাবে তখন কাজটি যথোচিত হবে। এইজন্য দরকার একটি আগ্রহী মন যা ভগবানের চিন্তা করতে চাইবে, তার জন্য চেষ্টা করবে এবং বলা বাহুল্য, সেই চেষ্টার মধ্যে সংসারের কাজও চলতে থাকবে। এটি অভ্যাস করতে হয়। কোন একসময় জপ করতে বসলাম, কিছুক্ষণ চেষ্টা করলাম, ভাল লাগল না উঠে পড়লাম। এতে কাজ হবে না। আসল কথা, তাঁর নামে রুচি হওয়া দরকার। কিন্তু রুচি কেমন করে হবে?

অরুচিকরকে রুচিকর করতে গেলে মনকে সেদিকে চালনার চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টা করতে করতে ক্রমে রুচি আসে। একজন ঠাকুরকে বলছেন, সংসারী লোকের কি কোন গতি নেই? 'সংসারী' বলতে যারা বিবাহ করে গৃহস্থ হয়েছে কেবল তারাই নয়, যারাই সংসার নিয়ে লিপ্ত তাদের কথা বলছি। ঠাকুর বলছেন, উপায় থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে। উপায় কি তাও বললেন—ঈশ্বরের নামগান করা, সাধুসঙ্গ করা, আর মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা। তাঁর নামগান করা মানে ধ্যান-জপ, পূজার্চনা করা, দেবস্থানে যাওয়া, দেবসেবার কাজ করা। সাধুসঙ্গ মানে যাঁরা ভগবানের চিন্তা করেন, তাঁকে ভালবাসেন, তাঁদের সঙ্গ করা। আবার সঙ্গ করা মানে তাঁদের কাছে গিয়ে বসে থাকা নয়, তাঁদের ভাব গ্রহণ করে, তাঁদের জীবনচর্যা অনুসরণ করা। না হলে সাধুসঙ্গ

হয় না। তৃতীয় উপায়, মাঝে মাঝে নির্জনবাস। সংসারে বাস করে অন্য চিন্তা করবার অবকাশ থাকে না। এইজন্য মাঝে মাঝে একটু নির্জন-বাস দরকার। আমরা অবকাশ পেলে হয়তো দার্জিলিং-এ যাই বা অন্য কোন দর্শনীয় জায়গা দেখতে যাই। আর যদি বা কখনো তীর্থে যাই তখন তীর্থের চিন্তা থাকে না, কোথায় ভাল জায়গায় থাকতে পারব, কোথায় ভাল জিনিস পাওয়া যাবে সেইসব চিন্তা নিয়েই সময়টা কেটে যায়। কাজেই তীর্থে গিয়েও ভগবানের চিন্তা হয় না। এইভাবে জীবনযাপন করলে ভগবানের দিকে যাবার প্রবৃত্তি বাড়বে না। এইজন্য ঠাকুর যা বলেছেন সেগুলি ভাবতে হবে।

প্রথমে যে বললেন, তাঁর নামগান মানে তাঁর চিন্তা, তাঁর পূজা—এগুলি ভক্তিলাভের উপায়। ঠাকুর একে বলেছেন বৈধী ভক্তি। এই বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান করতে করতে ক্রমশঃ তাঁর ওপর অনুরাগ আসে। ভাগবতে একটি শ্লোক আছে যে, "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা"—ভক্তির দ্বারা ভক্তি উৎপন্ন হয়। বৈধী ভক্তির দ্বারা রাগাত্মিকা ভক্তি—অর্থাৎ ঈশ্বরে অনুরাগ আসে এবং তার ফলে শরীরে ভক্তির চিহ্ন—পুলক, রোমাঞ্চাদি প্রকাশ পায়। বৈধী ভক্তির দ্বারা তাঁর উপর ভালবাসা আসা, এটি যেন পুতুলখেলার মতো। ছোট মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলা করে, পুতুলগুলির কেউ ছেলে হয়, কেউ মেয়ে হয়, নানা সম্বন্ধ। তাদের খাওয়ায়, পরায়, শোয়ায়, আবার পুতুল যদি ভেঙে যায় তাহলে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। খেলতে খেলতে তাদের পুতুলের ওপর ভালবাসা আসে। আমাদের পূজা-অর্চনাও ভগবানকে নিয়ে পুতুলখেলা। তাঁকে জীবন্ত বলে আপনার বোধ তখনো হয়নি, কিন্তু এইভাবে চেষ্টা করতে করতে ক্রমশঃ সে-বোধ আসে। এইভাবে বৈধী ভক্তি থেকে রাগাত্মিকা ভক্তি আসে।

ঠাকুর বলেছেন, অনুরাগ এলে আর চিন্তা নেই। অনুরাগ বাঘ কামক্রোধাদি খেয়ে ফেলে। অর্থাৎ অনুরাগের ফলে ভগবানের পথে যাওয়ার অন্তরায়গুলি অপসারিত হবে। আমরা বলি সংসারে প্রবল বাধা। প্রবল বাধা সংসারে নয়, মনে। মনে অনুরাগের সঞ্চার হলে কোন বাধাই আর প্রতিরোধ করতে পারে না। অনুরাগ নেই বলেই বাধা। ভাগবতে আছে, গোপীরা গৃহকাজে ব্যস্ত, এমন সময় অরণ্যের ভিতর থেকে বংশীধ্বনি শোনা গেল। ভগবানের আহ্বান অমোঘ। গোপীরা যে যা কাজ করছিলেন সব ফেলে রেখে চললেন। তাঁর আহ্বান এসেছে ঘরের কাজে আর মন নেই। কেন ? না, মনটা তাঁর দিকে চলে গিয়েছে।

এই অনুরাগ আসবে কি করে ? না, বিধি-পূর্বক তাঁর সেবা, শুদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে করতে অনুরাগ এলে তখন সংসারের কোন বাধা আর আটকাতে পারে না। যেমন গৃহকর্ম গোপীদের আটকাতে পারেনি। ভাগবতে আরও আছে, একজন গোপীকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ভগবানের আহ্বান এসেছে, সে যেতে পারছে না। সে ভাবল, আমার যাবার পথে অন্তরায় কি ? এই দেহ। তখনই সে দেহত্যাগ করে ভগবানের কাছে চলে গেল। এমন আকর্ষণ যে শরীর পর্যন্ত তাকে বাধা দিতে পারল না। এরই নাম অনুরাগ। এই অনুরাগ এক কথায় হয় না, তাঁর চিন্তা করতে করতে হয়। গানে আছে ঃ

'এই হরিনাম নিতে নিতে
প্রেমের মুকুল ফুটবে চিতে।'

ভগবানের নাম, তাঁর চিন্তা করতে করতে, জীবনটা সেইভাবে পরিচালিত করবার চেষ্টা করতে করতে অনুরাগ আসে। যখন অনুরাগ এল, ঠাকুর বলছেন, তখন অরুণোদয় হলো। পূবের আকাশ লাল হলে বোঝা যায় সূর্য উঠতে আর দেরি নেই। ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা এলে কোন প্রতিবন্ধকই আর ভক্তকে আটকাতে পারে না। আমরা যে সংসারের প্রতিবন্ধকের কথা বলি তার কারণ আমাদের অনুরাগ নেই। মাস্টারমশায় বলছেন, পরিবার যদি ভগবানের দিকে যাবার পথে বাধা হয় তাহলে কি করব ? ঠাকুর বললেন, তাকে বোঝাবে, বুঝিয়ে তোমার ভাবে ভাবিত করবার চেষ্টা করবে। মাস্টারমশায় বলছেন, যদি কিছুতেই না মানে তাহলে কি

করব? ঠাকুর গম্ভীর হয়ে বললেন, তাহলে তাকে ত্যাগ করবে। মাস্টারমশায় স্তম্ভিত। একটা সহজ উপায় বলে দিলে হতো, কিন্তু এ যে একেবারে চরম উপায়। মাস্টারমশায় ভাবছেন, অতদূরে কি করে যাব? একটু পরে ঠাকুর আবার বললেন, দেখ, যে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয় তিনি তার সব অনুকূল করে দেন। মাস্টারমশায় লিখছেন, মাস্টারের চিন্তাগ্নিতে যেন জল পড়ল। তাহলে উপায় আছে। তাঁকে কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি সব প্রতিকূলতা দূর করে দেন, বাধাবিঘ্নগুলি সব অনুকূল হয়ে যায়। কাজেই আমরা যখন সংসারকে দোষারোপ করি তখন আত্মসমীক্ষা করি না, দেখি না যে দোষটা সংসারের নয়, নিজেদের। এসব কথা ভাবতে হয়, ভেবে নিজেকে তৈরি করতে হয়। জগৎটা তো বদলাবে না, যেমন আছে তেমনই থাকবে, দৃষ্টিকে বদলাতে হবে। ভগবানে অনুরাগ হলে দৃষ্টির পরিবর্তন হয়। এই হলো উপায়। এই উপায় অবলম্বন করলে ভগবানের কৃপালাভ বা তাঁর সাক্ষাৎকার সবই হয়। তিনি আমাদের অন্তরকে দৈবী-সম্পদে ভরে দেন যে সম্পদের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়। সবই ভিতরে আছে কিন্তু আমরা সেসব ভুলে অন্য কাজে ব্যস্ত, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নেই—ঠাকুরের ভাষায়, 'খপর' নেই।

উপনিষদের একটি কাহিনীতে আছে, অমূল্য সম্পদ মাটির নিচে পোঁতা আছে। একজন সেই মাটির ওপর দিয়েই যাতায়াত করে, কিন্তু সে-সম্পদ তার কোন কাজে লাগে না। কারণ সেই ধন সম্বন্ধে সে জানে না। জানলে, অবহিত হলে তা তার কাজে লাগত। আমাদের ভিতরেও ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু সংসারের দিকে মনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে সব চাপা পড়ে গিয়েছে। ছড়িয়ে যাওয়া মনকে গুটিয়ে নেওয়া খুব কঠিন। সে-চেষ্টা করার নামই সাধনা। যে-মন সংসারে ছড়িয়ে আছে ক্রমশঃ তাকে টেনে এনে ভগবানে স্থির করার প্রয়াসই সাধনা। এ হঠাৎ হবে না। উপনিষদে আছে, ধীরে ধীরে মনকে বিষয় থেকে বিরত করতে হবে। হঠাৎ হবে না, ধৈর্য ধরে করতে হবে। এর দ্বারা মন ক্রমশঃ ভগবানের দিকে যাবে। আর সেই সঙ্গে সে-পথে যাবার প্রেরণাও আসবে। যাওয়ার উপায় সম্বন্ধে ধারণা হবে।

একদিন উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে নবাগত এক ভক্ত স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে বলছেন, আমি সাধুসঙ্গ করতে এসেছি। তিনি তাঁকে বললেন, বাপু, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে কর্মচারীরা বছরের পর বছর থেকেছে। অথচ তাদের জীবনের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে দেখা যায় না। সুতরাং তুমি আজ এসে সাধুসঙ্গ করে তার ফলটি পকেটে করে নিয়ে যাবে, এরকম করে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধুসঙ্গ মানে কেবল সাধুর কাছে থাকা বা তাঁর কাছে যাওয়া নয়। তাঁকে আদর্শ বলে গ্রহণ করে তাঁর জীবনকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করা।

যাঁর কাছে গেলে ভগবদ্ভাবের স্ফুরণ হয় তিনিই সাধু। তিনি যেভাবে ভাবিত তাঁর সংস্পর্শে যারা আসে তাদের ভিতরেও সেই ভাব সংক্রামিত হয়। সেইজন্য সাধুসঙ্গ ফলপ্রসূ। সাধুরা সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত। তাঁদের দৃষ্টান্ত না থাকলে ভগবানের অস্তিত্বে মানুষের বিশ্বাসই হবে না। ভগবানকে আমরা দেখিনি, শুনিনি। পুঁথিতে লেখা থাকতে পারে, কিন্তু পুঁথির ভিতরে প্রাণ নেই। সেই ভাব আমাদের কাজে লাগে না। সাধুর জীবনে ভগবানের ভাব সজীব, স্পষ্ট। এইজন্য ঠাকুর সাধুসঙ্গ করতে বলেছেন।

তবে সেই প্রেরণা গ্রহণ করবার জন্য আকাঙ্ক্ষা চাই। সাধুকে অনুসরণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সাধুসঙ্গ না করলে সাধুসঙ্গ ফলপ্রদ হয় না। সাধুর কাছে গিয়ে বিনীতভাবে থেকে তাঁর জীবনের আদর্শের মধ্যে যে-শিক্ষা সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করবার চেষ্টার নাম সাধুসঙ্গ। সাধুর মধ্যে ভগবৎ ভাবটি মূর্ত। তাই তাঁর সঙ্গ পেলে সেই ভাব সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মায়, মনে প্রেরণা জাগে এবং তাঁকে অনুসরণ করবার ইচ্ছা হয়। একটি শ্লোকে আছে, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিষ্ণুর

পরমপদকে আকাশে বিস্ফারিত চোখের মতো সর্বদা দেখেন। একথার তাৎপর্য হলো এইরকম—একটি-আধটি লোককে কখনো যদি দেখতে পাই তাহলে তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পাব, মনে বিশ্বাস হবে যে, নিশ্চয়ই ভগবান আছেন। না হলে এই ব্যক্তিটির জীবন কেমন করে এইভাবে রূপায়িত হলো?

সাধু ভগবানকে নিয়ে আছেন তাতে আমার লাভ কি? আমার লাভ এই, তাঁকে দেখে আমার বিশ্বাস হবে যে, ভগবান আছেন, ভগবানকে ভাবলে আমার জীবনটা এঁর মতো পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। সাধু কি বলেন, কিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন ইত্যাদি দেখে সেই পথে চলার প্রেরণা ও নির্দেশ লাভ হয়। তাই সাধুসঙ্গ না হলে ভগবানে বিশ্বাস আসে না। বিশ্বাস আসা বড় কঠিন। যে-বস্তুকে কখনো দেখিনি, জানি না, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকবেই। কিন্তু কোন একজনের জীবনে তাঁর স্পষ্ট প্রকাশ যখন দেখি, ভগবানকে চিন্তা করলে জীবন কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় লক্ষ্য করি তখন মনে হয়, এই আদর্শ। যেমন বুদ্ধদেব জরা ব্যাধি মৃত্যু দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তারপর এর থেকে উদ্ধারের উপায় অনুসন্ধান করছেন, এমন সময় একজন সন্ন্যাসীকে দেখে প্রভাবিত হলেন। এই তো! দুঃখময় সংসারের ভিতরে থেকেও মানুষ এমন আনন্দময় হতে পারে। তখন তিনি সেই পথ অনুসরণ করে গৃহত্যাগ করলেন। সাধুসঙ্গের এই পরিণাম।

ঠাকুর তৃতীয় উপায় বলেছেন, মাঝে মাঝে নির্জনবাস। তাঁকে ভুলে থাকতে থাকতে আমাদের এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে, সংসারের স্বরূপ সম্বন্ধ আমাদের অনুভূতি নেই। ঠাকুর যেমন বলেছেন, কোন কোন মাছ জালে পড়ে কাদায় মুখ গুঁজে ভাবে বেশ আছি। জানে না জেলে এক্ষুণি তাকে হিড়হিড় করে ডাঙায় টেনে তুলবে, আর তার প্রাণ যাবে। এই হলো বদ্ধ জীব। তাই নির্জনে গিয়ে আমাদের ভাবতে হবে জীবনের উদ্দেশ্য কি? কিভাবে জীবন কাটাচ্ছি। মাঝে মাঝে সংসারের বাইরে না গেলে সংসারের নশ্বরত্ব অনুভব করার অবকাশ থাকে না। গীতায় ভগবান বলেছেন, "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥" (৯।৩৩)—এই জগৎ অনিত্য, দুঃখময়, এখানে এসে আমার ভজনা কর। আমাদের কি এই বোধ হয়েছে? প্রত্যহই দেখছি সব চলে যাচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে, কত লোক তাদের আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়ে দুঃখে হাহাকার করছে, আর আমি ভাবছি ওদের হয়েছে আমার হবে না। অনিত্য বোধ হচ্ছে না। সুখেও বোধ হচ্ছে না, দুঃখেও না। কাজেই নির্জনে গিয়ে জীবনের পাতাগুলিকে উল্টে উল্টে দেখে যদি তার অসারত্ব ভাবতে শিখি তখনই ঠিক ঠিক বুঝতে পারব জগৎ অনিত্য। সুতরাং এতে মন ফেলে রেখে আমরা পরমার্থ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছি। জগতের নশ্বরতা দুঃখময়ত্ব বোধ হলে জগৎ আমাদের মনকে আর আকৃষ্ট করতে পারবে না। এই নয় যে সকলেই সংসার ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু সংসারের প্রতি যে তীব্র আসক্তি ভগবানকে ভুলিয়ে রেখেছে এবং সংসারের ভয়াবহ রূপকে বুঝতে দিচ্ছে না—যেন গলিত শব ফুল দিয়ে ঢাকা রয়েছে—এটি বুঝলে তখন আর সংসারের প্রতি মনের টান আসবে না। তাহলে সংসার কি লোপ পেয়ে গেল? কোথায় লোপ পেল? সংসারের সারবস্তু যিনি তাঁর দিকে যখন মন যাবে তখনই আমাদের পথ হয়ে যায়। এইভাবে চেষ্টা করলে মন আর সংসারে ব্যাপৃত থাকতে পারবে না, তাঁর জন্য ছটফট করবে। এই তো ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা যখন আসবে তখন আর কেউ আমাদের সংসারের সুখভোগে আটকে রাখতে পারবে না, সেই হোমা পাখীর মতো আমরা চোঁচা তাঁর দিকে দৌড় দেব। তার আগে পর্যন্ত যাওয়াটা একটা পোশাকী চেষ্টা মাত্র, পোশাকী ধর্মে কাজ হবে না। ব্যাকুলতা এলে ঈশ্বরকেই সত্যবস্তু বলে মনে হয়। জাগতিক বিষয়কে তুচ্ছ বোধ করে ভগবানকে সারবস্তু বলে বোধ না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজ হবে না, গৃহস্থেরও নয়, সন্ন্যাসীরও নয়।*

* গত ১৩ নভেম্বর, ১৯৮৮ শিলং রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত ভাষণ।

প্রবন্ধ

দেবীসূক্তে মহাশক্তির আত্মপরিচয়

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী"—প্রতি বৎসর শরৎকালে একটি মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, বিশেষ করে আমাদের এই বঙ্গদেশে। এই মহাপূজা বঙ্গবাসীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। সারা বছর ধরে আমরা যেন এই উৎসবের প্রতীক্ষায় ও আয়োজনে ব্যাপৃত থাকি। আমাদের এই জাতীয় উৎসবই হলো দুর্গোৎসব।

কিন্তু কে এই দুর্গা ? কী তাঁর পরিচয় ? অনেকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করে বলেন, অনেক দুঃখে-কষ্টে বহুবিধ সাধনায় যাঁকে লাভ করা যায় বা প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনিই 'দুর্গা'—'দুঃখেন অষ্টাঙ্গযোগসর্বকর্ম-উপাসনারূপেণ ক্লেশেন গম্যতে প্রাপ্যতে সা দুর্গা।" এই দুর্গার দুর্গমত্ব বিঘোষিত হয়েছে এই বলে—"তাং দুর্গাং দুর্গমাং দেবীম্।" কেউ বলেন তিনি দুর্জ্ঞেয়া, অগমাস্বরূপা, তাই দুর্গা। আবার শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাঁকে "দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা" (চণ্ডী, ৪।১১)—অর্থাৎ এই দুর্গম ভবসাগরের পারে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন বা আশ্রয়রূপে নৌকা, এইভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। নৌকা তো স্বয়ং পার করতে পারে না, তাকে চালাবার জন্য একজন মাঝির দরকার হয় যে সেই নৌকাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু এ নৌকায় কোন মাঝির দরকার করে না, যার সঙ্গ বা সান্নিধ্যের ফলে নৌকা চলতে পারে। তার কারণ হলো এ "নৌঃ অসঙ্গা"—সঙ্গরহিতা, অদ্বিতীয়া, অন্য কিছুর সঙ্গেই তার সংসর্গ নেই, তার বাইরে দ্বিতীয় বলে অন্য কিছু নেই যার দ্বারা সে পরিচালিত হবে বা যার সঙ্গে সে সংযুক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত হবে। অদ্বিতীয়া এই দেবীর স্বরূপ তাই কে উদ্ঘাটন করবে ? কেমন করেই বা জানা যাবে "কা হি সা দেবী ?"—কে সেই দেবী ? একান্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, ঋগ্বেদের একটি সূক্তে আটটি ঋকে বা মন্ত্রে স্বয়ং তিনিই আত্ম-পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন যেটি 'বাক্‌সূক্ত' বা 'দেবীসূক্ত' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

বেদের মন্ত্রমালা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিক। দেবতা যখন দৃষ্টির বাইরে, তখন পরোক্ষভাবে প্রথম পুরুষে সে বা তিনি বলে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যেমন "স জনাস ইন্দ্রঃ", হে জনগণ, তিনিই হলেন ইন্দ্র। আবার এইভাবে পরোক্ষভাবে তাঁর স্তুতি করতে করতে কখনো বা সেই দেবতা প্রত্যক্ষভাবে যেন সামনে আবির্ভূত হন, তখন তাঁকে মধ্যম পুরুষে তুমি বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যেমন "ত্বম্ অগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি"—হে অগ্নি, তুমি আমাদের মঙ্গল করবে। আবার বিরল কোন কোন ক্ষেত্রে—এরকম সূক্ত বা ঋকের সংখ্যা খুবই কম—উপাস্য দেবতা উপাসকের সঙ্গে এক বা অভিন্ন হয়ে উত্তম পুরুষে আমি-রূপে নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তাই এই-জাতীয় সূক্তের নাম 'আধ্যাত্মিক' অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে তাদাত্ম্য বা সম্পূর্ণ অভিন্নতা উপলব্ধি করে সেখানে সবকিছু বলা হয়েছে। বক্তব্যের বিষয় সেখানে বাইরের কোন বস্তু নয়, নিজের থেকে পৃথক কিছু নয়, এখানে নিজেরই কথা নিজেই বলা। তাই আমিরূপেই আত্মপরিচয়দান এই সূক্তগুলির বৈশিষ্ট্য।

দেবীসূক্ত এইজাতীয় বিরল আধ্যাত্মিক সূক্তেরই একটি। এখানে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা

বাক্, স্বরূপপরিচয়ে যিনি 'বাগ্ আম্ভৃণী', আপন আত্মস্বরূপের সঙ্গে তাদাত্ম্য বা অভিন্নতা অনুভব করে একদিন এই আত্ম-বিঘোষণ করেছিলেন। অহং-এর ঝঙ্কারে মুখরিত এই আটটি মন্ত্রের আশ্চর্য দেবীসূক্তটি তাই বাকেরই আত্মপরিচয়দানে ব্যাপৃত। 'দেবী' শব্দের মূল অর্থও যিনি দ্যোতমানা, প্রকাশমানা। কারণ দেব শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।" সুতরাং দেবতার মর্মগত কর্ম হলো দীপন বা দ্যোতন অর্থাৎ উদ্ভাসন বা জ্যোতিঃ বিকিরণ, আলোকের প্রসারণ। এই জ্যোতিঃ বা আলো বাক্‌রূপ জ্ঞানেরই আলো, যার অভাবে সমস্ত জগৎই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আলঙ্কারিক দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে তাই যথার্থই বলেছেন:

ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে॥

—এই সমগ্র ত্রিভুবনই অন্ধ তমসায় ডুবে যেত, যদি শব্দ নামক এই জ্যোতিঃ বা প্রকাশ সমগ্র সংসার জুড়ে দীপ্যমান না থাকত।

সৃষ্টিক্রমের বর্ণনাতেও আমরা লক্ষ্য করি যে, আত্মা থেকে সর্বপ্রথম সৃষ্ট হয় আকাশ—"আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" এই আকাশের স্বরূপ দৃষ্টও হয় না, স্পৃষ্টও হয় না অর্থাৎ আকাশকে দেখাও যায় না, ছোঁওয়াও যায় না। তাহলে আকাশ যে আছে তার প্রমাণ কী? শব্দই তার প্রমাণ—"শব্দগুণকম্ আকাশম্।" বায়ুকে যেমন চোখে দেখা না গেলেও আমরা তাকে স্পর্শের দ্বারা চিনি বা জানি, তেমনি আকাশকে স্পর্শ না করা গেলেও শব্দের মাধ্যমেই আমরা তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে থাকি। এই শব্দই তাই আদিম স্পন্দন, মূল শক্তি।

শব্দ বা বাক্ তাই শক্তিরই অপর নাম। বৈদিক ঋষিদের দিব্যদৃষ্টিতে তাই প্রতিভাত হয়েছিল যে, সমস্ত সৃষ্টিরই উদ্ভব শব্দ থেকে। সৃষ্টি তাই শব্দপ্রভব বা শব্দমূলক অর্থাৎ স্পন্দনাত্মক বা শক্ত্যাত্মক। সেই বাক্‌রূপিণী মহাশক্তিই এখানে আত্মপরিচয় দিচ্ছেন: "অহমেব স্বয়মিদং বদামি" -আমি নিজেই এই কথা বলছি বা জানাচ্ছি। এই আত্মবিঘোষণে আমরা প্রথম মন্ত্রেই লক্ষ্য করি যে, সমস্ত দেবতা এই মহা-শক্তিতেই বিধৃত ও তাঁর দ্বারাই পরিচালিত। বেদে দেবতাদের তিনভাবে লাভ করা যায়: গণভাবে, যুগ্মভাবে এবং এককভাবে। রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ—এঁরা গণদেবতা, দলবদ্ধ হয়ে যেন বিচরণ করেন। একাদশ, দ্বাদশ, ঊনপঞ্চাশৎ—এমনি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সংখ্যার যেন এক একটি গণ বা গোষ্ঠী বা দল। এমনিভাবে অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য প্রভৃতি হলেন এক এক গোষ্ঠীবদ্ধ গণদেবতা। আবার কোন কোন দেবতার পরস্পর সখ্য বা সম্বন্ধ এত গভীর যে তাঁরা একে অন্যকে ছেড়ে কখনো থাকতে পারেন না। এইরকম যুগ্মদেবতার মধ্যে মিত্রাবরুণ ও অশ্বিদ্বয় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এছাড়া একক দেবতা যে কত আছেন তার তো সংখ্যাই নেই। অগ্নি, ইন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সোম, ত্বষ্টা, পূষা, ভগ প্রভৃতি বড় ছোট কত দেবতাই রয়েছেন এই বৈদিক দেবশালায়!

দেবীসূক্তের প্রথম মন্ত্রে বাক্‌রূপিণী মহাশক্তি এইভাবে আত্মপরিচয় দিচ্ছেন:

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত
বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী
অহমশ্বিনোভা॥ ১

দেবী বাক্ এই প্রথম মন্ত্রটিতেই জানিয়ে দিলেন যে গণদেবতাই বল, যুগ্মদেবতাই বল আর একক দেবতাই বল, এই সমস্ত দেবতার মধ্য দিয়ে আমিই বিচরণ করছি—'চরামি', আমিই তাদের ধারণ করে আছি—'বিভর্মি'। এই বিচরণ ও বিধারণ দুইটিই তাঁর কর্ম। বিচরণ করা আর ধারণ করা, এই দুটি ক্রিয়াপদের দ্বারাই প্রকাশ করা হয়েছে যে, দেবতাদের গতি এবং স্থিতি উভয়ই এই মহাশক্তির উপর নির্ভর-

শীল। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও তাই তাঁকে 'নিঃশেষদেব-গণশক্তিসমূহমূর্তি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, নিঃশেষে সমস্ত দেবতাদের শক্তি সমাহিত বা একত্রিত হয়ে এই দেবীমূর্তিটি নির্মাণ করেছে। বরং দেবীর আত্মশক্তিরই বিচ্ছুরণ এই বিবিধ দেবগণ। অসুরপীড়নে বিপন্ন, বিচ্ছিন্ন, পৃথক পৃথক দেবগণ সংঘবদ্ধভাবে অসুরকে পরাভূত করবেন বলে আজ একত্র হয়ে তাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছেন। শুম্ভও বিভ্রান্ত হয়েছে, দেবীকে সে স্বরূপে চিনতে পারেনি। তাই সে ভেবেছে, সমস্ত দেবতার বল বা শক্তিকে আশ্রয় করে এই দেবী এত শক্তি-অভিমানিনী হয়ে উঠেছেন, নিজস্ব কোন শক্তি তাঁর নেই। তাঁর যে শক্তি, সবই হলো ধার করা, অপরের কাছ থেকে পাওয়া শক্তি। তাই শুম্ভ তাঁকে ব্যঙ্গোক্তি করেছে এবং তারই উত্তরে তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে সেই অতুলনীয় অপরূপ আত্ম-উদ্‌ঘোষণ:

'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।'
(চণ্ডী, ১০।৫)

এই মহাশক্তি তাই একা এবং অদ্বিতীয়া, তাঁর থেকে অপর বা পৃথক কিছুই নেই। দেবগণ যে তাঁরই বিভূতি, তাঁরই বিশিষ্ট প্রকাশ মাত্র, তা তিনি প্রত্যক্ষই দেখিয়ে দিলেন, যখন নিজের মধ্যে নিখিল দেববৃন্দকে তিনি প্রবিষ্ট করিয়ে দিলেন অর্থাৎ আত্মসাৎ করলেন। দেবতারা তাঁরই বক্ষঃস্থলে গিয়ে আশ্রয় লাভ করলেন। এই মহাশক্তির হৃৎকেন্দ্র থেকেই যে দেবতাদের উদ্ভব, তাঁরই প্রাণদায়িনী স্তন্যরসে যে তাঁরা সঞ্জীবিত, লালিত, পালিত ও পরিপুষ্ট, তা তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়ে দিলেন। হিন্দুর সমস্ত অধ্যাত্মসাধনার এই অদ্বৈতভাবনাতেই যে সবকিছুর প্রতিষ্ঠা তা বারংবার এভাবে দেখানো হয়েছে:

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২

—সোম, ত্বষ্টা, পূষা, ভগ প্রভৃতি দেবতাদের যে তিনি ধারণ করেন তা প্রথম মন্ত্রের আলোচনাকালেই বলা হয়েছে। চৈতন্যময়ী এই মহাশক্তি শুধু যে যজনীয় দেবগণের ধারয়িত্রী ও কারয়িত্রী তাই নন, একদিকে তিনি যেমন দেবগণকে ধারণ করছেন ও তাঁদের কর্মে নিযুক্ত রাখছেন, তেমনি অপর দিকে যজমান, যে যজন করছে, দেবতাদের তৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্যে উত্তম হবিঃ দ্বারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করছে, তাকেও যজ্ঞফলরূপে ধনসম্পদ বা দ্রবিণ দান করে তিনিই যজ্ঞসম্পাদনে সামর্থ্য যোগাচ্ছেন। দেবীসূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে তাই তিনি ঘোষণা করলেন:

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩

ধনসম্পদের তিনিই মূলে উৎস—'সংগমনী বসূনাম্', যেন মহাসম্রাজ্ঞী, সাক্ষাৎ রাষ্ট্র-স্বরূপিণী—'রাষ্ট্রী'। আবার তিনিই 'চিকিতুষী প্রথমা'—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানময়ী। বিদ্যার পরাকাষ্ঠা যে অদ্বৈতভাবনা তা তাঁরই স্বভাবভূত। বিত্ত ও বিদ্যা, সম্পদ ও জ্ঞান, এই উভয়েরই মূলে তিনি। যজ্ঞার্হগণের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠা। দেবতারা তাই যেন 'পুরুত্রা ব্যদধুঃ'—বহুস্থানে স্থাপন করলেন তাঁকে, যিনি স্বভাবতই 'ভূরিস্থাত্রা'—প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিত, আবার 'ভূর্যাবেশয়ন্তী'—ভূরি ভূরি রূপে, প্রচুরভাবে নিখিল জগতে আবিষ্ট বা প্রবিষ্ট।

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪

প্রবিষ্ট তিনি প্রতি জীবেই, শুধু জগতে নন। বৈশ্বানররূপে সমস্ত অন্নের, সবকিছু ভোগ্যের তিনিই অত্তা, অদনকর্তা, ভোক্তা। বেদান্তসূত্রেও তাই তাঁর এই রূপের পরিচয়

দিতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ 'অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ'। মানুষ যে অন্ন ভক্ষণ করে, সে কার দ্বারা? ময়া', আমিই ভোজনশক্তি বা পরিপাকশক্তিরূপে তার মধ্যে আছি বলেই তার পক্ষে অন্নভক্ষণ সম্ভব হয়। তেমনি তার দেখা, শোনা অর্থাৎ প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা ক্রিয়া এই চৈতন্যশক্তি আছেন বলেই সম্ভব হয়। 'বিপশ্যতি', শৃণোতি', 'প্রাণিতি'—দেখে, শোনে, প্রাণধারণ করে, সবই ময়া'—আমারই দৌলতে, আমারই শক্তিতে। অথচ হায়! 'অমন্তবঃ মাম্'- তারা আমাকে জানে না, মানে না, যদিও তারা আমাতেই বাস করে। 'ত উপক্ষিয়ন্তি'—আমারই আশ্রয়ে থাকে। আবার আর এক অর্থও করা যায়। তাঁকে না জানার ফলে, তাঁকে অবজ্ঞা করার ফলে তারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়ে যায়। 'ক্ষি' ধাতুটির অর্থ নিবাস বোঝায়, ক্ষয় অর্থও বোঝায়। যে-অর্থই গ্রহণ করি না কেন, তাৎপর্য দাঁড়ায় একইঃ আমাদের নিবাস বা আশ্রয় তিনিই অথচ আমরা তা জানি না। আবার তাঁকে না জানা-ই আমাদের ক্ষয়ের বা বিনাশের কারণ। তাই যেন আত্ম-পরিচয় দিতে মা ব্যগ্র হয়েছেন। বলছেনঃ 'শ্রুধি,' শোন, তুমি তো 'শ্রুত,' তুমি তো কীর্তিমান, শ্রদ্ধাবান, তুমি তো আমাকে মান, তাই তোমাকে বলছি।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি
জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫

—দেবতাগণ ও মনুষ্যগণের দ্বারা সেবিত ও প্রার্থিত এই তত্ত্ব আমি স্বয়ং তোমাকে বলছি, "অহমেব স্বয়মিদং বদামি।" আমাকে না মানলে যেমন ক্ষয়, আবার আমারই ইচ্ছার প্রসাদে সকলের অভ্যুদয়। আমি যাকে চাই—"যং কাময়ে" তাকে "উগ্রং কৃণোমি"—বড় করে তুলে ধরি, কাউকে করি ব্রহ্মা, কাউকে করি ঋষি, কাউকে করি মনীষী, যিনি সুমেধামণ্ডিত—"তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।" সমস্ত কিছুই তাই নির্ভর করছে তাঁর ইচ্ছার উপরে। সেই ইচ্ছার অঙ্গুলিহেলনে কেউ খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে অধিষ্ঠিত হন, কেউ বা পলকের মধ্যে সেখান থেকে বিচ্যুত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হন। সুতরাং তিনি যেমন 'চিকিতুষী বা জ্ঞানময়ী, তেমনি কাময়ে' অর্থাৎ কামনাময়ী বা ইচ্ছাময়ী।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬

শুধু ইচ্ছা করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন না, সেই ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য তিনি ক্রিয়াশক্তি-রূপেও আত্মপ্রকাশ করেন। 'ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা'—ব্রহ্মজ্ঞানবিরোধী হিংস্রপ্রকৃতি অসুরকে বিনাশ করতে তিনি রুদ্রের ধনুকে আতত (আরোপ) করেন—"রুদ্রায় ধনুরাতনোমি।" তাঁর ইচ্ছাকে যারা প্রতিহত করতে চায় সেইসব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের জন্য তিনিই দশপ্রহরণ-ধারিণী হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণা হন। নইলে রুদ্রের ধনুতে এত শক্তি যোগায় কে? মানুষই বা জীবন-সংগ্রামে কার শক্তিতে নিরন্তর যুদ্ধে চলেছে এবং অবশেষে জয়ীও হচ্ছে? আসলে সন্তানের হয়ে তিনিই লড়ছেন—"অহং জনায় সমদং কৃণোমি।" স্বয়ং রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে তিনিই সংগ্রাম করে চলেছেন এবং সর্বদা আশ্বাস ও ভরসাও দিয়ে রেখেছেন শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপসংহারে যে, যখনই প্রতিকূল শক্তি বা দানবের থেকে বাধা আসতে থাকবে তখনই তিনি অবতীর্ণা হয়ে অরি সংক্ষয় করবেন, শত্রু বিনাশ করবেনঃ

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাঽবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥
(চণ্ডী, ১১।৫৪-৫৫)

সুতরাং জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-রূপে যেমন এই দেবীসূক্তে আত্মপরিচয় দান করেছেন, তেমনি একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে ব্যাপিনীশক্তিরূপে দ্যুলোকে-ভূলোকে, স্বর্গে-মর্ত্যে তিনি আবিষ্ট বা অনুস্যূত হয়ে আছেন—

'দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ হ'। শক্তির এই আবেশ বা অনুপ্রবেশই সৃষ্টির পরম রহস্য। অন্য সমস্ত মনুষ্যকৃত সৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্ট বস্তু পরস্পর পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে। সৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে স্থির অনড়রূপে বিরাজ করে। কবির রচিত কাব্য, শিল্পীর আঁকা ছবি বা সুর-সাধকের মধুর সঙ্গীত সৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থেমে যায়, জন্ম লাভ করেই যেন মৃত্যুবরণ করে। তা আর বিকশিত হতে পারে না, আরও ফুটে উঠতে পারে না, কারণ স্রষ্টার যে প্রাণ-স্পন্দন, তা তিনি এইসব সৃষ্টির মধ্যে আবিষ্ট বা প্রবিষ্ট করাতে পারেন না। কিন্তু চৈতন্যশক্তির এইখানেই চমৎকারিতা, এইখানেই তাঁর অনন্য মহিমা যে সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে তাঁর অনুপ্রবেশের ফলে তা নিরন্তর প্রস্ফুটিত হতে থাকে। ঋগ্বেদের ভাষায় দেবতার এই কাব্য তাই "ন মমার ন জীর্যতি।" না মরে, না জীর্ণ বা পুরাতন হয়, সহস্রদল পদ্মের মতো পর্বের পর পর্বে নিজেকে সে উন্মোচিত করেই চলতে থাকে। তার কারণ ঐ "আবিবেশ হ"— চৈতন্যশক্তির আবেশ।

"অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥" ৭

এই শক্তি প্রথমা, আদিতমা, সকলের পূর্বভাবিনী কৌমারী মহাশক্তি যিনি কিনা পিতাকেও প্রসব করেন, জন্ম দেন সৃষ্টির সূচনায়, সেই সৃষ্টির মাথার উপরে তাঁকে বসিয়ে দেন, "অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্।" যাঁকে আমরা সৃষ্টিকর্তা পিতা ব্রহ্মা বলে জানি, তিনিও এই শক্তিরই সন্তান, সেই শক্তি থেকেই প্রসূত বা সৃষ্ট। কিন্তু সেই শক্তির সৃষ্টি কোথা থেকে? তাঁর উদ্ভবস্থান কোথায়? তারও সঙ্কেত দিচ্ছেন : "মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।" আমার যোনি বা উদ্ভবস্থানের যদি সন্ধান করতে চাও, তবে ডুব দিতে হবে হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে, সেই অতলান্ত চৈতন্যসাগরে। উপনিষদের ভাষায় "সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো যোনিঃ"- সমুদ্রই এঁর বন্ধু বা বন্ধনস্থান, সমুদ্রই এঁর যোনি বা উদ্ভবস্থান। সেই চৈতন্য-সাগর থেকে উদ্ভূত হয়ে এই শক্তির তরঙ্গ যেন বিশ্বভুবনে ছড়িয়ে পড়ল, বিশেষ বিশেষ ভাবে অবস্থান করতে লাগল, "ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা।" আবার বিশ্বভুবনকে, এই ভূলোককে ছাপিয়ে গগনচুম্বী এই শক্তিতরঙ্গ আপন আকৃতি বা দেহ দিয়ে যেন ঐ সুদূর দ্যুলোক-কেও গিয়ে স্পর্শ করল, "উতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি।" কী অসীম এই শক্তির বিস্তৃতি, ব্যাপিনী রূপের কী অপরিমেয় মহিমা!

"অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা
ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী
মহিমা সংবভূব॥" ৮

এই ব্যাপিনী রূপ তাঁকে ধারণ করতে হয় সৃষ্টির সূচনাতেই, বায়ুর মতো তখন তিনি যেন সূক্ষ্মভাবে বয়ে যান, বিশ্বচরাচরে নিজেকে ছড়িয়ে দেন। তাই এখানে বলছেন: "অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।" সৃষ্টির প্রারম্ভে সমস্ত বিশ্বভুবনে তিনি প্রাণরূপে সঞ্চরমাণা। এইটিই আদিম স্পন্দন যাকে ঋগ্বেদের গহনতম নাসদীয় সূক্তে 'আনীদবাতম্,' এইভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তখনো তো বায়ু সৃষ্টি হয়নি, তাহলে তিনি স্পন্দিত হলেন কিভাবে? 'অবাতম্' অর্থাৎ বায়ুহীন এই প্রাণস্পন্দন আপনাতেই আপনি স্থিত সেই একের মধ্য থেকে যেন ফুটে উঠল, "স্বধয়া তদেকম্।" এখানেও "বাত ইব," বায়ুর মতো বলে সেই 'অবাতম্' বায়ুহীনের অনন, প্রাণন বা স্পন্দনেরই সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টির জন্যই সেই পরমা শক্তির এই বায়ুর মতো প্রবহমানতা, তাঁর এই স্পন্দিত, ছন্দিত

রূপ ধারণ। স্বরূপতঃ তিনি কিন্তু এই দ্যুলোক-ভূলোক ছাপিয়ে, সর্বকিছুকে অতিক্রম করে, সকলের 'পর' বা শ্রেষ্ঠ, সর্বকিছু থেকে পৃথক বিলক্ষণরূপে বিরাজ করছেন, "পরো দিবা পর এনা পৃথিবী।" এইটিই তাঁর উন্মনী রূপ, সর্বাতিশায়ী পরম রূপ, যার কোন পার বা অন্ত পাওয়া যায় না। আর 'এতাবতী', আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রসারিত এই যে বিশাল ব্যাপক সৃষ্টি, এ তিনি আপন 'মহিমা সংবভূব', আপন মহিমা দ্বারা হয়েছেন বা প্রকাশ করেছেন।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তেও সেই পরম পুরুষের প্রসঙ্গে ঠিক একই ভাবে বলা হয়েছেঃ "এতাবানস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ," এই পর্যন্ত বা এতখানি তাঁর মহিমা, এর চেয়েও 'জ্যায়ান্' বা শ্রেষ্ঠ সেই পুরুষ। সৃষ্টির মধ্যেই তিনি নিঃশেষ হয়ে যাননি, সৃষ্টি তাঁর সামান্য মহিমা বা ঐশ্বর্যের প্রকাশ মাত্র, সেই মহিমার ঊর্ধ্বে তাঁর অনন্ত অপরিসীম শুদ্ধ স্বরূপ। যতই ব্যাপক বা বিস্তৃত হোক, এই মহিমা সর্বত্রই 'এতাবতী' বা 'এতাবান্', এই পর্যন্ত অর্থাৎ তা সীমাবদ্ধ। সৃষ্টি সেই অসীম অনন্তের যেন "একাংশেন স্থিতঃ", এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আর স্বরূপতঃ তিনি সর্বকিছুর 'পর' বা 'পার', 'জ্যায়ান্'।

দেবীসূক্তে তাই আত্মপরিচয়দান প্রসঙ্গে এই বাক্‌রূপিণী মহাশক্তি সমগ্ররূপেই নিজেকে উদ্ঘাটন করেছেন, তাঁর সমস্ত বিভাব বা বিভূতিই তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং সবশেষে উপসংহার টেনে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে তিনি সর্বাতিক্রান্তা, অনন্তা, অপরিমেয়া। দার্শনিক পরিভাষায় একটি তাঁর সর্বানুগ (Immanent) রূপ, অপরটি সর্বাতিগ রূপ (Transcendent)। এই উভয় রূপে তাঁকে চিনলে বা জানলেই "অসংশয়ং সমগ্রং মাম্"-কে চেনা বা জানা হয়।

দুর্গাপূজা বা শক্তি-উপাসনা হলো এই পরমা শক্তিকে আপন আত্মস্বরূপের মধ্যে উপলব্ধিরই প্রয়াস। সেই উপলব্ধি জাগলে পূজার উপকরণ কোশা-কুশি, ফুল-চন্দন, ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য এবং পূজার কর্তা যজমান বা পূজক স্বয়ং তথা পূজার যিনি কর্ম বা বিষয় অর্থাৎ আরাধ্যা দেবী, সবই একই চৈতন্যশক্তির প্রকাশ-রূপে অনুভূত হয়। এই অদ্বয় অনুভূতিতেই সব পূজা-অর্চনার পর্যবসান।

বর্তমান যুগে ভবতারিণীরূপে স্বয়ং মহাশক্তির অদ্বয় ভাবনায় সেই পূজার অনুষ্ঠান করে শ্রীরামকৃষ্ণ সকল মানুষের কাছে পূজার এই পরম আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। সেই দিব্য ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যদি শক্তি-পূজায় ব্রতী হতে পারি, তাহলেই আমাদের দুর্গোৎসব সার্থক হয়ে উঠবে।

বিশেষ রচনা

রাত্রিসূক্ত ঃ ঋষির অনুভূতি

প্রগতি রায়

শক্তি-আরাধনা পৃথিবীর ইতিহাসে বহু পুরনো ধারণা। এপর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন যে সভ্যতার নিদর্শন ভারতবর্ষে পাওয়া গিয়েছে সেই সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শাক্ত-বাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখা যায়। নানা আকৃতি এবং ভঙ্গিমায় দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে সেখানে। তারই প্রভাবস্বরূপ হয়তো পরবর্তী কালে বৈদিকযুগে পুরুষশক্তির প্রবল প্রাধান্যের মধ্যেও ধীরে ধীরে নারীশক্তি তথা দেবীপূজার উত্থান ঘটেছে।

ঋগ্বেদ মূলতঃ পুরুষ-দেবতাদের শক্তির জয়গানে সমৃদ্ধ। সেখানে ইন্দ্রের শৌর্য, অতুল বিক্রমে রাক্ষসনিধন কিংবা বরুণের ঐশীশক্তি অথবা অগ্নি ও সূর্যের অপরিসীম নিয়ন্ত্রণ-শক্তির বন্দনা গীত হয়েছে। সেখানে ঊষা কিংবা সরস্বতীর মতো স্ত্রীদেবতার শুধুই সৌন্দর্য কিংবা কর্মকুশলতার গুণগান; নারীর অন্ত-র্নিহিত শক্তির বিশেষ উল্লেখ সেখানে নেই।

এসবই হলো বৈদিকযুগের প্রথম দিকের কথা। তারপর সভ্যতা যত এগিয়েছে তত বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে অন্যান্য সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। ঘটেছে আর্য-পূর্ববর্তী সংস্কৃতির মিশ্রণ। হয়তো সেজন্যই দেখতে পাই ঋগ্বেদের একেবারে শেষতম যে দশম মণ্ডল—তাতে রাত্রিসূক্ত ও দেবীসূক্তের উপস্থিতি। এই দুটি সূক্তেই স্ত্রীদেবতার ঐশী শক্তির জয়গান গাওয়া হয়েছে। দেবীসূক্তের ঋষি যিনি নিজে একজন নারী, স্বয়ং নিজেকে দেবীরূপে ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে রাত্রিসূক্তে ঋষি কুশিক রাত্রিদেবীকে নানা স্তুতির মাধ্যমে প্রথমে তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। পরে অন্ধকার রাত্রির প্রবল মহিমা ব্যক্ত করেছেন। আমরা এখানে সায়ণভাষ্য অনুসারে ঋষি কুশিকের একান্ত অনুভূতিকেই কবিতার আকারে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

ঋগ্বেদ-সংহিতা

১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক ঃ ১২৭ সূক্ত

রাত্রিসূক্ত

রাত্রি দেবতা। কুশিক ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

রাত্রীব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১॥

--রাত্রিদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করেছেন।

শর্বরী—
নিশা জাগ্রত,
সোনালী সূর্যের পর
বর্ণহীন এক অভিব্যক্তি।
সৌন্দর্যে মহান নক্ষত্রপুঞ্জে চোখ রেখে
খুঁজে বেড়িয়েছেন আপনি
অনন্তকাল ধরে সৃষ্টির কল্যাণ।
আপনাকে পথ দেখিয়েছে তারা—
সমৃদ্ধ করেছে।
সমৃদ্ধা রাত্রি সর্বাঙ্গসুন্দরী—
কল্যাণী, মঙ্গলময়ী, মঙ্গলকারিণী।
কুশিক ঋষির বর্ণনায়, গায়ত্রী ছন্দে
সুর তাল লয় নিয়ে
রাত্রি এসেছেন।
আমি কুশিক, হে রাত্রি !
আপনার নির্মুক্ত শোভা দেখে
হয়েছি বিমুগ্ধ। ধন্য ॥ ১॥

ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ॥ ২॥

—দেবরূপিণী রাত্রিদেবী অতি বিস্তার লাভ করেছেন, যাঁরা নিচে থাকেন, অথবা যাঁরা ঊর্ধ্বে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করলেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে বিনাশ করেছেন।

বিস্তীর্ণা রাত্রি।
গভীর প্রবন্ধে বিস্তার্যমান।

বিস্তৃত অন্তরীক্ষ তমসাচ্ছন্ন তাতে—
আরও, আরও বিস্তারে।
তমসার সুমহান তেজে বন্দিত
গুল্মলতা। ধরিত্রীর অর্ঘ্য। বনস্পতি।
তাদের শীর্ষ বেয়ে
রাত্রি নেমেছেন যখন
ঠিক তখনই
নক্ষত্রের আলোয়
দিগন্ত উদ্ভাসিত হলো।
পথ চিনে নিলেন রাত্রি—
সোভরি-পুত্র কুশিকের আরাধনায় ॥ ২॥

নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী।
অপেদুহাসতে তমঃ ॥ ৩ ॥

—রাত্রিদেবী এসে উষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করলেন।

মায়াজালে আচ্ছন্ন
দিগন্ত পরিব্যাপিনী নিশা—
স্নিগ্ধ তাঁর তমসার আবরণ সরিয়ে—
সলজ্জ উষার
কম্পিত পদক্ষেপ,
শঙ্কায় ধীর।
কুশিক ঋষির গায়ত্রী ছন্দে
তাঁর প্রকাশ।
সহোদরার লজ্জা ভেঙে
রাত্রি যখন
মুক্তির আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁকে—
শপথ করেছিলেন প্রকাশের,
তখন—
যৌবনবতী উষা অঙ্গীকারাবদ্ধ—
সহোদরা রাত্রিকে মুক্ত করেন
জগতের কল্যাণে।
অজ্ঞানের তমসা
হোক বিদূরিত ॥৩॥

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি
বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ ॥ ৪ ॥

—পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে সুখে বাস করে, সেরূপ যাঁর আগমনে আমরা সুখে শয়ন করেছি, সে-রাত্রি আমাদের পক্ষে শুভকরী হোন।

রাত্রি এসেছেন—
কল্যাণময়ী।
তোমরা, যারা কৃপাপ্রার্থী
তাদের জন্য করুণা করেন। রাত্রি এসেছেন।
এসেছেন রাত্রি—
জননী ! বিভাবরী !
মঙ্গল করুন জগৎ সংসারের।
সর্বভূতের। সকল প্রাণীর।
সুখের হোক
এ ঘোর নিশা।
মধুময় হোক
নিশার স্বপন।
নীড়ের পাখি
নিশ্চিত আশ্রয়ে
ঘুমিয়ে থাকে আপনার কোলে।
আমরা সূর্যের সন্তান,
এসেছি আপনার শরণ নিতে।
মঙ্গল আসুক
আমাদের জীবনে।
সমৃদ্ধি, সুখ আর শান্তিতে
ভরুক তা ॥ ৪॥

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫ ॥

—গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হয়েছে। পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ, সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে শয়ন করেছেন ॥

অব্যক্তা জননী।
অনুভবে অধরা—
তবু, প্রতিদিন অনুভবে পাই আপনাকে।
হে কৃপা, বিবশা—
স্থাবর জঙ্গমের আশ্রয়দায়িনী রাত্রি—
আপনার নিশ্চিত আগমনে
স্বস্তি হোক সকলের।
স্বস্তি হোক পথচারীর।
পাখি ও গৃহস্থের।

স্বস্তি হোক গ্রামের,
ব্যস্ততাভরা শ্যেনপাখির
আর সন্তানের ;
শান্ত স্নিগ্ধ হয়েছে তারা
আপনার আগমনে।
মুছে গেছে তাদের প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততা।
অবসান হোক শ্রান্তির।
ক্লান্তির।
দূর গগনে ছেয়ে যাক তমসার আবরণ।
সোভরি-পুত্র আমি—
কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরি। এ দান আপনার ॥ ৫ ॥

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব ॥ ৬ ॥

—হে রাত্রি! বৃকী ও বৃককে আমাদের নিকট হতে দূরে নিয়ে যান, চোরকে দূরে নিয়ে যান। আমাদের পক্ষে বিশিষ্টভাবে শুভকরী হোন ॥

বিশ্রান্ত শয়ানে নিশ্চিত আমরা।
উর্ম্যা! মাতঃ!
আপনার মহত্ত্বে
আমরা স্বস্থ, অহিংসিত।
স্তব্ধ রাত্রি—
চতুষ্পদ শ্বাপদের হিংস্রতা। চতুর্দিকে।
অগণিত তস্করের অপশাসন—
আপনাকে করে না অপ্রিয়।
আপনার করুণা বর্ষিত হোক।
এ ঘোর যামিনী
মঙ্গলকর হোক।
হোক সুখকর এবং শান্তিপূর্ণ।
চৌর্য হোক দূরিত।
নির্ভয় হোন সৌভরি কুশিক ॥ ৬ ॥

উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত।
উষ ঋণেব যাতয় ॥ ৭ ॥

—কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট লক্ষ্য হয়ে দেখা দিয়েছে, আমার নিকট পর্যন্ত আচ্ছন্ন করেছে। হে উষাদেবি, আমার ঋণকে যেমন পরিশোধ করে নষ্ট করেন সেরকম অন্ধকারকে নষ্ট করুন।

রজনী।
আশ্লিষ্ট হয়েছে বিশ্বচরাচর
কখন—ধীরে ধীরে,
তাঁর ছন্দোময়ী মায়ায়।
আমাকে আকুল করেছে
তমোনিশার সে গাঢ় কালিমা।
দীপ্ত অন্ধকার ক্রমে ক্রমে
গ্রাস করে এসেছে আমাকে,
হে উষা! উর্ম্যা! আলোকের জন্মদাত্রি! মাতঃ!
প্রতিদিন ধনের আশ্বাসে
আশ্বস্ত করুন আমাকে। অনন্ত সম্পদের
ঠিকানা আপনি।
আমার ঋণকে দূর করুন।
জীবনের অন্ধ তমোরাশি নিশা দূর করুন।
আমি কুশিক, কৃপা করুন আমাকে ॥ ৭ ॥

উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮ ॥

—হে আকাশের কন্যা রাত্রি! আপনি যাচ্ছেন, আপনাকে গাভীর ন্যায় এ-সমস্ত স্তব অর্পণ করলাম। আপনি গ্রহণ করুন।

বন্দি আপনাকে—
কত যুগ ধরে, একইভাবে।
বন্দনা করে চলেছি আমি, সোভরি-সন্তান
কুশিক।
আমরা সূর্যের সন্তান।
অনন্তকালের সে ভালবাসা। মাতঃ!
জননি!
জীবনের আশ্বাস। জীবনের প্রতিশ্রুতি।
আকাশের কন্যা আপনি। পরমাত্মা-দুহিতা।
গাভীর পয়োধারার মতো
এনেছি স্তুতিবর্ষণ আপনার কাছে :—
হে রাত্রি! সূর্যের কন্যা অপরা—
গ্রহণ করুন তাকে।
আপনাতে নির্ভর করি আমি।
আঁধার শত্রুদের জয় করব।
আপনারই মহত্ত্বে। আপনার কুশল মাহাত্ম্যে ॥৮॥

প্রবন্ধ

কুমারীপূজা

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

তন্ত্রে কুমারীকে সাক্ষাৎ যোগিনী, সাক্ষাৎ পরমদেবতা বলা হয়েছে—"কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎ কুমারী পরদেবতা।"১ আর কুমারী-পূজার মাহাত্ম্য-কীর্তনে তো তন্ত্র একেবারে পঞ্চমুখ। সেখানে আছে ঃ

"হোমাদিকং হি সকলং কুমারীপূজনং বিনা।
পরিপূর্ণফলং ন স্যাৎ পূজয়া তদ্ ভবেদ ধ্রুবম্।
কুমারীপূজয়া দেবি ফলং কোটিগুণং ভবেৎ॥
পুষ্পং কুমার্যৈ যদ্দত্তং তন্মেরু-সদৃশং ফলম্।
কুমারী ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্॥"২

—কুমারীপূজা ছাড়া হোম প্রভৃতি কর্ম পরিপূর্ণ ফল প্রদান করে না। কুমারীপূজার দ্বারা হোমাদি কর্মের কোটিগুণ ফল লাভ হয়। কুমারীকে একটি পুষ্প দান করলে তাতে সুমেরু পরিমাণ ফল লাভ হয়। কুমারীকে ভোজন করালে সমস্ত ত্রৈলোক্যকে ভোজন করানো হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও এ সমস্তই অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতিবাচক, তথাপি কুমারী-পূজা যে সাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দেবীর 'কুমারী' নাম অতি প্রাচীন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এই নামের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে রয়েছে ঃ "কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যা-কুমারী ধীমহি তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ"৩—হে দুর্গে, তুমি কন্যা ও কুমারী। আমরা কাত্যা-য়নকে জানব। সেজন্য তোমাকে ধ্যান করি। তুমি আমাদের শুভ কর্মে প্রেরণা দাও। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও সেই পরমাত্মাকে "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী"৪—তুমি নারী, তুমি নর, তুমিই কুমার আবার তুমিই কুমারী বলা হয়েছে। এসব থেকে অনুমান করা যায় যে, দেবীর কুমারী নাম অতি প্রাচীন। আর দেবীর কুমারী নাম যেমন প্রাচীন, তাঁর পূজা-আরাধনার ধারাও তেমনি প্রাচীন এবং বহুব্যাপক।

তন্ত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। যেকোন প্রসিদ্ধ শাক্তপীঠে দেবীকে কুমারীরূপে পূজা করা ঐসব পীঠস্থানের একটি বৈশিষ্ট্য। কামরূপের কামাখ্যাধামে দেবীর মন্দিরে কুমারী-পূজা বিশেষ প্রসিদ্ধ। সেখানে নিত্যই বহু পুণ্যার্থী দেবী-তীর্থ দর্শনের অঙ্গ হিসাবে ভক্তিভাবে এই পূজা করে থাকেন। তাছাড়া বিভিন্নভাবে এই পূজার প্রচলন রয়েছে নেপাল, ভুটান ও সিকিমে। বিশেষ করে নেপালের কুমারীপূজা ওখানকার বহু ধর্মীয় উৎসবের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ভারতের সর্ব দক্ষিণ-প্রান্তে অবস্থিত কুমারিকা অন্তরীপ। সেখানে দেবী কন্যাকুমারীর মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। দেবী সেখানে কুমারীরূপে বিরাজ করছেন।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ-মতে রাবণবধের নিমিত্ত দেবীকে প্রবোধিতা করবার উদ্দেশ্যে দেবগণসহ ব্রহ্মা দেবীর স্তব করেন। স্তবে তুষ্টা দেবী কুমারীরূপে দেবতাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েছিলেন—"কন্যারূপেণ দেবানামগ্রতো দর্শনং দদৌ।"৫ কন্যারূপী দেবীই বিল্ববৃক্ষমূলে দেবীর বোধন করবার জন্য দেবতাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মা পৃথিবীতে আগমন করেন। পৃথিবীতে এসে তাঁরা এক নির্জন স্থানে বিল্ববৃক্ষের শাখায় সবুজঘন পত্ররাশির মধ্যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা অপরূপা সুন্দরী নিদ্রিতা এক বালিকামূর্তির দর্শন পেলেন ঃ

"তস্যৈকপত্রে রুচিরে সুচারুবনমালিকাম্।
নিদ্রিতাং তপ্তহেমাভাং বিম্বোষ্ঠীং তনুমধ্যমাম্।
অনাবৃতাঙ্গীং নিশ্চেষ্টাং রুচিরাং নবমালিকাম্॥"৬

১ বৃহৎ তন্ত্রসার, বসুমতী ১০ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৪৪
২ ঐ, পৃঃ ৬৪২
৩ তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০।২।৩৪
৪ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৪।৩
৫ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২১।৬২
৬ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২২।২

দেবগণ তাঁকে স্তব করতে লাগলেন। তাঁদের স্তবে প্রসন্না হয়ে বালিকা জাগ্রতা হন এবং তাঁর বাল্যভাব ত্যাগ করে উত্থিতা হয়ে উগ্রচণ্ডা নাম্নী যুবতীতে রূপান্তরিতা হন। এই কুমারী বালিকাই দেবী চণ্ডিকা। ইনিই প্রবুদ্ধা হয়ে সবংশে রাবণ নিধনের বর দিয়েছিলেন। দেবীর অনুগ্রহে রামচন্দ্র সবংশে রাবণ নিধন করে সীতাদেবীকে উদ্ধার করেছিলেন।

দুর্গাপূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কুমারীপূজা। দেবীপুরাণে এই পূজার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে—"পূজয়েৎ ব্রাহ্মণাঙ্কৃক কন্যাং বালাং তথৈব চ"৭—দেবীপূজার অঙ্গ হিসাবে ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণের যথাবিহিত পূজা করবে। বাংলার বহু ঐতিহ্যপূর্ণ পূজামণ্ডপে কুমারীপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী—এই তিন দিনই অথবা এই তিন দিনের যেকোন দিন কুমারীপূজা করা যেতে পারে। তবে সাধারণতঃ পূজা অনুষ্ঠিত হয় অষ্টমীর দিনে, কোথাও কোথাও বা নবমীতে। এক বৎসর থেকে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত বালিকারা ঋতুমতী না হওয়া পর্যন্ত কুমারীরূপে পূজিতা হওয়ার যোগ্য। এক এক বয়সের কুমারীকে এক এক নামে ও দেবীজ্ঞানে পূজা করার রীতি। যেমন একবর্ষীয়া কন্যাকে সন্ধ্যা নামে, দ্বিবর্ষীয়াকে সরস্বতী, ত্রিবর্ষীয়াকে ত্রিধা, চতুর্বর্ষীয়াকে কালিকা, পঞ্চবর্ষীয়াকে সুভগা, ষড়বর্ষীয়াকে উমা, সপ্তবর্ষীয়াকে মালিনী, অষ্টবর্ষীয়াকে কুব্জিকা, নবমবর্ষীয়াকে কালসন্দর্ভা, দশমবর্ষীয়াকে অপরাজিতা, একাদশবর্ষীয়াকে রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষীয়াকে ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষীয়াকে মহালক্ষ্মী, চতুর্দশবর্ষীয়াকে পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষীয়াকে ক্ষেত্রজ্ঞা এবং ষোড়শবর্ষীয়াকে অম্বিকা নামে পূজা করা হয়।৮

পূজার বিধানে আছে ঃ

"পাদ্যমর্ঘ্যং তথা ধূপং কুঙ্কুমং চন্দনং শুভম্।
ভক্তিভাবেন সংপূজ্য কুমারীভ্যো নিবেদয়েৎ॥"৯

—পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, কুঙ্কুম ও উত্তম চন্দন ভক্তিভাবে অর্চনা করে কুমারীকে নিবেদন করবে।

পূজার দিন সকালে পূজার জন্য নির্দিষ্ট কুমারীকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয় এবং ফুলের গয়না ও নানাবিধ অলঙ্কারে তাঁকে সাজানো হয়। পা ধুয়ে পরানো হয় আলতা, কপালে এঁকে দেওয়া হয় সিন্দুরের তিলক, হাতে দেওয়া হয় মনোরম পুষ্প। কুমারীকে মণ্ডপে সুসজ্জিত আসনে বসিয়ে তাঁর পায়ের কাছে রাখা হয় বেলপাতা, ফুল, জল, নৈবেদ্য ও পূজার নানাবিধ উপচার। কুমারীর একটি ধ্যানমন্ত্রে আছে ঃ

"বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্।
নানালঙ্কারনম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীম্॥"
চারুহাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাম্॥
ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিণীম্॥"১০

—ত্রিলোকশ্রেষ্ঠা-সুন্দরী, শ্রেষ্ঠ বর্ণধারিণী যে বালিকামূর্তি, যাঁর দেহাঙ্গ নানাবিধ অলঙ্কারের ভারে অবনতা, যিনি মঙ্গলবিদ্যা প্রকাশিনী, মনোহরহাস্য-যুক্তা, মহানন্দময়ী, মঙ্গলদায়িনী, মঙ্গলময়ী, পরমানন্দস্বরূপিণী—সেই কুমারীরূপী জননীকে ধ্যান করবে।

ঢাকঢোলের বাদ্য, উলুধ্বনি, পূজকের মন্ত্রোচ্চারণ ও আরাত্রিকের মধ্যে কুমারীপূজা সম্পন্ন হয়। ধ্যান ও প্রণাম-মন্ত্রে সাধারণ কুমারী হয়ে ওঠে সাক্ষাৎ দেবী, ভক্তগণ তাঁর মধ্যে জগন্মাতা শ্রীশ্রীদুর্গাকে অনুভব করে কৃত-কৃতার্থ বোধ করেন।

৭ দেবীপুরাণ, ৩২।৪৪
৯ ঐ, পৃঃ ৬৪৪
৮ বৃহৎ তন্ত্রসার, পৃঃ ৬৪৩
১০ বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি, নারায়ণ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৮১-৮২

মাতৃবন্দনা

রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

দেবি সারদে, সুখদে শুভদে,
চরণে প্রণতা জনতা।
ক্রোড়ীকুরুতান্ অবনতমনুজান্
বরদা তব বাগমৃতা॥

ভয়াপহকরে, দুঃখদুর্জরে
তাপদুরকারি বারি।
কারণরূপিণি, জগতী জননী,
ত্বমেব সকলা নারী॥

সুমধুর-বচনে, সুস্মিতবদনে,
স্নেহমহোদধিনয়নে।
দয়ার্দ্রচিত্তে, সতীত্ববিত্তে,
রামকৃষ্ণগতমননে॥

মায়া-মানবি, করুণাজাহ্নবি
পত্যুরুত্তর-সাধিকে।
ভবহিতে যোগ তপস্বি-ত্যাগ
মানসপুত্রপালিকে॥

বিশ্বেশ্বরি জয় ধরণিং পাবয়
পুনরপি দর্শয় রূপম্।
পরমে প্রকৃতে, শোকহতকৃতে
আনয় সান্ত্বনবাচম্॥

অজ্ঞানদুঃখনাশায় সারদা সারদা স্বয়ম্।
দধতী মানবীং মূর্তিং লোকহিতায়েহাগতা॥
গৃহিণো রামকৃষ্ণস্য গেহহীনস্য গেহিনী।
জন্মদানমৃতে মাতা পুত্রাণাং কর্মযোগিনাম্॥
তস্যৈ বিজ্ঞানদায়িন্যৈ কল্যাণপ্রতিমূর্তয়ে।
বিশ্বমাত্রে জগদ্ধাত্র্যৈ দেব্যৈ কুর্মো নমো নমঃ॥

ধ্যানের মন্ত্র

কণিকা দেব

ধ্যানের মন্ত্র শিখতে হলে
শিখে নাও তা গাছের কাছে।
নিজের ভিতর মগ্ন হয়ে
অহর্নিশ সে দাঁড়িয়ে আছে।

নিঃস্বার্থ, নিরাসক্ত, যেসব কথা
গীতায় আছে,
সেসব কথা শিখতে হলে
শিখে নাও তা গাছের কাছে।

এত যে ফল ফলছে তাহার,
একটিও নয় নিজের তরে,
সবকিছু সে বিলিয়ে যে দেয়
আপনাকে রিক্ত করে।

সূর্যদেবের অগ্নিবান
অচঞ্চলে বইছে শিরে
মেঘের ধারা বইছে যখন,
তখনো তা সইছে ধীরে।

দেহখানা ছড়িয়ে দিয়ে
পথিকজনে বলছে 'এসো
শ্রান্ত হয়ে যদিই থাকো
আমার ছায়ায় একটু বসো।'

আঁচলখানা বিছিয়ে দিয়ে
চক্ষু বুজে এলিয়ে থাকো,
আমার শীতল বাতাস পেয়ে
শ্রান্তি তোমার থাকবে নাকো।

তাইতো বলি, এমন সুজন
ক-জন আছে এ-ধরাতে
নীরব ভাষায় জগৎ-জনে
ধ্যানের মন্ত্র শিক্ষা দিতে।

প্রপঞ্চ

দেবীপ্রসাদ মৈত্র

নিস্তরঙ্গ শান্ত নদী, অনেক দূরে চাঁদ
একটি চাঁদের একটি ছায়া সারাটা রাত ভাসে
নদীর জল এবং মন বাতাসে যেই দোলে
দোলায়মান জলের বুকে অসংখ্য চাঁদ হাসে।

প্রাণের মধ্যে প্রবহমান অদৃশ্য এক নদী
অন্ধকারে অজ্ঞানে সে যেদিকে চঞ্চল
হাজার প্রশ্ন এবং দ্বন্দ্বে মন যে তোলপাড়
সত্য নিয়ে মিথ্যা মায়া খেলছে অনর্গল।

যেদিকে প্রাণ শুদ্ধজ্ঞানে নিস্তরঙ্গ স্থির
সিদ্ধাসনে কূটস্থে তার মগ্ন অভিষেক
দু'চোখ বুজে দৃষ্টি খুলে বিস্ময়ে সে দেখে
শাশ্বতকাল সত্য যে সে নিত্য এবং এক।

তোমার গানের সুরের পরশ

শেখ সদরউদ্দীন

তোমার গানের সুরের পরশ পাই যে নব নব—
আমার হৃদয়-তন্ত্রী মাঝে বাজে যে বীণ তব।

তোমার গানের গুলবাগিচায় হাওয়ায় ওঠে দুলি
হতে পারি যেন তোমার সুরেরই বুলবুলি।
ঝরাপাতায় যে সুর ঝরাও, আমি তুলে লব—
তোমার গানের সুরের পরশ পাই যে নব নব।

তোমার সুরের হিল্লোলে ওই দরিয়ায় ঢেউ ওঠে—
কল্লোলিত জীবন-নদী সাগর পানে ছোটে!
আলোর বাজনা সূর্য বাজায় আঁধার-অসুর নাশি—
নীল-সবুজের বনে বনে বাতাস বাজায় বাঁশি!

তুমি অপার সুরের সাগর, আমি কি বা কব—
তোমার গানের সুরের পরশ পাই যে নব নব।

জীবিকা ও জীবন

বিনম্র বিশ্বাস

জীবন যেন নয়রে জীবন,
জীবিকাতেই পূর্ণ,
জীবিকারই নিষ্পেষণে
হচ্ছে জীবন চূর্ণ!
মনটা তবু জীবন খোঁজে
জীবিকারই মাঝে,
জীবনের ওই নূপুর নাকি
জীবিকাতেই বাজে।

হতে চাই

রমলা বড়াল

বুড়ো মাঝি, খুশি আছ?
যদি চাই দেবে আজ বর?
করে দাও নিপুণ ধীবর।
সব পাকা মাঝি হয় নিপুণ নুলিয়া
নুলিয়া ডুবুরী হয়
ঝাঁপ দেয় সময়ের সাঁড়াসাঁড়ি বানে—
শুক্তির ফসল আর প্রবালের বোল চুঁড়ে আনে।
যদি কিছু নাই পাই, অদূরে নাই যেতে পারি—
তবুও লবণ জলে মাছের রঙিন পুচ্ছ খুঁজে খুঁজে
দূরে চলে যাব—
ডুবুরী না হতে পারি—
ডিঙি থেকে ছুঁড়ে দেব জাল
মেঘলা আকাশ আর উদিলা আঁশটে ছেঁড়া পাল
নিয়ে যাবে ঝাঁকেদের কাছাকাছি।
রুপোলী ইলিশ—চকচকে সাদা আর
প্রকৃতির নিখুঁত পালিশ
অন্ততঃ গোটাকয় জুটবে না আমার কপালে!
বুড়ো মাঝি,
সারাদিন বসিয়ে রাখবে শুধু হালে?
বিদ্যেটা শেখাবে না? কোনদিন দেবে নাকো বর?
শুধুই দেখব নদী? শুধু ঢেউ? শুধু জল?
নিজে বুঝি হব না ধীবর?

বিল্বমঙ্গল

রতনকুমার নাথ

সোনালী বিকেল, নীল নীলিমায় অস্তরাগের মায়া
মুক্ত হৃদয় হাঁটিছে বিল্ব শান্ত সৌম্য কায়া।

আলুথালু কেশ, গৈরিক বেশ, সারা মুখভরা দাড়ি,
উদাসী নয়ন, খোঁজে অনুখন প্রেমময় গিরিধারী।

কামনার দাহ, বাসনাপ্রদাহ, ধুয়ে নয়নের জলে
রেখেছে আপন হৃদয়-কমল কৃষ্ণচরণতলে।

পথে যেতে তার নয়নে পড়িল অপরূপা এক নারী,
কামনা অবশ হলো তার মন, ভুলে গেল গিরিধারী।

হৃদয়ের আলো, নিমেষে ফুরাল, থেমে গেল শ্যামগান,
বাসনাদহনে ছাই হলো তার পবিত্র দেহ-প্রাণ।

আসিল বিল্ব, তারে অনুসারি, রূপবতী গৃহঠাঁই :
স্বামী এসে তার নমিল চরণ, শুধাল, 'কি প্রভু চাই ?'

শ্মশ্রুগুম্ফ-আবৃত সাধু সহসা কহিল তারে—
"একবার শুধু পত্নীকে তব চাই আমি দেখিবারে।"

চমকি উঠিয়া সাধুমুখে শুনি নিদারুণ প্রার্থনা
পূর্ণ করিল অভীপ্সা তাঁর গৃহস্বামী পূতমনা।

হেরিল বিল্ব রূপবতী-রূপ, কহিল—"মাতৃসমা !
তোমার খোঁপার দুটি কাঁটা দাও, অপরাধ কর ক্ষমা।"

নিয়ে দুটি কাঁটা আপন নয়নে বিঁধিল আপন হাতে
রক্তের ঢেউ ছলকি উঠিল অন্ধ-নয়নপাতে।

কপোল বাহিয়া অশ্রুরক্ত নীরবে পড়িল ঝরি
যন্ত্রণাময় প্রশান্ত মুখ হাসিতে উঠিল ভরি।

করজোড়ে কয় সাধক বিল্ব—"গিরিধারী, অনুপম,
পাপ আঁখি মোর করেছি ছিন্ন, দেখা দাও প্রিয়তম।

রূপের লালসা, কামনার কালি দুহাতে ফেলেছি তুলি,
এস, গিরিধারী, হৃদয়-নয়ন দাও দাও মোর খুলি।

হৃদয়-নয়নে হেরিব তোমার চির-অপরূপ জ্যোতি,
চরণে তোমার ঠাঁই দাও দেব, কৃষ্ণ মথুরাপতি !"

রূপান্তর

প্রভাকর মাঝি

শেঠ যাচ্ছেন বাণিজ্যে সফরেতে,
গাঁয়ের বুড়ীমা বললেন কাছে এসে,
আমার জন্যে এনো বাপু, মনে করে
সাধু-সন্তের একটি টুকরা হাড়।
বড় সাধ তাকে বেদীতে স্থাপনা করে
জানাব নীরব প্রাণের পূজাঞ্জলি,
প্রভুর করুণা পুণ্য করুণা পেয়ে
উদ্ধার পাব জীব-জন্মের থেকে।
শেঠ চলে যান ব্যবসায়ী-সফরেতে—
এখানে-ওখানে বহু মাল বেচা-কেনা,
আসতে কদিন পরে রাস্তার পাশে
দেখলেন মৃত কুকুরের হাড়-গোড়।
বুড়ীমার কথা তখন পড়ল মনে,
তাই তো বড়ই ভুল হয়ে গেছে দেখি,
শ্রেষ্ঠী ভাবেন—এখন কি যায় করা ?
এমনিতেই তো দেরি হয়ে গেছে তাঁর।
যাই হোক, সেই সারমেয়-অস্থির
একটা টুকরা সংগ্রহ করে নেন,
বুড়ীমা আসতে জানালেন উল্লাসে
'সারিপুত্তের এই পূতাস্থি নিন,
খোঁজাখুঁজি করে অনেক কষ্টে পাওয়া।'
আহ্লাদে গদগদ বৃদ্ধার মন ;
বেদিতে রাখে সে সরল বিশ্বাসেতে
সভক্তি পূজো প্রতিদিন করে যায়।
পূতাস্থি তার জপ তপ ধ্যান জ্ঞান।
প্রতিদিন করে অঙ্গন-মার্জনা।
প্রতিদিন যায় বনফুল চয়নেতে,
মন্ত্র কোথায় ! তপ্ত চোখের জল !
মুখে মুখে কথা ছড়াল সারাটা গ্রামে
ভক্তেরা দলে দলে বিস্ময়ে দেখে—
অর্চনারত বুড়ীমা চোখের জলে
এবং অস্থি আলো বিকিরণ করে।
বাতাসের আগে ছুটে যায় সংবাদ
শ্রেষ্ঠীও এসেছিলেন খবর শুনে
অস্থির থেকে দিব্যজ্যোতি দেখে
চোখে জল তাঁর—আর গেলেন না ফিরে।

তোমাতেই লীন

দেবাশিস ঘোষাল

তোমাকে দেখেছি আমি
সৃষ্টির শালগ্রাম শিলায়
বুঝেছি তোমার শক্তি
ধ্বংসের তাণ্ডব লীলায়
পৃথিবীর প্রতি জীব জড়
অণু-পরমাণু
নিয়ত সম্মুখে তব
হয়ে নতজানু
করিছে প্রণাম।
শব্দতরঙ্গ শুধু
গাহে তব নাম
জেনেছি তুমি তো এক অখণ্ড
আপনারে ব্যাপ্ত করি
হয়ে খণ্ড খণ্ড
সবাকার মাঝে
তোমার অস্তিত্ব তাই
অবাধে সর্বত্র বিরাজে
যত জানি যত দেখি
ব্যবধান হয়ে আসে ক্ষীণ
অপেক্ষা করিয়া আছি
কবে হব তোমাতেই লীন।

অন্তর বাজে—যন্তর বাজে

কমলা সেন

এ কোন্ খ্যাপা বাউল প্রেমানন্দে নাচে প্রাণের অঙ্গনে!
ভয়-ভাবনা ভুলে এবার ঐ প্রেমিকের সঙ্গ নে।
দ্যাখ চেয়ে ওর চোখের তারায়
দুঃখ-ব্যথা কোথায় হারায়—
ও গান ঝরিয়ে আপনা বিকায় কাহার চরণে!
কত দুঃখের সাধন সেধে ঠাকুরে চায় রাখতে বেঁধে,
সে যে ধরা দিয়েও লুকিয়ে পড়ে কোথায় কে জানে!
প্রেমের রঙে বসন রাঙা
কোথায় গো কূল কোথায় ডাঙা,
যাঁর প্রেমে ও পাগলপারা তাঁরই শরণ নে।
একতারাটির একটি তারে
পরাণ-সখার নাম বাজে রে
সেই নামের মধু পান করে তার সুরটি সেধে নে।
বুকের মাঝে নামটি বাজে তালে তালে চরণ বাজে,
পরাণ নাচে চরণ নাচে শ্রীনাথ-কীর্তনে।
বৈরাগীর ঐ হাতের ঝুলি শুধোচিতে দ্যাখনা খুলি—
পারের কড়ি মিলেছে ওর প্রেমের সাধনে।
অন্তরেরই নয়ন মেলে শুদ্ধ প্রেমের প্রদীপ জেলে
নিতুই দ্যাখে ঠাকুরে তার হৃদয়-ভুবনে।
বলি তোরে গোপন কথা, খুঁজিস নে আর যথা তথা
ঘরছাড়া ওর সাথী হয়ে পথটি চিনে নে।

প্রেমের ঠাকুর

সন্তোষ চৌধুরী

"ওঁ নমঃ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ ॥"
অপার করুণাসিন্ধু ভুবনমোহন,
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হৃদয়রঞ্জন ॥
প্রেমের ঠাকুর আমার নিত্য নিরঞ্জন,
ঘরে ঘরে মায়ের নাম করেন বিতরণ ॥
জগৎগুরু কল্পতরু পতিতপাবন,
দক্ষিণেশ্বর লীলাভূমি হলো তীর্থস্থান ॥
দক্ষিণেশ্বরের মাটি হলো চন্দন সমান,
যেথা লীলা করেন রামকৃষ্ণ ভগবান ॥
ধূলি নয়, ধূলি নয় বৃন্দাবনের রজঃ;
যেথা আছে রামকৃষ্ণ-চরণপঙ্কজ ॥
মাখরে ভাই সর্ব অঙ্গে পরম যতনে,
প্রেমানন্দে রামকৃষ্ণ বলরে বদনে ॥
"ওঁ নমঃ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ ॥"

এক-অক্ষরা

অনিলেন্দু ভট্টাচার্য

একটি নাম এক অক্ষর
বীজমন্ত্রের মতো অনুপম মধুক্ষরা
জীবনদায়িনী এক অত্যুজ্জ্বল মর্ত্য-মহিমা।
বিপদ বিভ্রান্তি বিভীষিকায়
ওই নামে ক্ষরিত হয় অভয় আস্বাদ।
অনুভূতির নিমগ্ন উৎসার
রক্তে-রক্তে প্রফুল্ল প্রবাহে
অসীম আনন্দ আনে প্রাণে
নিরন্তর উদ্দীপ্ত হয় অন্তর আকাশ
নমনীয় সংকল্প সাধনে।
একটি নাম এক অক্ষর
মা নামে নম্র হয়ে ডাকা
সংসারের সীমিত বন্ধনে সে মা ছিল আবদ্ধ.
পালনে মমতায় শুশ্রূষায়, লালনে সেবায় পরিচর্যায়
শুভাশুভ কামনায় সে চোখে ছিল
সকাতর উৎসুক প্রতীক্ষা।
উপমাহীন এক অক্ষর বজ্রসম সেই নাম
আদি-অন্ত রক্ষা করে ;
করুণ-কটাক্ষে অনিত্যেও নিয়ত নিত্য উপস্থিতি।
গুণাতীত অনন্ত অনঙ্গে প্রচ্ছন্না জননী
মহাকালের আসনে পূজিতা ;
প্রার্থনাকারী সন্তানের মোহপাশ ছেদনে
প্রসারিত বাহুদ্বয় তূর্ণ-তৎপরা॥

আশা জাগে মনে

শান্তিকুমার ঘোষ

জ্ঞানময় বীজ
বীজ থেকে তরু
বৃক্ষ ডালপাতা মেলে দিয়েছে আকাশে
শিকড় নামিয়েছে মাটির গভীরে
দেয় বছর-বছর ধরে ছায়া
আমি তারই তলে
বসে আছি গুড় আর জল নিয়ে
আশা জাগে মনে
ফেরার সময় তৃষার্ত ঘেসেড়া
যদি একটু জিরিয়ে যায় আমার কিনারে।

আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও

নিমাই মুখোপাধ্যায়

শৈশবে জ্ঞান হবার পর
যে চোখ দিয়ে তাকিয়েছিলাম
সে চোখ হারিয়ে গেছে।
আমি ধীরে ধীরে বড় হয়েছি
দু'চোখ দিয়ে দেখেছি এই পৃথিবীকে
উপভোগ করেছি এর সৌন্দর্য।
এই চোখ দিয়েই দেখেছি দেবতার মতো মানুষ
আবার এই চোখেই দেখেছি মানুষের নীচতা
দীনতার কত রূপ।
জীবনে চলার পথে এ চোখ কত লোককে
স্বাগত জানিয়েছে
কত লোককে বিদায়।
আজ বলতে পারব না কেন ও বড় ক্লান্ত,
ওকে সজীব করতে চেষ্টা করছি
মানুষের মাঝে দেবত্বের রূপ দেখব বলে।

এনে দিক সহস্র ক্ষমা

নিভা দে

ভিতরে এত কেন দহন তোমার '
কেন শূন্যে তোল শুধু অপার্থিব ধনুক-টংকার '
এত কেন ক্ষমাহীন তুমি ?
এত তরল আগুন বুকে নিয়ে
পূর্ণিমার অভিলাষে যদি যাও
আরো যাবে জ্বলে আপাদমস্তক
দাউ দাউ ঈর্ষাবিষে অনেকেই
সারাটা জীবন পুড়ে পুড়ে
আলোহীন ধোঁয়া দেয় ;—চারিদিক
ভরে দেয় আবহ মৃত্যুলীন করুণ বিষে।

এত দহন কেন পুষে রাখো বুকের ভাঁজে ?
রাত্রির আকাশ-মুখে খুলে দাও বুকের মর্মর
ঝুরু ঝুরু ঝরে যাক—বিষের পাথর ক্ষুব্ধ সন্ত্রাস
শান্তির শ্বেত পারাবত খুঁটে খাক দানা
হৃদ্ধ্বদ উল্লাসে ঠোঁট ভরে এনে দিক সহস্র ক্ষমা।

চলোর্মি

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

জীবন একার
জীবনীও একারই তো—
তবু একাধিক।

মন নিজস্ব
মননও নিজস্বেরই তো—
তবু সর্বজনীন।

প্রাণ বুকের
প্রাণনও বুকেরই তো—
তবু সে বৌদ্ধিক।

দেহ গ্রন্থীর
দৈহিক গ্রন্থীধারারই তো—
তবু সর্বাধীন।

মস্তক দেবশীর্ষ
মস্তিষ্কও দেবতাই প্রায় তো—
তবু যন্ত্রে যন্ত্রণার।

দুচোখে চিত্রালী
চাক্ষুষ চেতনারই তো—
তবু তা বিবর্ণে।

বুদ্ধি নিশ্চিন্তি
বোধি সত্যে অভ্রান্তিই তো—
তবু ছিদ্রান্বেষী মন্ত্রণার।

কথা ভাবনার
কথাকলি বিকশিত ভাবেরই তো—
তবু শোনে সংকু কর্ণে।

জীবন মন প্রাণ,
দেহ বুদ্ধি চোখ মস্তক কথা তো—
তবু মিলিত বিধান।

সব একা
সর্ববিধ একাকীত্ব তো—
তবু চলোর্মি—মহান।

ভারত—আমার জন্মভূমি

মধুসূদন পাল

মাতৃমমতার মতো দশদিকে আশ্চর্য ধরণী—
নিয়ত সেখানে
কী দারুণ পুরুষ সংগ্রামে
চারা ধান ধীরে ধীরে দুগ্ধবতী হয়,
ঋতুমতী নারীর মতো গাঢ় হয় ডালিম বাগান।
নিয়ত সেখানে
কী কঠোর ধ্যানে ও সেবায়
বকের পাখার মতো জেগে ওঠে কার্পাস বাগিচা।
ঈশ্বরের হাসির মতো সুরভিত ফুলের সঙ্গীত।
নিয়ত সেখানে
প্রতিকূল পাহাড়-চূড়া হাঁটু ভেঙে করে দেয় পথ,
নদীর অতল থেকে উঠে আসে দশ হাজার
সুখের সম্পদ
হে ভারত, হে প্রমত্ত বিলাসী আমার জন্মভূমি
তুমি তার কতখানি জান? কিছু জান?
জান সেই আসমুদ্র হিমাচল
অশ্রু প্রেম যুদ্ধের কাহিনী?
বস্তুতঃ কিছুই জান না—
হে দিব্যকান্তি, নধর জন্মভূমি,
এক ফোঁটা ঘামও ফেলনি তুমি ঐ সব জানার আগ্রহে।
কেননা, তুমি তো মানুষ নও
গন্ধে পুষ্পে অলঙ্কৃত সুবিশাল পিত্তল বিগ্রহ
কিংবা কোনও বিগ্রহের বিশুদ্ধ সেবক।
অথচ কে না জানে
হে মদমত্ত উদ্ধত জন্মভূমি,
ওরকম মমতাহীন কলুষ জীবনে
মাতৃমমতাও নির্বাসনে যায় স্বাহা-র তুমুল উত্থানে।

অঙ্ক-কবিতা

সোফিওর রহমান

একটিই স্বপ্ন : সময়ের
এবং একটিই রঙ : নতুন।
একবারই সুখ : মুক্তি
আর একটাই দুঃখ : মানুষ।

শতাব্দীর খেলা
সুদীপ বসু

এখনো ব্যথার রঙ নীল হয়—
আমি তাই হেঁটে চলি
দূরে থেকে দূরতর বেদনার দিকে
ভালবাসার মানুষজন কেউ গেছে কেউ যাচ্ছে
কেউ যাবে কালো দেওয়ালের দিকে

উদিত সূর্যের বর্ণ আজো বদলায়
বর্ণালীর সাত রঙ খেলা করে শরীরে শরীরে
কামনার টোপে গেঁথে মানুষের দল
ছিপে তোলে স্বাদুতর মাছ

তবু কেন মানুষ বিবাগী হয়
দেশরাগে কান্নার সুরে ভাসে
বেদনারা নীল থেকে আরো নীল হয়
শতাব্দীর বুকে চিরে জোয়ার নেমে আসে।

একজন মানুষ
তাপস বসু

একজন মানুষ বড় হয়
আপন অস্তিত্বের অমেয় অনুভবে
একজন মানুষ বড় হয়
আত্মায় আত্মা সংযুক্ত করে
একজন মানুষ বড় হয়
আপন বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে এসে
একজন মানুষ বড় হয়
দুরন্ত লোভ আর অন্যায়ের কাছে নতজানু না হয়ে
একজন মানুষ বড় হয়
আপন সঞ্চয়ের ঝাঁপি সকলের জন্যে খুলে দিয়ে
একজন মানুষ বড় হয়
অগ্নিময় আত্মবিশ্বাসে আর ঈশ্বরে ভালোবাসায়
এস আমরা এমনভাবেই বড় হয়ে উঠি
এস আমরা এমনভাবেই উজ্জ্বল হয়ে উঠি।

অন্তর্গত শব্দ
সন্তোষকুমার মাজী

অন্তর্গত শব্দের নেশায় শুধু জেগে থাকি

সারা শীত জুড়ে অলৌকিক পাতা ঝরে
শব্দই হয় না, নাকি আত্মা অবিনাশী জেনে
পাতারা নিশ্চুপ, উত্তীর্ণ মৃত্যু থেকে
জেগে উঠবে একটু পরেই।

জলচৌকিতে পা ছড়িয়ে বসে আছে সময়
অথচ রক্তসূতোয় ক্রমাগত গেঁথে চলেছি শব্দশিল্প
স্তব্ধতাকে শাসন করছে আলোকপর্ণা সেই গান
অবলোহিত আলোয় ভেসে উঠছে
আমাদের চৈতন্য

অনাবিল স্বপ্নের মধ্য থেকে কুড়িয়ে আমি ঝিনুক
শব্দশস্য ;

সে সময়
অবিরাম ঝুঁকে থাকে কথার কাকলি, শব্দব্রহ্ম।

হারিয়ে যাই
অমর ষড়ংগী

আমার নিজের জীবনে আমি কিছু পেলাম না।
আমি যখন বিপন্ন, অস্থিরতা
যখন আমাকে অধৈর্য করে তোলে,
তখন আমি কেবল আমাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকি—
মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ক্ষত বিক্ষত হয়ে হয়ে
যখন আমার আর কিছু ভাল লাগে না—
ভরতনাট্যম, কত্থক নৃত্য,
অথবা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর।
তখন, আমি আমাকে সম্পূর্ণভাবে
ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি।
নির্ভরতার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় লাভের জন্য।
ঈশ্বর আমাকে দেখেন,
আমি বুঝতে পারি।
আমি তাঁকে দেখতে পাই না।
তাকিয়ে থেকে থেকে
অবশেষে আমি হারিয়ে যাই।
তাঁরই মধ্যে।

স্পর্শ

সন্তোষকুমার অধিকারী

অন্ধকার যত গাঢ় হয়,
জাগে তত ছায়া তার সামনে আমার।
নির্জন পথের চার ধার
শব্দ হলে চকিতে তাকাই,
ঘাসের গোপনে সরীসৃপ
আকাশে মেঘের পুঞ্জ, নিশাচর পাখি মেলে ডানা,
গাঢ় হয়ে ওঠে অন্ধকার
স্পর্শ তবু পাই যেন, হয়তো এবার
ছায়া তার হৃদয়েরই কাছে।
চোখ বন্ধ করে দেখি, পরিব্যাপ্ত মৃত্যুর অতল,
ভয়ে কাঁপে হৃদয়—'ওগো, না,
এ আঁধার চাইনি জীবনে।
তুমি যে আলোকে দীপ্ত, আশ্বাসে উজ্জ্বল।'
তবু সে বিজন বন স্পর্শময় হয়ে ওঠে,
ছায়া দোলে তমসায়।
কথা বলে বাতাস, হৃদয়ে
শূন্য হয়ে ভেসে থাকে কামনার বস্তু।
নিবিড় মৌনতা শুধু ছুঁয়ে যায় অসাড় চেতনা।
জেনেছি এবার তাকে,
যে আছে জীবনে, আছে মৃত্যুর উৎসবে
আলোকে আঁধারে একাকার।

অন্য বাঁচা

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

একটি সুস্থ সকাল বুকের অন্ধকারে ধরে রাখি
গায়ে মাখি নবীন সূর্যের নরম আঁচ।
এতকাল অন্য পথে নিজেকে ভাসিয়েছি
পথের আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি সূক্ষ্ম অনুভূতি
বেঁচে থাকার প্রিয়তম স্বাদগুলি,
একটু ফিরে দেখার বা দেখে ভাবার
ফুরসৎ পাইনি কোনদিনও।

এখন পুড়ে-পুড়ে, ক্ষয়ে, গলে
যেটুকু অবশিষ্ট আছে
তা-ই দিয়ে গড়ে তুলি নষ্ট বাড়িখানি।
খুব সহজে বুঝতে পারছি
সময় পশ্চিমে ঘুমিয়ে পড়ছে
হাওয়ারও জোর কমছে
মরচে ধরছে শক্তি আর সাহসে।

যতদিন বাঁচব
যেন রাখি নিজেকেই ধরে প্রিয় স্বপ্নে,
তারই ফাঁকে বারবার এসে
সুন্দর হেসে-খেলে যাক॥

কর্ম

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

সহজ আজ্ঞায় কর্ম ঘিরেছে সংসার
বৃক্ষের মতন স্পষ্ট নীরব যদি-বা
কার সাধ্য রাত্রি খায় চাঁদের জ্যোৎস্নায়
প্রেম!—সেও কর্মময়ী কর্মের টঙ্কার।

দুহাতে ধরেছ বৃত্ত পরিধি জাননি
পরিধিতে মহানিম ওপারে সীমানা

কুয়াশাকে প্রাজ্ঞ এক শ্মশান ভেবেছ
কী রূপ সেখানে তার খবর রাখনি।

নীরব অর্চনা কেন সার্থকতা পায়
কর্ম কি তাহলে আত্ম-উন্মোচন শুধু
এ সংসার চলে কেন, কার চক্রে বাঁধা
কোথায় ত্যাগের ইচ্ছা কর্মকে জড়ায়?

কর্ম কর্মী গৃহ মেঘ শুভময় ব্যথা
এইসব নিয়ে থাকে সম্পন্ন ব্যস্ততা।

প্রবন্ধ

ঠাকুর যদি আজ থাকতেন

স্বামী চেতনানন্দ

'যদি' শব্দটা সংশয়াত্মক। আর এই সংশয় থেকে মানুষের যত দুর্গতি। এই 'যদি' শব্দ ব্যবহার করার ফলে প্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিল ভট্টের কি দুর্গতি হয়েছিল সে-সম্বন্ধে একটি অপূর্ব কাহিনী আছে। কুমারিল ছিলেন দাক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ। বেদজ্ঞ দার্শনিক। কিন্তু বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তির নিকট তর্কে পরাজিত হয়ে তাকে পণ অনুসারে বৌদ্ধ হতে হয়। পরে তিনি নালন্দাতে ধর্মপালের কাছে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করেন। একদিন গুরু ধর্মপাল বেদের নিন্দা করায় কুমারিল গোপনে অশ্রু বিসর্জন করেন। জনৈক বৌদ্ধ তা দেখতে পেয়ে ধর্মপালকে জানায়। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কুমারিলকে বলেন: "এখনও বেদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা? তুমি ভান করে বৌদ্ধ সেজে আমার শিক্ষা নিচ্ছ? তোমার সাধ্য থাকে তো আমার বাক্য তুমি অপ্রমাণ কর।" ফলে ভীষণ বাক্‌যুদ্ধ শুরু হলো। ধর্মপাল যুক্তিশরে বিদ্ধ হলেন। শেষে কুমারিল বললেন: "সর্বজ্ঞের উপদেশ ভিন্ন জীব সর্বজ্ঞ হতে পারে না। বুদ্ধ বেদজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে বেদ মানেননি—ইহা তাঁর চৌর্য ভিন্ন আর কি?"

বৌদ্ধরা তখন ক্ষেপে গিয়ে কুমারিলের শরীরের ওপর অত্যাচার শুরু করল। গুরু ধর্মপাল বললেন: "একে তোমরা ঐ উচ্চ প্রাসাদ থেকে ফেলে বধ কর।" বৌদ্ধরা কুমারিলকে টেনে ছাদে তুলল এবং ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিল। পতনকালে কুমারিল উচ্চৈঃস্বরে বললেন: "বেদ যদি প্রমাণ হয়, তাহলে আমি যেন অক্ষত শরীরে জীবিত থাকি।" ভূতলে পতিত হয়ে কুমারিল মরলেন না। বৌদ্ধরা স্তম্ভিত হলো। কুমারিল বললেন: "ওহে অহিংসাপরায়ণ বৌদ্ধগণ, আমি দেখছি আমার চক্ষুতে একটু আঘাত লেগেছে। আমার এ ক্ষতি হতো না, যদি আমি 'বেদ যদি প্রমাণ হয়'—এই সংশয়াত্মক বাক্য প্রয়োগ না করতাম।" বৌদ্ধেরা কুমারিলের দৈবশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে ছেড়ে দিল।

কুমারিল তো তাঁর বিশ্বাসের জোরে রেহাই পেলেন, কিন্তু আমাদের গতি কি? আমাদের সন্দিগ্ধ মন ক্রমাগত সংশয়ের দোলায় দুলছে: "আজ যদি ঠাকুর থাকতেন?" "তিনি কি আছেন না নির্বাণ নিয়েছেন?" "কিন্তু—যেন—মনে হয়...।" এইসব সংশয়াত্মক ভাব মন থেকে সরাবার জন্য আমরা শাস্ত্র পড়ি, সাধুসঙ্গ করি, জপধ্যান করি, নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করি। তবুও সংশয় যায় না। আর এ সংশয় যাবেই বা কেন? একটা ক্ষুদ্র সর্ষের মতো বটের বীজের মধ্যে বিরাট বটবৃক্ষ লুকিয়ে রয়েছে—এ যেমন বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না, তেমনি অনন্ত বিরাট ঈশ্বর কি করে একটা সাড়ে তিন হাত মনুষ্য-শরীরে থাকতে পারেন, তাও ধারণা করা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো, সেবক রামলাল একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর সংশয়ের কথা বলেন: "আমি তাঁকে 'আপনি' 'আপনি' করতুম, খুড়ো বলে মনে হতো না। ঠাকুরের আচরণ ভাব ও সমাধি দেখে কিছু বুঝতে পারতুম না, মনে একটা সংশয় উঠত। ভাবতুম ইনি (অর্থাৎ ঠাকুর) একজন মুখ্যু, শুখ্যু মানুষ, এঁর কাছে কত বড় বড় লোক ও পণ্ডিত এসে পরাস্ত হচ্ছে, ইত্যাদি। ইনি কে, সত্যই কি ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন? একদিন আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'দেখুন, আমার মনে আপনার সম্বন্ধে সংশয় ওঠে, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।' এই কথা শুনে ঠাকুর আমায় বললেন: 'দেখ, বোঝবার কিছু নেই, তবে কি জানিস, যেমন জিলিপির পাক রে। জিলিপি গোল চক্রের মতো ঘুরানো আছে, ওপরে কিছু বুঝবার নেই, কিন্তু মিষ্টি রসে ডুবে ভরপুর রয়েছে। তুই যা মনে করেছিস (অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন) তাই যদি এটা (নিজ শরীর দেখাইয়া) হয় তো এটার সেবা করছিস, মা কালীর পুজো ও ভক্তদের সেবা করেছিস। আবার এই রক্তের (নিজ শরীর দেখাইয়া)

স্রোত তোর ভিতর প্রবাহিত হচ্ছে। এর বেশি আর কি চাস ?"[১]

প্রিয়জনের বিরহে মানবহৃদয়ে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এটি স্বাভাবিক নিয়ম। ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে যান, তখন রামলালদাদা ঠাকুরকে বলেনঃ "আপনি চলে যাচ্ছেন, আপনার জন্য বড় মন কেমন করবে।" তিনি শুনে বললেন ঃ "তুই মনে করবি যে, আমি যেন কলকাতায় গেছি, কি ঝাউতলায় শৌচে গেছি। আবার আসব এই ভাববি, তাহলে মন কেমন করবে না।"

রামলালদাদা পরবর্তী কালে ভক্তদের বলেছিলেনঃ "সেই অবধি মনে আর তেমন হয় না যে, ঠাকুর এখান থেকে চলে গেছেন। সর্বদাই মনে হয় তিনি রয়েছেন, তাঁকে দেখতে পাই।

"ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'যে আসবে চেনা হোক, অচেনা হোক, তুই তাকে একটু মিষ্টি, এক ঘটি গঙ্গাজল খেতে দিবি। তোকে আর কিছু করতে হবে না। এই করলে জপ-তপ-যাগ-যজ্ঞের ফল যা কিছু সব হবে।' তাই এইগুলি করি, তাই খুব আনন্দ পাই। আর বাস্তবিক ধ্যান-জপে তেমন মন বসে না। তবে অভ্যাসবশতঃ যা করি এই পর্যন্ত।"[২]

"এখন তাঁর (ঠাকুরের) ভক্তসংখ্যা বেড়েছে। এই কয় বৎসরের মধ্যে কত ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর ভাব। যাদের ভাষা জানি নে, এমন কত লোক দেশ-দেশান্তর থেকে এসে পঞ্চবটীতলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, ধুলি নিয়ে যায়, অশ্বত্থপাতা নিয়ে যায়, বেলপাতা নিয়ে যায়।"[৩]

একেই ভক্তিশাস্ত্রে বলে প্রেমের লক্ষণ। প্রেমাস্পদের অধর মধুর, বদন মধুর, রূপ মধুর, হাসি ও কথা মধুর, নৃত্যগীত মধুর, বাসস্থান, জিনিসপত্র সব মধুর। "মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।"

প্রিয়তমের বিচ্ছেদে দুঃখ আছে, আনন্দও আছে। পুকুরের অগভীর জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়লে মাছেরা আনন্দে খেলা করে আর ভাবে চাঁদ তাদেরই সঙ্গী। চাঁদ অস্ত গেলে তারা বিষাদগ্রস্ত হয়: আবার চাঁদের অপেক্ষায় ক্ষণ গোণে। পদ্ম সূর্যোদয়ে বিকশিত হয়; আবার সন্ধ্যাগমে পাপড়িগুলি বন্ধ করে সারারাত প্রিয়তমের ধ্যানে কাটায়। ঐ ধ্যানে আনন্দ আছে। আমরা স্থূলবুদ্ধির মানুষ, তাই ক্ষণিক স্থূল শরীরের মিলনের আনন্দটাই বুঝি। সূক্ষ্ম মনের বা আত্মার মিলনানন্দ যে দীর্ঘস্থায়ী তা বুঝতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে লিখেছেন, "প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে: / দেখা নাই পাই/ পথ চাই, / সেও মনে ভাল লাগে।"

আমরা অনেক সময় ভাবি, আমরা যদি ঠাকুরের কাছে থাকতাম কি আনন্দটাই না হতো! স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন ঃ "ঠাকুরের কাছে কি আনন্দেই ছিলুম! এখন ধ্যান-ধারণা করে যা না হয়, তখন তা আপনিই হতো।"[৪] স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন ঃ "ঠাকুরের সঙ্গে এক ঘণ্টার কীর্তনে যা আনন্দ হতো, তাতে সারাজীবনের দুঃখকষ্ট পুষিয়ে যেত।"[৫]

আবার শ্রীম বলেছেন ঃ "কাছে থাকলেও চিনতে পারা যায় না। কেবল তিনি চেনালে চেনা যায়। হৃদয় মুখুজ্যে ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমায় আবার নেও মামা।' ঠাকুর উত্তর করলেন, 'কেন ? তুই না বলেছিলি, তোমার ভাব তোমাতে থাক।' আবার কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলেন, 'আমি কি তখন তোমায় জানতুন ?' অমনি ঠাকুরের চোখে জল! তাঁকে চিনতে পারা যায় না, তিনি না চেনালে। কাছে যখন ছিলেন হৃদয় তখন চিনলেন না। Separation (ছাড়াছাড়ি) হলে চিনলেন।"[৬]

চর্মচক্ষে দেখা আর ভাবচক্ষে দেখা

মানুষ চর্মচক্ষে ঈশ্বরের মায়িক জীবজগৎ দেখে। এ দেখার শেষ নেই। মায়া একককে বহু করে, তাই এই জগৎ বৈচিত্র্যময়। তারপর সাধনার দ্বারা চর্মচক্ষু

১ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ—কমলকৃষ্ণ মিত্র, পৃঃ ৬২
২ ঐ, পৃঃ ৬-৭, ৬১-৬২
৩ শিবানন্দ বাণী, ১।১৩৩
৪ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৪০
৫ স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য (১৩৬২), পৃঃ ৩১
৬ শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ১৩শ ভাগ, পৃঃ ১৯৯–২০০

ভাবচক্ষু বা প্রেমের চক্ষুতে পরিণত হলে সেই মানুষ বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব দেখে। একে বলে সমত্ব দর্শন বা জ্ঞান। তখন অনুভব হয়—উপনিষদের ভাষায়—একই অগ্নি যেমন দাহ্যবস্তুর আকার অনুযায়ী সেই সেই আকারবিশিষ্ট হয়, সেরূপ অদ্বিতীয় আত্মা (সর্বান্তর্যামী) বিভিন্ন জীবদেহে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের সদৃশ হন। আবার তাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট হয়ে তদতিরিক্তরূপে বর্তমান থাকেন।[৭]

শ্রীম একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের দর্শন সম্বন্ধে বলেন: "একদিন ঘরে গান হয়েছে। অনেক লোক আছে। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'মা এসেছেন, মা এসেছেন। এসো গো মা, বসো।' সত্যি যেন কেউ এসেছেন, এই ভাব, এইরূপে আদর আপ্যায়ন করলেন। আর একদিন খুব গান হয়েছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের লোক রয়েছেন। ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'মা এসেছেন, মা এসেছেন' বলে। বিশ্বাস হয় না লোকের, তাই আবার বললেন, 'মাইরী বলছি, মা এসেছেন'।"[৮]

আমাদের ঠাকুরের মতো চোখ নেই যে, মা জগদম্বাকে ঠাকুরের মতো 'সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ' রূপে দেখব। আমরা ঠাকুরের বিষয় শুনি, পড়ি, ঠাকুরের লীলা স্মরণ করি, তবুও তাঁকে জীবন্ত বোধ হয় না। কারণ কোন কিছু সরস করতে হলে হৃদয় ও মস্তিষ্কের মিলন চাই। কেবল বুদ্ধির আশ্রয় করলে বস্তু প্রাণশূন্য হয়ে পড়ে। শ্রীম ভক্তদের ঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন scene রোজ একটি করে ধ্যান করতে বলতেন, যেমন: (ক) দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যার সময় ঠাকুর নিজ আসনে উপবিষ্ট। ধ্যানান্তে ভক্তদের বললেন, 'যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করে তার সন্ধ্যার দরকার হয় না।' (খ) আকাশে নবীন মেঘ উঠেছে। তার প্রতিবিম্ব গঙ্গার জলে পড়েছে। ঠাকুরের পিছনে এই কাল চালচিত্র। তিনি পঞ্চবটী থেকে ঘরে আসছেন। (গ) বলরাম-মন্দিরে। বলরামের বাপকে বলছেন, 'অনেকেই একঘেয়ে, কিন্তু আমি দেখি সব এক।... যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার।'[৯]

ঈশানচন্দ্র রায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শন' প্রসঙ্গে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন:

"খ্রীস্টভক্ত জনৈক বন্ধু দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'হায়রে, যদি উনিশশত বৎসর পূর্বে জন্মিতাম!' শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত একজন বলিয়াছিলেন, 'যদি ঠাকুরের সময়ে থাকিতাম!' তাঁহাদের মনোগত ভাব এই যে, তাহা হইলে নিজের উপাস্য দেবতাকে দর্শন করিয়া তাঁহারা ধন্য হইতেন। লেখকেরও মনে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্দর্শনের অভিলাষ একবার জন্মিয়াছিল। সাধু অভিলাষ ভগবানের বিধানে অপূর্ণ থাকে না। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, নরদেহ ত্যাগ করিলে মানুষ-মাত্রই চর্মচক্ষুর অদৃশ্য হয়; সেই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন সম্ভব কি?

"কোনও মহাপুরুষ, যুগমানব, যুগাবতারকে চর্মচক্ষুতে দেখিতে পারা মহা সৌভাগ্যের বিষয়; কিন্তু মানুষ তো দেখিয়াও দেখিতে পায় না, চিনিয়াও চিনিতে পারে না। ভগবান যীশুকে দেখিয়াছিল সহস্র সহস্র লোক; কিন্তু মেরী ম্যাগডেলেন এবং এরিমেথিয়ার যোসেফ যে যীশুকে দেখিয়াছিলেন, সেই যীশুকে তো ফ্যারিসীদিগের সৈন্যরা দেখিতে পায় নাই। যদি দেখিতে পাইত তবে যীশুকে নির্যাতন করিতে, ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করিতে তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। সুতরাং চর্মচক্ষুতে দর্শনই চরম দর্শন নহে।

"এ-সংসারেও মায়ের চোখে কালো ছেলে হয় নীলমণি, কানা ছেলে হয় পদ্মলোচন! প্রণয়ী Helen's beauty দেখেন in Ethiope's brow, যে নারীকে একজন করে অবহেলা, তাহাকে আর একজন সর্বস্ব পণ করিয়া বরণ করে। কেন এমন হয়? ইহার কারণ, চর্মনেত্রে দর্শন অপেক্ষা ভাবনেত্রে দর্শন শ্রেষ্ঠ। চর্মচক্ষুতে যাহা দেখা যায় না, ধরা যায় না, ভাবনেত্রে তাহাও দেখা যায় ও ধরা যায়।

"কেহ মনে করিতে পারেন, ভাবনেত্রে দর্শন তো কল্পনারঞ্জিত, সুতরাং অবাস্তব; কিন্তু এ কথা যথার্থ নয়। মায়ের চোখে সন্তানের যে সৌন্দর্য ধরা পড়ে, সেই সৌন্দর্য সন্তানে যথার্থই বিদ্যমান

৭ কঠ উপনিষদ, ২।২।৯

৮ শ্রীম-দর্শন, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৬৫

৯ ঐ, পৃঃ ২৬৭–২৬৮

থাকে, তাহা বাস্তব। সুতরাং চর্মচক্ষুতে দর্শনের ফল যেরূপ সত্য, ভাবচক্ষুতে দর্শনের ফলও সেরূপই সত্য।"[১০]

শাস্ত্র বলেন, "ভাবেন লভতে সর্বং ভাবেন দেবদর্শনম্।" শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি, কথা, গান, লীলাস্থান মনকে ঠাকুরের ভাবে উদ্দীপিত করে।

ভাগ্যবানেরা দেখতে পায়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছেঃ "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়। / কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥" আমরা আমাদের ভাগ্যকে দোষারোপ করি, কারণ ঠাকুরকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পড়ে সাময়িক অনুপ্রেরণা বোধ করি, আবার মন সেই অবসাদে ডুবে যায়। হা-হুতাশ করি। ভাবি—এ জীবনটা ব্যর্থ হলো।

শ্রীম এবিষয়ে একটু আশার কথা বলেছেনঃ "আজও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখা যায়। যদি কেউ বই পড়ে—কখন কোথায় বসেছিলেন, কোথায় কি করেছিলেন, এসব জেনে নিয়ে নিজেরেও ঐ স্থানে ঐ সময়ে ঐ সঙ্গে আছে বলে মনে করে কল্পনার ছবি আঁকে, তাহলে আজও তাঁর সঙ্গ করা যায়, তাঁকে দেখা যায়। আজ যা কল্পনা বলি তা বাস্তব। কল্পনা ঘনীভূত হলে দর্শন হয়। আবার যোগ-শাস্ত্রে সব বর্তমান—অতীত, ভবিষ্যৎ নাই।"[১১]

নবাগত লাটু মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অনুপস্থিত কালে কিভাবে তাঁকে দর্শন করেছিলেন, সে-প্রসঙ্গে রামলাল-দা বলেনঃ "বালককে (লাটুকে) দেখি গঙ্গাতীরে বসে কাঁদছে। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলুম পরমহংস মশায়ের জন্য তার বড় মন কেমন করছে।... বালক নাকি কার নিকট হতে শুনেছে যে, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিত্য অবস্থান করেন—দেশে গেলেও তিনি দক্ষিণেশ্বরে আছেন এবং সেইখানেই তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। এই বিশ্বাস নিয়ে বালক বসে আছে দুপুর থেকে প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত। সন্ধ্যা হয় হয় দেখে আমি তাকে বাড়ি যেতে বলি। আমার কথা শুনে বালক কি বললে জান?—'হামি ঠিক শুনেছি তিনি ইখানকে আছেন—হামি তাঁর সাথে দেখা না কোরে যাবে না।' আমি যত বলি—'না রে না তিনি দেশে গেছেন।' বালক ততই নিশ্চিত প্রত্যয়ে বলে—'আপুনি জানেন না; পরমহংস মশায় ইখানকে আছেন।' বালকের এই দৃঢ় বিশ্বাস দেখে আমি আর কিছু বলতে পারলুম না। মন্দিরে সন্ধ্যারতি করবার জন্য ফিরে গেলুম। মন্দিরে এসে মনে পড়ল যে লালটুকে তো মায়ের প্রসাদ দেওয়া হয়নি। প্রসাদ নিয়ে তার কাছে গিয়ে দেখি যেন কাকে ও প্রণাম করছে। কিছু বুঝতে পারলুম না—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মিনিট দুই-তিন পরে বালক সামনে আমাকে দেখে যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে 'পরমহংস মশায় কুথায় গেলেন?' আমি তো থ হয়ে গেলুম। কোন উত্তর দিতে পারলুম না। বালককে প্রসাদ দিয়ে মন্দিরে ফিরে গেলুম।"[১২]

স্বামী শান্তানন্দ রামলাল-দার কাছ থেকে আর একটি ঘটনা শুনে উদ্বোধনে (৪৯ বর্ষ, পৃঃ ৪৩০) লেখেনঃ

"রামলাল চট্টোপাধ্যায় (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) আমাকে বলিয়াছিলেন, 'অযোধ্যায় একজন যুবক রামাৎ সাধু বুঝতে পারলেন যে, ভগবান আবার ধরাধামে (পূর্বাঞ্চলে) অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি তাঁকে দেখবার জন্য অযোধ্যা হতে পদব্রজে রওনা হলেন। আসতে আসতে বাংলাদেশে এসে শুনলেন যে, কলকাতার নিকটে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একজন বড় সাধু আছেন। সন্ধান করে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই জিজ্ঞেস কচ্ছেন, তিনি (রামকৃষ্ণ পরমহংস) কোথায়? কালীবাড়ির লোক তাঁকে বললে যে, এই কয়েক দিন হলো তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন। এই কথা শুনে সাধুটি 'হাম এতনা তকলিব করকে অযোধ্যাসে উনকো ওয়াস্তে পয়দল আতে হে, আউর ও শরীর ছোড় দিয়া?' এই বলে খুব কাঁদতে লাগলেন। ওঁকে কালীবাড়ির সদাব্রত হতে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে কিন্তু তিনি কিছু না খেয়ে ২।৩ দিন পঞ্চবটীতে পড়ে রইলেন। এসময় একদিন রাত্রে তিনি দেখেন

১০ উদ্বোধন, ৪৯ বর্ষ, পৃঃ ৭০—৭১ ১১ শ্রীম-দর্শন, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৩০
১২ লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৪২

—নহবতের পাশে বকুলতলার ঘাট দিয়ে ঠাকুর গঙ্গা থেকে উলঙ্গ অবস্থায় উঠলেন ; উঠে ওঁকে বললেন, 'তুই এ কদিন খাসনি, এই পায়েস এনেছি, খা।' এই বলে ওকে খাওয়ালেন এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরদিন সকালে আমি পঞ্চবটীতে গিয়ে দেখি সাধুটির খুব আনন্দ। জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি এতদিন বিমর্ষ ছিলে, এখন হঠাৎ তোমার এত আনন্দ দেখছি কেন ?' সাধুটি তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন এবং ঠাকুর যে মাটির সরাতে করে ওঁকে পায়েস খাইয়েছিলেন সে সরাটিও দেখালেন। রামলাল-দা সেই সরাখানা বহুকাল যত্ন করে রেখেছিলেন, তারপর কিভাবে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে।"

রামকৃষ্ণলোকে থাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ কি কেবল কামারপুকুরে, কাশীপুরে বা বেলুড় মঠে ? তিনি ভগবান। স্থানকালের অতীত, তিনি সর্বত্র। তিনি সব জীবের ভিতরে আছেন, তবে মানুষে বেশি প্রকাশ। শ্রীম বলতেন : "ঠাকুর কৃপা করে এমনি একটি চশমা পরিয়ে দিয়েছেন চোখে, তাতেই সব লাল দেখি, সবকে আত্মীয় বলে বোধ হয়, সব আপনার জন।"[১৩] একেই বলে প্রেমের চক্ষু। এই চক্ষু খুললে সবাইকে রামকৃষ্ণের লোক বলে মনে হয়।

ভক্তরা অনেকে কল্পনা করেন যে, মৃত্যুর পর আমরা সব 'রামকৃষ্ণলোকে' চলে যাব। একদিন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কথা প্রসঙ্গে বলেন : "আমার মনে একটি প্রশ্ন উঠে—'দেহ ছেড়ে গেলে কোথায় যাব ?' মহাপুরুষ মহারাজ এ-সম্বন্ধে বলেন, 'আমরা রামকৃষ্ণলোকে চলে যাব। ঠাকুর থাকবেন, আমরাও সেখানে থাকব।' আমি বলি, কোন লোকে যাচ্ছি না। External কোন world-এ যাচ্ছি না। ঠাকুরকে সদাসর্বদা মনে রাখতে পারলে, তাঁকে ক্ষণমাত্র না ভুলে গেলেই তাঁর কাছে থাকা হলো। মন যখন সদাসর্বদাই ঠাকুরের ভাবে ও চিন্তায় ডুবে থাকবে, যখন মুহূর্তের জন্যও বিস্মরণ হবে না ; তখন যেখানেই থাকি না কেন সেই রামকৃষ্ণ-লোকেই থাকা হলো।"[১৪]

শ্রীমর ডায়েরী মধুচক্র

মৌমাছি ফুলে ফুলে ছোটে মধুর অন্বেষণে। তারপর মধু সংগ্রহ করে রচনা করে মধুচক্র। মানুষ ঐ মৌচাক ভেঙে মধু পান করে খুশি হয়। শ্রীম ছুটতেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে ও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় রামকৃষ্ণ-মধু আহরণ করবার জন্য। তারপর তিনি প্রায় ৫০ বছর ধরে সৃষ্টি করলেন এমন এক রামকৃষ্ণ-মধুচক্র, যাতে ভাবীকালের অধ্যাত্ম-পিপাসুরা আনন্দে রামকৃষ্ণ-মধু পান করে অমর হতে পারে।

কোন এক অতীত যুগে বাল্মীকি 'রামায়ণে' রামকথা ও ব্যাস 'ভাগবতে' ও 'মহাভারতে' কৃষ্ণকথা লিখে গেছেন, এখনও আমরা ঐ পুরুষোত্তমদের জীবনগাথা ও বাণীর আস্বাদ পাই। বাল্মীকি ও ব্যাসের চোখ ও কল্পনার ভিতর দিয়ে আমরা রাম ও কৃষ্ণকে দেখি। তেমনি আমাদের শ্রীম-র, স্বামী সারদানন্দের ও ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যদের চোখ দিয়ে ঠাকুরকে দেখতে শিখতে হবে। কারণ এঁরাই ঠাকুরের জীবন ও বাণীর দ্রষ্টা, শ্রোতা, লেখক ও সংগ্রাহক। কালে আমাদের চোখ যখন ঠাকুরের কৃপায় দিব্যচক্ষুতে পরিণত হবে, তখন আমরা ঠাকুরকে সাধ মিটিয়ে দেখতে পাব।

পরবর্তী কালে ক্ষুধার্ত ও তৃষিত মানুষ ছুটে গেছে রামকৃষ্ণ-মধুচক্র-নির্মাতা শ্রীমর কাছে প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ শুনতে :

"ভক্ত—আপনি ঠাকুরের কথামৃত কখন লিখতেন ? রাত্রি জেগে কি লিখতে হতো ? খুব পরিশ্রম হতো ; না ?

"শ্রীম—পরিশ্রম ছাড়া কোন কাজ হয় ? হ্যাঁ, রাত্রে লিখতাম। শুনে এসে পরদিনও লিখেছি, ধ্যান করে করে।

"তারপর চণ্ডীখানি লইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। হঠাৎ উহা খুঁজিয়া পাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'এই দেখ, তাঁর কাজ তিনিই করলেন।' 'মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা' ইত্যাদি পড়িয়া বলিলেন—'একি আর আমি করেছি। ঠাকুরের কাজ ঠাকুরই করেছেন। তিনিই মেধারূপে, ইচ্ছাশক্তিরূপে আমার

১৩ শ্রীম-দর্শন, ১১শ ভাগ, পৃঃ ৯০
১৪ উদ্বোধন, ৪৩ বর্ষ, পৃঃ ৩৪৪

ভিতর আবির্ভূত হয়ে লিখিয়েছেন। তিনিই কর্তা ও কারয়িতা। আমরা বুঝি আর না বুঝি'।"[১৫]

"ভক্ত—আপনার কথা শুনে, ঠাকুরের জীবন দেখিয়ে দেওয়ায় কতকটা বুদ্ধিতে প্রবেশ করছে। ওরা যখন যোগবাশিষ্ঠ পড়েন ও ব্যাখ্যা করেন তখন শুষ্ক মনে হয়, বুদ্ধিকে যেন লাঠি মারে। এখানে তো দেখছি বেশ সরস সবল সাবলীল।

"শ্রীম—এতে আমাদের বাহাদুরী নেই। যাঁর জীবনই ছিল জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির জীবন্ত ও জ্বলন্ত উদাহরণ, তাঁর সঙ্গে ঘর করেছিলাম। চোখে দেখে, কানে তাঁর কথা শুনে, বলছি। কেবল বিচারে বেদান্ত বোঝা যায় না। অনুভূতি চাই। এ করতে হলে সাধন চাই। আর যার এইসব অবস্থা হয় তাকে দেখলে তো কথাই নেই। শাস্ত্রের সদর্থ প্রকাশের জন্য ভগবান অবতার হয়ে এসেছেন। সর্বদাই আসেন যখন কদর্থ হয়ে যায় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। ভাগ্যিস ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে ঘর করেছি পাঁচ বছর, তাই এসবের একটু একটু বুঝতে পেরেছি। 'বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'—ছান্দোগ্য উপনিষদের এই মন্ত্রটি বিদেহ-মুক্তির দৃষ্টান্ত।' [১৬]

"সতীশ (শ্রীমর প্রতি)—অমূল্য জিনিস এই ডায়েরী। কত accurate (যথার্থ) লেখা, time place, personality (স্থান কাল পাত্র) সব আছে। শুনলে মনে হয় যেন চোখের সামনে দেখছি।

"শ্রীম—হাঁ, তা ঠিক। আচ্ছা, চৈতন্যদেবের সময়ের একটি লোক পেলে আমরা দৌড়ে যাব না কি দেখতে? তেমনি ঠাকুরের কথা। তা শুনতে তো লোক আসবেই, যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘর করেছেন, তাঁদের কাছে।

"আমরা তাঁর contemporary (সমসাময়িক)। তাই লোক আসে তাঁর সম্বন্ধে evidence (সাক্ষ্য) নিতে, examine (পরীক্ষা) করতে। ছেলেখেলা!

"অবতার যখন আসেন তখন সকলে দাঁড়িয়ে যায় পরখ করতে। বিশ্বাসী কয়েকজন মাত্র নেয়। বাকি লোক পরখ করে। তাতে টিকলে তখন নেয়।

"তারপর তাঁর কথায় যারা জীবন উৎসর্গ করেছে, তাঁকে যারা জীবনের ধ্রুবতারা করে নিয়েছে, তাদের জীবনও দেখে। তাদের কথা শুনে যদি বুঝে ঠিক, তবে নেয়।

"আমাদের কাছে যে লোক ছুটে আসে এতে আমাদের বাহাদুরী নেই। তাঁর সম্পর্কে বলে আমাদের দাম। নইলে কিছু নয়।

"Contemporary (সমসাময়িক) লোক ভাব অনেকটা ঠিক রাখতে পারে। তারপর মিকশ্চার হয়ে যায়। Mother tincture (মূল নির্যাসটি) আর পাওয়া যায় না তখন। First-hand evidence (চোখে-দেখা কানে-শোনা সাক্ষ্য) চলে যায়। তারপর first-hand evidence and second-hand evidence diluted (অধিক তরল) হয়ে যায়। আসল জিনিস আর তখন পাওয়া যায় না।"[১৭]

"শ্রীম—আমার জীবনের greatest event (সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা) যদি জিজ্ঞেস করেন—তা হচ্ছে পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ।"[১৮]

'এখানে এলে-গেলেই হবে"

কথায় বলে: "এলে-গেলেই আত্মীয়তা।" ঘন ঘন দর্শনের ফলে মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা ঘনীভূত হয়। ঈশ্বর বা অবতারের সঙ্গে একবার আত্মীয়তা স্থাপিত হলে অনিশ্চয়তা, দুর্ভাবনা ও ভয় দূর হয়। ঠাকুর বলতেন: "আমি আছি আর আমার মা আছেন।" ব্যস, আর কাকে চাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের শেখাতেন কি করে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর—এই পঞ্চভাবের সাধন-কথা আছে। যেকোন একটা ভাব অবলম্বন করে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানো যায়। দক্ষিণেশ্বরের হাঁসপুকুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলেছিলেন: "দ্যাখ আর একটু বেশি বেশি আসবি। সবে নূতন

১৫ উদ্বোধন, ৬৭ বর্ষ, পৃঃ ৪০৪
১৬ শ্রীম-দর্শন, ১১শ ভাগ, পৃঃ ৩৮
১৭ ঐ, ১৩শ ভাগ, পৃঃ ৩৫-৩৬
১৮ ঐ, ৭ম ভাগ, পৃঃ ২৫

আসছিস কিনা! প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন-পতি। (নরেন্দ্র ও মাস্টারের হাস্য) কেমন আসবি তো?" নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হ্যাঁ, চেষ্টা করব।"[১৯]

ঠাকুর কাউকে কাউকে বলতেন: "এখানে এলে-গেলেই হবে।" এই 'এখানে'-র বিশেষ মানে—ঠাকুরের কাছে। ব্যাপক মানে ঈশ্বরের কাছে। ঠাকুর ছিলেন নররূপী ঈশ্বর। শ্রীম বলতেন, "অবতারকে দর্শন করলে ঈশ্বরকে দর্শন করা হলো—এই কথা ঠাকুর বলেছিলেন। যীশুও তাই বলেছেন: 'he that hath seen me hath seen the Father', 'I and my Father are one.' কেন বলতেন, এখানে এলে গেলেই হবে—না তাঁকে দর্শন করলেই উদ্দীপন হবে। জপ-তপ করা কেন?—ভগবানের উদ্দীপন হবে বলে। এখানে যে স্বয়ং ভগবান বসে আছেন। একেবারে সাক্ষাৎকার হয়ে যাচ্ছে। মানুষ হয়ে বসে আছেন। তাই বলতেন, 'এখানে এলে-গেলেই হবে।' নিজেকে নিজেই জানতেন।"[২০]

"তব তত্ত্বং ন জানামি"

শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝবার জন্য আমরা দৌড়ঝাঁপ করি, দেবদেউলে মাথা কুটি, সাধুসঙ্গ করি, শাস্ত্র পড়ি, কখনও কাঁদি ও হা-হুতাশ করি। কেউ বা নিজের কর্ম ও সংস্কারকে দোষ দেয়, আত্মধিক্কার করে, নিজেকে অভিশপ্ত মনে করে। অন্যদিক দিয়ে দেখলে বলতে হয়, সময় না হলে কারও বুঝবার অধিকার নেই। গীতা বলেন: "কালেন আত্মনি বিন্দতি।" বীজ পুঁতলেই ফল হয় না। কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়। অধ্যাত্ম-জীবনেও তেমনি খানদানি চাষার মতো চাষ বা সাধন-ভজন করে যেতে হয়। বৃষ্টি বা কৃপা একদিন বর্ষিত হবেই হবে।

জনৈক ব্রহ্মচারী একবার স্বামী সারদানন্দকে প্রশ্ন করেন: "মহারাজ, আমাদের এত গলদ, সন্দেহ হয়, ঠাকুর কি আমাদের মতো হতভাগাদের দেখা দেবেন?" উত্তরে, ব্রহ্মচারীকে অশেষ সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "তাঁকে ডেকে যাও, বাবা। খাদ গালিয়ে মনকে গড়েপিটে তৈরি করে তিনিই নেবেন। তিনি দেখা দেবেনই দেবেন। ভয় নাই। বিশ্বাস কর।"[২১]

কোন কোন গৃহী ভক্তদের বিশ্বাস ছিল যে ঠাকুরকে দেখলে আর ভাবনা নেই। মুক্তি অনিবার্য। কেউ কেউ মনে করতেন যে, ঠাকুরকে দেখেছি, সুতরাং সাধন-ভজনেরও প্রয়োজন নেই। স্বামীজী কিন্তু এব্যাপারে বিপরীত মত পোষণ করতেন। তিনি বলেন: "যারা তাঁর (ঠাকুরের) দর্শন পায়নি, তাদের মুক্তি হবে না; আর যারা তিনবার তাঁর দর্শন পেয়েছে, তাদেরই মুক্তি হবে—এ কথা সত্য নয়।"[২২]

স্বামীজীর মতো বিরাট প্রতিভাবান পুরুষ বলেছেন যে, তিনি ঠাকুরকে খুব অস্পষ্টই বুঝেছেন। ঠাকুরের সন্তানদের কথোপকথন থেকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্ব' জানবার চেষ্টা করি। এই চেষ্টার মধ্যে বেদনা আছে, আবার আশাও আছে। ভক্তিশাস্ত্রে 'আশাবন্ধ' একটি গুণ। এটি ভগবৎ ভাবের একটি লক্ষণ।

মহাপুরুষ মহারাজ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন: "তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে আজকাল অনেক অনেক মুসলমান নরনারীও ঠাকুরকে খোদার পয়গম্বর মহম্মদজ্ঞানে ভজনা করছে। আমি সে বৎসর (উতকামণ্ডে) নীলগিরি পাহাড়ে গিয়েছিলুম। ওখানকার ভক্তেরা কুনুরে একটি বাংলো ভাড়া করে আমাদের রেখেছিল। আমরা ওখানে আছি এই সংবাদ পেয়ে বোম্বাইয়ের একজন মুসলমান ডাক্তার সপরিবারে কুনুরে এসে হাজির। পরিচয় নিয়ে জানলুম, তিনি বোম্বাইয়ের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, বিলাত-ফেরত, বেশ পসার আছে ওখানে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছেলে—খাসা চেহারা। সামান্য দু-চার কথার পর ডাক্তারটি আমায় বললেন, 'আমরা আপনাকে দর্শন করতে এসেছি। আমার স্ত্রী

১৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১।১০

২০ শ্রীম-দর্শন, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৬

২১ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে—স্বামী নির্লেপানন্দ, পৃঃ ২৫০

২২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪-৩৯৫

বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে আপনার কাছে এসেছে, তার কিছু বলবার আছে।' এই বলে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রী তখন খুব ভক্তিভরে আমায় প্রণাম করে অনেক প্রাণের কথা বললেন। তিনি বাল্যকাল হতেই কৃষ্ণভক্ত, শ্রীকৃষ্ণকে বাল-গোপালভাবে ভজনা করেন এবং দর্শনাদিও মাঝে মাঝে পান। তারপরে ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ পড়ে ঠাকুরের ওপর তাঁর খুবই ভক্তি হয়েছে। তাঁর ধারণা যে, তাঁর ইষ্টদেবই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেখলুম যে ঠাকুরের ওপর অগাধ ভক্তি! বেশ সাধন-ভজন করেন। ঠাকুরও নানাভাবে তাঁকে কৃপা করেছেন। শেষটায় বিদায় নেবার সময় হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে বললেন—'আমার মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করুন। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করেছেন, তাঁর কৃপা পেয়েছেন। আপনার যে হাত শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করেছে সে হাত আমার মাথায় একটু দিন।' আর কি কান্না! আমার তো কেবল মনে হতে লাগল—ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা! তোমায় কে বুঝবে বল? সেই শিবমহিম্নঃ-স্তোত্রের কথা মনে হলো—

'তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ॥'

—'হে মহেশ্বর, তুমি যে কিরূপ—তোমার তত্ত্ব কি, তাহা আমি জানি না। হে মহাদেব, তুমি যেরূপ হও সেইরূপ তোমাকেই ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার।'

বাস্তবিকই ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের ঐ কথাই বলতে হয়।"[২৩]

ছবিতে দেখাই কি সার হবে?

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট প্রভৃতি অবতারদের সময় ক্যামেরা ছিল না। তাই আমরা ঠিক জানতে পারি না তাঁরা দেখতে কেমন ছিলেন। বিভিন্ন শিল্পী ও ভাস্কর কল্পনার দ্বারা ঐ সব অবতারের ছবি ও মূর্তি গড়েছেন তাই দেখে আমরা প্রাণের আর্তি মেটাই। শ্রীরামকৃষ্ণের মোট ছয়খানি ছবি ক্যামেরার দ্বারা তোলা হয়—চারখানি জীবদ্দশায় এবং দুখানি দেহত্যাগের পর। এর দ্বারা আমরা জানতে পারি তিনি দেখতে কেমন ছিলেন। এতে ধ্যানের সুবিধা হয়। অযথা কল্পনা করতে হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশার তিনখানি ছবি সু-পরিচিত—কেশব সেনের বাড়িতে তোলা, রাধাবাজার বেঙ্গল স্টুডিওতে তোলা এবং দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণু মন্দিরের সামনে তোলা। চতুর্থখানি ভক্ত রামদত্তের ব্যবস্থায় তোলা হয়। সে ছবি দেখে ঠাকুর বলে-ছিলেনঃ "এ চেহারা আমার নয়।" শশী মহারাজ স্বামী অভেদানন্দজীকে পত্রে ঐ ছবির সম্বন্ধে আরও লেখেন।[২৪] স্বামী অখণ্ডানন্দ রামবাবু কর্তৃক গৃহীত ফটো সম্বন্ধে বলেনঃ "সেই ফটো দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'আমি কি এত রাগী?' রামচন্দ্র কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, এ ছবি ঠাকুরের মনঃপূত হয় নাই। রামচন্দ্র সে ছবি লইয়া গেলেন এবং নেগেটিভ-সহ ছবিটি গঙ্গায় ফেলিয়া দেন।"[২৫]

ঠাকুরকে চাক্ষুস দেখতে কার না সাধ হয়? একবার জনৈক সাধু ব্যাকুল হয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে বলেনঃ "মহারাজ, ছবিতে ঠাকুরকে দেখাই কি সার হবে? আমাদের কি কোন উপলব্ধি হবে না?" মহাপুরুষজী তৎক্ষণাৎ খুব আশ্বাস দিয়ে বলেনঃ "না, না, ছবিতে কেন? (হৃদয় দেখাইয়া) এইখানেই সাক্ষাৎ জীবন্ত মূর্তি উপলব্ধি হবে।"[২৬]

পুরীতে ঠাকুরের ছবি প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা একটা অপূর্ব ঘটনা বলেন। মা সেবার পুরীতে সকালে পৌঁছে ঠাকুরের ছবিখানি একটা ঘিয়ের টিনের ওপর রেখে পূজো করে জগন্নাথ দর্শন করতে যান। (তখন মনে হয় ঐ বাড়িতে কোন বেদী বা আসবাবপত্র ছিল না।) মা ফিরে এসে দেখেন ঠাকুরের ছবি টিনের নিচে। মা নিজে বলেনঃ "শেষে দেখি বড় বড় লাল পিঁপড়ে ধরেছে টিনে—ঘিয়ের টিন কিনা—সেই পিঁপড়ে ঠাকুরের ছবিতে ধরেছিল, তাই ঠাকুর নেমে বসেছেন।"

ভক্ত—"ছবিতে কি ঠাকুর আছেন?"

২৩ শিবানন্দ-বাণী ১।১২৫-১২৬
২৪ পত্র-সংকলন, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, পৃঃ ৩৭
২৫ উদ্বোধন, ৬৪ বর্ষ, পৃঃ ৬৫৫
২৬ শিবানন্দ বাণী, ২।৬৬

মা—"আছেন না ? ছায়া কায়া সমান। ছবি তো তাঁরই ছায়া।"[২৭]

ঠাকুর বলতেনঃ "শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।" তেমনি ঠাকুরের ছবি দেখলে ঠাকুরের কথাই মনে পড়ে। আমাদের পরিচিত এক হিন্দু পরিবার সৌদি আরবে কর্ম উপলক্ষে যান। ভদ্রমহিলার কাছে ঠাকুরের বাঁধানো ছবি ছিল। আরবে দেবদেবীর ছবির প্রবেশ নিষেধ। সেখানকার কাস্টম (custom) অফিসার, 'কার ছবি' জিজ্ঞাসা করায়, ভদ্রমহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে বলেনঃ "আমার বাবার ছবি।" তিনি মিথ্যা বলেননি। ঠাকুরই প্রকৃতপক্ষে আমাদের পরম পিতা।

পরবর্তী কালে মানুষ ছুটে গেছে শ্রীশ্রীমাকে ও ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী সন্তানদের দেখবার জন্য। মানুষরূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁরা স্পর্শ করেছেন, তাঁদের স্পর্শ করবার জন্যও ভক্তের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ আমি স্বামী সর্বজ্ঞানন্দজীর সঙ্গে রামেশ্বর তীর্থ দর্শন করতে যাই। তিনি এই সুন্দর স্মৃতিকথাটি বলেন, যা আমি টেপ রেকর্ডারে তুলে নিইঃ

"আমি নারায়ণস্বামী আইয়ার নামে এক ভক্তকে জানতাম। তার বাড়ি ছিল মাদ্রাজ থেকে ৭৫ মাইল দূরে। সে ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকার গ্রাহক ছিল, ফলে সে ঠাকুর, স্বামীজী ও অন্য শিষ্যদের বিষয় অনেক কিছু জানত। সে অবিবাহিত ছিল, মাকে দেখা-শুনা করত, এবং আট টাকা বেতনে একটা বাগানের কর্মাধ্যক্ষ ছিল। তার একটা বাসনা ছিল। সেটি হলো, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর যে স্পর্শ করেছে তাঁকে স্পর্শ করবার। সে যখন শুনল যে শ্রীশ্রীমা মাদ্রাজে আসছেন (১৯১০ খ্রীস্টাব্দ), সে মাকে দেখবার জন্য তৈরি হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি মারা যাওয়ায় সে আসতে পারল না।

"তারপর ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মাদ্রাজে এলে নারায়ণস্বামী তাঁর সেই সুপ্ত বাসনা পূরণ করতে মনস্থ করল। সে মাদ্রাজ মঠে গিয়ে শুনল যে, মহারাজ মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোমে রয়েছেন। নারায়ণস্বামী ছিল দীনতার প্রতিমূর্তি। সে বেলা দেড়টায় স্টুডেন্টস হোমে উপস্থিত হলো। মহারাজ তখন আহার সেরে সবে বিশ্রাম করছেন। মহারাজের সেবক নারায়ণস্বামীকে অসময়ে আসার জন্য বকুনি দিলেন। মহারাজ শুনতে পেয়ে সেবককে ডেকে ভক্তটিকে ভিতরে আসতে বললেন। নারায়ণস্বামী আমাকে তাঁর সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলেছিলঃ 'আমি ঘরে ঢুকে মহারাজের পায়ের কাছে ফলফুল রাখলাম। তারপর আমি মহারাজের পা-দুটি স্পর্শ করলাম এবং মাথা ঠেকালাম। আমার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। আমি কতক্ষণ সেখানে ছিলাম জানি না। মন আমার আনন্দে ভরে গেল। আমার বহুদিনের বাসনা পূরণ হলো। আমি মহারাজকে ছুঁয়েছি আর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ছুঁয়েছেন। মহারাজ তাঁর হাত দুখানি আমার মাথায় রেখে আশীর্বাদ করলেন এবং আমাকে দাঁড়াতে বললেন। আমি তাঁর শান্ত সৌম্য মুখখানি দেখলাম। তারপর মহারাজের দিকে মুখ করে আমি পিছু হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা।"

ইদানীংকালের অনেক ভক্তদের মনে ক্ষোভ—ঠাকুরকে দেখিনি, তাঁর সন্তানদের দেখিনি। কেবল ছবি ও বই নিয়ে কি করে ঠাকুরের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাব ? একবার বালিগঞ্জের জনৈক ভক্ত শ্রীমকে বলেন (১২.২.১৯১৯)ঃ "আপনারা খুব fortunate (ভাগ্যবান)। ঠাকুরকে স্পর্শ করেছেন, দেখেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, তাঁর সেবা করেছেন।" প্রত্যুত্তরে শ্রীম বলেনঃ "না, ঠাকুর বলেছেন তাঁর ঐশ্বর্য তাঁর সন্তানেরা সবাই পাবে। তাঁর ঐশ্বর্য হচ্ছে বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম। ঠাকুরকে চিন্তা করলেই ভিতরে শুভ সংস্কার হয়।...ভক্ত যে ভগবানকে ডাকে, সে ভগবানের গুণে। ভগবানই ভক্তকে ডাকায়। সেটা ভক্তের গুণ নয়।...তিনিই সব হয়েছেন।...এখনও ঠাকুরের মূর্তি ধ্যান, তাঁর ভাব সব ধ্যান করলে তাঁকেই (যেমন আমরা তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখেছি) চিন্তা করা হয়। ফল একই।"[২৮]

২৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।৫৭-৫৮

২৮ উদ্বোধন, ৬৭ বর্ষ, পৃঃ ৪৩৭

অথাতো রামকৃষ্ণজিজ্ঞাসা

ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" অর্থাৎ প্রথমে বেদান্তের অধিকারী হয়ে ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো: 'ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ বস্তু, না অপ্রসিদ্ধ।' ব্রহ্ম যদি প্রসিদ্ধ হন তবে আমরা সবাই ব্রহ্মকে জানি, সুতরাং সেবিষয়ে প্রশ্ন নিরর্থক। আর ব্রহ্ম যদি অপ্রসিদ্ধ হন, তাঁকে জানবার চেষ্টা বৃথা। যা অজ্ঞাত, তা কখনও জ্ঞাত হয় না। এপ্রসঙ্গে দীর্ঘ বিচার আছে। এখানে সেসব উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

রামকৃষ্ণ কে?—এ বিষয়ে অতীতে প্রশ্ন উঠেছে, এখনও উঠছে এবং ভবিষ্যতেও উঠবে। রামকৃষ্ণ-তত্ত্ব দুজ্ঞের্য় ও সূক্ষ্ম। ভাবীকালে ব্রহ্মসূত্রের মতো রামকৃষ্ণ-সূত্র রচিত হবে। ঠাকুরের এক-একটি কথা ধরে এক-একখানি গ্রন্থ রচিত হবে, দর্শন সৃষ্টি হবে, ভাষ্য টীকা-টিপ্পনী লিখিত হবে। রামকৃষ্ণ-সূত্রের কতকগুলি নমুনা: 'যত মত তত পথ'; 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেখানে ইচ্ছা যাও'; 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল.' 'যত্র জীব তত্র শিব' ইত্যাদি।

ঠাকুর বলতেন যে, কেউ কাশী দেখেছে আর কেউ কাশীর বিষয় শুনেছে। যে দেখেছে তার কথায় খুব বিশ্বাস হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায় খুব জোর। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে জানতে গেলে আমাদের প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা বা লেখা অবলম্বন করে এগুতে হবে। এসব ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষ নন; এঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর। সাধারণ মানুষ এঁদের ঠাকুরের বিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে।

যে কেহ ঠাকুরকে একবার দর্শন করেছে সে-ই মহা পবিত্র ও পুণ্যবান। বিশ্বাসী ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত বলতেন, এমনকি যে গাড়িতে ঠাকুর উঠেছেন, সেই গাড়ির কোচম্যান, সহিস, গাড়ি, ঘোড়া পর্যন্ত সব পবিত্র হয়ে গেছে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি বলেন, "তাহলে আর ভাবনা কি? কত লোকে তাঁকে রাস্তায় ঘাটে দর্শন করেছে, কত গাড়িতে তিনি চড়েছেন, তাদের কোচম্যান, সহিস, সকলেই তো দেখেছে। তারা কি আর তা বলে মুক্ত হয়ে যাবে?" একথা শুনে রামবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি গর্জে বললেন, "যা—যা। সেই গাড়োয়ান সহিসের পায়ের ধুলো একটু নিগে যা। যা—যা। যে ম্যাথর তাঁকে দর্শন করেছে, সেই ম্যাথরের একটু পায়ের ধুলো নিগে যা। তোর মতো লোকের লক্ষ লক্ষ জীবন পবিত্র হয়ে যাবে।"[২৯]

"রামবাবুর ছিল বৈষ্ণবভক্তের ভাব। একবার হরিপদ (পরবর্তী কালে স্বামী বোধানন্দ) বালকোচিত সহজভাবে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তো অনেক মাঝি-মাল্লাও দেখিয়াছে। তাহাদের কি হইয়াছে?' রামবাবু ইহা শুনিয়া দারুণ রুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'পাষণ্ড, তুই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারে ভিক্ষুক,আর কিনা বলিতেছিস তাঁহাকে মাঝি-মাল্লারা দেখিয়াছে, তাহাদের কি হইল? নিশ্চয় জানিবি যে, যে মাঝি-মাল্লা সুকৃতিবশতঃ তাঁহার শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়াছে, তাহারা তোর চেয়ে অনেক ভাগ্যবান।' হরিপদ লজ্জায় ও ক্ষোভে রামবাবুর নিকট তাঁহার ঐ উক্তির জন্য পায়ে ধরিয়া মার্জনা চাহিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি নিজে লিখিয়াছেন, 'অনেক পরে বুঝিয়াছিলাম, বাস্তবিক যে-ব্যক্তি অজ্ঞাতসারেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একবার মাত্রও দর্শন করিয়াছিল সে মহাভাগ্যবান। আমি তাঁহার পাদস্পর্শ করিবার যোগ্য নই'।"[৩০]

বিজয়নাথ মজুমদার তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন: "যোগোদ্যান ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ। রামবাবু, গিরিশবাবু, অক্ষয়বাবু, হরমোহনবাবু, কালীপদবাবু ও মনোমোহনবাবু উপস্থিত ছিলেন। আমরাও তিন-চারজন ছিলাম। সহসা একজন বলিলেন—'ঠাকুরের নিকট যাঁহাদের আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারা সকলেই সাধক ও শুদ্ধসত্ত্ব।' মনোমোহনবাবু বলিলেন—'ওকথা আমি মানতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামারে (Grammar) ওকথা থাকলে আমাদের গতি কি হতো? আমরা যখন তাঁর কাছে গিয়েছিলাম তখন এদের মতোই (পার্শ্বস্থিত যুবকদিগকে দেখাইয়া) আমাদের অবস্থা। আমাদের না ছিল বিশ্বাস, না ছিল শ্রদ্ধা, না ছিল স্থির লক্ষ্য, না ছিল লক্ষ্যসাধনে তৎপরতা। ইন্দ্রিয়সংযম যে কাহাকে বলে তখন জানতাম না। আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি ওসব আগে আসে না। একে একে তাঁর দয়ায় পরে পরে এসেছে। তাঁর কৃপায় তাঁকে

২৯ রামচন্দ্র-মাহাত্ম্য, পৃঃ ৬৪

৩০ স্বামীজীর পদপ্রান্তে, পৃঃ ১৫৭

ধরবার পর আমাদের মধ্যে ভগবানে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, অনুরাগ, যা বল, সব এসেছে। আমরা নিজের জোরে ওসব পাইনি। তাঁর দয়ায় পেয়েছি।"[৩১]

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে এই প্রশ্নটি ভক্তভৈরব গিরিশ-চন্দ্রকে করা হয়ঃ "তাহার (ঠাকুরের) অবতার সম্বন্ধে আপনার মত?" প্রত্যুত্তরে গিরিশবাবু বলেন ঃ

"যদি অনুরূপ ঈশ্বর থাকেন তাহলে আমি ক্ষুব্ধ হব। আমি ঘৃণিত বারাঙ্গনার গৃহ হইতে তাঁহার নিকট গিয়াছি, আমাকে বসিতে আসন দিয়াছেন। আমার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে পাপ থিয়েটার-গৃহে মিঠাই লইয়া আসিয়াছেন। আমি এ ভালবাসা কোথাও পাই নাই। আমার নিকট তিনিই ভগবান, তিনিই অবতার। তাঁহার এক কথায় আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, 'হলধারী আমাকে গাছে বসিয়া প্রস্রাব ত্যাগ করিতে দেখিয়া ভূতে পাইয়াছে মনে করিয়াছিল।' যখনই আমার মনে সন্দেহের মূল দেখা যায়, এই কথা স্মরণ হইবা মাত্র সন্দেহের উদয় হইতেই পারে না। তাঁহাকে মানা, ভালবাসা, পূজা করা কঠিন নয়—তাঁহাকে ভুলাই কঠিন।"[৩২]

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের ঠাকুর সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

"প্রশ্ন—মহারাজ, ঠাকুর এখনও আছেন?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তোর দেখছি মাথা-ফাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমরা বাড়ি-ঘর-দোর ছেড়ে দিয়ে আজীবন এইভাবে পড়ে রয়েছি কিসের জন্য? তিনি সব সময়েই আছেন। তাঁকে জানবার জন্য দিন-রাত তাঁর নিকট প্রার্থনা কর। তিনি সব সংশয় দূর করে দেবেন, তাঁর স্বরূপ বুঝিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন—আপনারা এখন ঠাকুরকে দেখতে পান?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তিনি যখন দয়া করে দেখা দেন তখন দেখতে পাই। তাঁর দয়া হলে সবাই তাঁকে দেখতে পাবে। তবে তাঁকে দেখবার সে অনুরাগ, সে আকাঙ্ক্ষা কয়জনের আছে?"[৩৩]

"প্রশ্ন—ঠাকুরের ideal existence (মানসিক সত্তা) ছাড়া real existence (বাস্তব সত্তা) কিছু আছে কি?

স্বামী সারদানন্দ—আছে বৈকি। অনেকে তাঁকে দেখছে, কথা কইছে।

প্রশ্ন—আপনি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন কি?

স্বামী সারদানন্দ—কিছু কিছু পেয়েছি বৈকি। নইলে কি এমনি পড়ে আছি?

প্রশ্ন—যদি ঠাকুর আছেনই, তবে স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) ইচ্ছামত তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পারতেন না কেন?

স্বামী সারদানন্দ—কথা কইতেন বৈকি। এই যেমন আমি তোমার সঙ্গে বসে কথা কইছি, ঠিক এমনিভাবে কথা বলেছেন, আমরা জানি। তবে ইচ্ছামাত্র হতো না। যেমন, তুমি শাঁখারিটোলায় থাক, আমার সঙ্গে কথা কইতে হলে, এখানে এসে দেখা করে তবে কইতে হবে। স্বামীজী তো আর ঠাকুরের সমান plane-এ (ভূমিতে) ছিলেন না, কর্মের মধ্যে থাকলে মন একটু নিচে থাকে। তাই কথাবার্তা হতে হলে মনকে সংযত করে উপরের plane-এ (ভূমিতে) নিয়ে যেতে হবে।"[৩৪]

"জনৈক ছাত্র—ঠাকুরের লীলার কথা যা শোনা যায়, এসব ব্যাপার না দেখলে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আর বিশ্বাস না হলে তো সবই মিথ্যা।

বাবুরাম মহারাজ—জজ তো ভাল সাক্ষীকে—বিশিষ্ট ভদ্রলোক সাক্ষীকে বিশ্বাস করেন; মনে কর, তুই জজ—আর আমি সাক্ষী। আমি বলছি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ঠাকুরের কি অপূর্ব ভাব, কি তীব্র ত্যাগ, কি অনুপম জ্ঞান, কি অদ্ভুত কর্ম। সবই কি সকলে দেখতে পায় রে? কেউ দেখে, কেউ শুনে, কেউ বা পড়েও বিশ্বাস করে। চাই, বিশ্বাস অচল অটল। সরল বিশ্বাস না হলে কিছুই হয় না।"[৩৫]

"আমি যদি জন্ম নিতেম"

মানুষের কল্পনার শেষ নাই, সীমাও নাই। অনেকে কল্পনাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না—কল্পনা কি করে বাস্তবে রূপ

৩১ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ২২৭
৩২ উদ্বোধন, ৫০ বর্ষ, পৃঃ ৫৬৩
৩৩ ধর্মপ্রসঙ্গে—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৫৬
৩৪ স্বামী সারদানন্দের জীবনী পৃঃ ৩৪০—৩৪১
৩৫ উদ্বোধন, ৫০ বর্ষ, পৃঃ ৩১

নেয়। একটা উদাহরণ দিই ঃ আমেরিকায় এমন লোক নেই যে ডিসনিল্যান্ডের (Disneyland) কথা জানে না। তা হলো পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ চিত্ত-বিনোদনের স্থান। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়াল্ট ডিসনি (Walt Disney)। তিনি একবার ইংলন্ডে গিয়ে দেখেন যে, সেখানকার বড় বড় পুরনো ক্যাসলগুলি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। তিনি তাদের বললেন, "দেখুন ঐ সব পুরনো ক্যাসলে অনেক ভূতপ্রেত আছে। তাদের বাস্তুহারা করছেন কেন? আপনারা যদি ঐ সব বাস্তুহারাদের জন্য বাড়ি তৈরি না করেন, তবে আমি ওদের আমেরিকায় নিয়ে যাব।" ওয়াল্ট ডিসনিল্যান্ডে Haunted House তৈরি করলেন। ইহা এক আকর্ষণীয় দৃশ্য। ঐসব বৃটিশ ভূতপ্রেত এখন আমেরিকার ডিসনিল্যান্ডে নাচছে, গাইছে, কাঁদছে, হাসছে, বাইবেল পড়ছে। এভাবে কল্পনা রূপ নেয়। সাধারণ মানুষ দৃঢ় করে ধরতে পারে না—তাই বাস্তবে রূপায়িত হয় না।

রবীন্দ্রনাথের 'সেকাল' কবিতাটি এখন মনে আছে ঃ "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে / দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে। / চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি, থাকত নাকো ত্বরা— / মৃদুপদে যেতেম, যেন নাইকো মৃত্যু জরা। / জীবন-তরী বয়ে যেত মন্দাক্রান্তা তালে, / আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।"

আমরা যদি জন্ম নিতেম রামকৃষ্ণের কালে? কি হতো? একবার আমেরিকার ভক্তদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ মনে করুন আপনি রাতে একা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছেন। এমন সময় যীশুখ্রীস্ট সশরীরে আপনার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আপনি কি করবেন? খুব করে ভেবে দেখুন।

ভক্তদের চুপ করে থাকতে দেখে বললাম ঃ "আমি জানি আপনারা কি করবেন। আপনারা টেলিফোনে ৯১১ ডায়াল (dial) করবেন। (আমেরিকায় ৯১১ হচ্ছে এমারজেন্সি নাম্বার। ৯১১ ডায়াল করা মাত্র অপারেটর জিজ্ঞাসা করবে—কাকে চাই? পুলিশ, অ্যামবুলেন্স অথবা ফায়ার-ব্রিগেড?) আমরা ভীতু। খ্রীস্টকে দেখবার জন্য এখনও প্রস্তুত হইনি। অনেকে বলবে, "প্রভু, তুমি দেয়ালের ঐ ছবিতে ঝুলে থাক। তোমাকে কাছে দেখলে বড় ভয় করে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থাকা অত সহজ ছিল না। আমরা শ্রীমায়ের জীবনীতে পড়েছি—মায়ের উঠতে একটু দেরি হলে ঠাকুর নহবতের দরজার চৌকাঠের ভিতরে জল ঢেলে দিতেন। মা ও লক্ষ্মী-দিদি মেঝেতে শুতেন। অনেকদিন বিছানা ভিজে যেত। আমেরিকার মহিলাদের আমি ঠাট্টা করে বলি, এমন স্বামী পেলে তো আপনারা সঙ্গে সঙ্গে ডিভোর্স করে দিতেন।

রানী রাসমণিকে মা-কালীর মন্দিরে মকদ্দমার চিন্তা করতে দেখে ঠাকুর দুই চাপড় মারলেন। বরানগরের ঘাটে বসে জয় মুখুজ্যে অন্যমনস্ক হয়ে জপ করছিল। ঠাকুর তাকে দুই চাপড় মারলেন। এঁরা সব ভাগ্যবান। ঠাকুর চিরদিনের তরে ওদের মন ভগবদ্‌মুখী করে দিলেন। যখনই তারা অন্যমনস্ক হবেন ঠাকুরের কথা মনে করবেন। অনেক সময় ভক্তদের মনে হয়—হায়! সকাল-সন্ধ্যায় যদি ঠাকুরের দুটি চড় খেতাম, কি সুন্দর ধ্যানজপটাই না হতো।

মথুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিশেষভাবে উপকৃত ছিল। নিজের অবর্তমানে ঠাকুরের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য ঠাকুরের নামে একটা তালুক লেখাপড়া করে দেবার পরামর্শ হৃদয়ের সঙ্গে করতে গিয়ে মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়। ঠাকুর ঐ কথা শোনা মাত্র উন্মত্ত হয়ে 'শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাস' বলে মথুরকে মারতে গেলেন। শোনা যায় মথুর দৌড়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে রক্ষা পান।

লাটু মহারাজকে একদিন সন্ধ্যায় ঘুমোতে দেখে ঠাকুর প্রায় তাকে বিদায় করে দিচ্ছিলেন। বাবুরাম মহারাজ এক রাতে দুখানা রুটি বেশি খাওয়ায় ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে বরাদ্দের (৪ খানি) অধিক দিতে বারণ করেন। অবশ্য মা তাঁর কথা গ্রহণ না করে বলেন, "ও দুখানি রুটি বেশি খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি করো না।"

ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ একবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে মনস্থ করেন। তারপর আলমবাজার পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন। তিনি শুনেছিলেন যে, ঠাকুর সব লোকের মনের কথা জানেন। সুতরাং সকলের সামনে ঠাকুর যদি তাঁর মনের কথা বলেন,

তাহলে তাকে বিব্রত হতে হবে। এই ভয়ে তিনি আর ঠাকুরকে দেখতে গেলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ত্যাগ ও পবিত্রতার মূর্ত বিগ্রহ। লোকশিক্ষার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। 'যাকে যেমন তাকে তেমন'—এই ভাবে শিক্ষা দিতেন। উত্তররামচরিতে ভবভূতি লোকোত্তর পুরুষের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা কখনো বজ্রের ন্যায় কঠোর কখনো কুসুমের ন্যায় কোমল।

হায় বাসনা! ঠাকুরের কাছে থাকবার বাসনা উঠলে অনেক সময় শ্রীশ্রীমায়ের কথা মনে পড়ে: কখনো কখনো দুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, 'মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি?' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে (দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে) কীর্তনের আখর শুনতুম—পায়ে বাত ধরে গেল।"৩৬ মায়ের একথা পড়লে চোখ দিয়ে জল গড়ায়। নিজের স্বামীকে জগতের স্বামী করবার জন্য মায়ের এ স্বার্থত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

আমরা ধন্য—তোমরাও ধন্য

এ জগতে যারা সন্দিগ্ধমনা তারা চিরদুঃখী। সন্দেহ তাদের সুখশান্তি ধ্বংস করে। বাইবেলে খ্রীস্ট-শিষ্য টমাসকে 'Doubting Thomas' বলা হয়। পুনরভ্যুত্থানের পর যীশুখ্রীস্ট শিষ্যদের সামনে আবির্ভূত হন। তখন টমাস সেখানে ছিল না। বন্ধুদের কাছে যীশুর আবির্ভাবের কথা শুনে টমাস বলল যে, সে তখনই তা বিশ্বাস করবে যখন সে নিজ হাতে যীশুর গায়ে ক্রুশ চিহ্ন স্পর্শ করবে। আট দিন পরে যীশু আবার সব শিষ্যদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন, এবং টমাসকে দেখে বললেন, "তুমি আঙুল দিয়ে আমার হাতের ও বুকের পাশের ক্রুশচিহ্ন স্পর্শ কর। অবিশ্বাস করো না—বিশ্বাস করো।" টমাস বলে উঠল, "হে মোর প্রভু, হে মোর ঈশ্বর।" যীশু বললেন, "টমাস, তুমি দেখেছ সেহেতু তুমি বিশ্বাস করলে। তারাই ধন্য, যারা আমাকে দেখেনি, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করে।"

তারাই ধন্য যারা ঠাকুরের নামে বিশ্বাস করে তাঁকে ধরে রয়েছে। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতেন: "আবার কার মুখ চাহিবে? ঠাকুরকে লইয়া পড়িয়া থাক—দেখিবে পরে কি হয়। তাঁহাকে ফটোতে প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যজ্ঞানে তাঁহার সেবা পূজা সব করিয়া যাও—দেখিবে সত্যসত্যই তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যাইবে। তাঁহাতেই প্রাণমন মজাইয়া ফেল দেখি।"৩৭

অনেকে হা-হুতাশ করে বলেন: "আমাদের সংস্কার খারাপ", "আমরা ভাগ্যহীন", "এ জীবনে আমাদের কিছু হলো না", ইত্যাদি নেতিমূলক কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বা তাঁর শিষ্যগণ পছন্দ করতেন না। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একবার ভক্তদের মহত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন: "আমরা না হয় তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখে পাগল হয়েছি, কিন্তু তোমরা যে তাঁর নাম শুনেই পাগল।"৩৮

*একবার জনৈক সন্ন্যাসি-সেবক মহাপুরুষ মহা*রাজকে বলেন: "মহারাজ, আমরা ঠাকুরকে দেখিনি। আপনি আছেন, এতেও আমাদের কত আনন্দ! আপনি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। আপনার কাছে থাকতে পেয়েছি, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা? আপনি আছেন, তাই এত সাধুসন্ন্যাসী ও কত ভক্ত, সকলেরই ভরপুর আনন্দ। আমি তো এক এক সময় ভাবি, কত লোক দূর দূর থেকে টাকা পয়সা খরচ করে, কত কষ্ট স্বীকার করে আসে শুধু একটিবার আপনাদের দর্শন করতে! আর আমাদের এমনই সৌভাগ্য যে, সর্বক্ষণ আপনার কাছে থাকতে পারছি।"

মহারাজ খুবই আবেগভরে বলিলেন—"ঠাকুরের বিশেষ কৃপা তোমাদের ওপর। তাই তিনি তাঁর ভক্তের সেবা করিয়ে নিচ্ছেন তোমাদের দ্বারা। তোমরাও ধন্য, আমিও ধন্য যে তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি। নইলে কোথায় থাকতুম, কে দেখত?"৩৯

ভাগবতের দশম স্কন্দের চতুর্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মার কৃষ্ণস্তুতি আছে। ব্রহ্মা বলছেন, "আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে চাই, কোন বনভূমিতে। সকল বনের ভিতর বৃন্দাবনে জন্মলাভ করতে পারলে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করব। কারণ, বৃন্দাবনবাসিগণ অহর্নিশ তাদের মিত্র কৃষ্ণের চিন্তা করতে করতে কৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছে। আপনার

৩৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।১৫৫

৩৭ স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, পৃঃ ১০৪

৩৮ উদ্বোধন, ৪১ বর্ষ, পৃঃ ৩০৩

৩৯ শিবানন্দ-বাণী, ২।১৬০-১৬১

ও তাদের চরণরজে ব্রজভূমি মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। সেই চরণরজঃ আমার শিরে ধারণ করে ধন্য হব। বেদও এই চরণরজের জন্য লালায়িত।

"হে কৃষ্ণ, যতদিন মানুষ কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণময় না হয়, ততদিন তাদের স্নেহাদি বৃত্তি চোরের ন্যায় তাদের সর্বস্ব হরণ করে তাদের অনন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করে। ততদিন তাদের গৃহ কারাগার-সদৃশ হয়ে থাকে, ততদিন তাদের পাদদ্বয় মোহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে।

"হে প্রভো, পৃথিবীতে আপনার অবতারশরীর গ্রহণ কেবল শরণাগত জনের আনন্দরাশি বৃদ্ধির জন্য। আপনি স্বরূপতঃ নিষ্প্রপঞ্চ।"

শ্রীম বলেন: "ব্রহ্মার ঐ কথাটি বড় সুন্দর— ব্রজে বাসের বাসনা নবশরীর ধারণ করে। কেন? না, ওখানকার ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণচিন্তা নিরন্তর করে করে কৃষ্ণময় হয়ে গেছেন। তাঁদের চরণরজঃ মস্তকে পড়লে ব্রহ্মা কৃতকৃত্য হবেন। ব্রহ্মা বেশ বললেন, শরণাগতজনের আনন্দদানের জন্য অবতার-শরীর।

"আমরা তাই ধন্য। তাঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে ঘর করেছি, তাঁকে ভালবেসেছি, তাঁর স্নেহ লাভ করেছি, নিজ হাতে তাঁর চরণ ধরেছি, তাঁর প্রসাদ খেয়েছি, চক্ষুতে তাঁকে দর্শন করেছি, কানে তাঁর কথা শ্রবণ করেছি, তাঁর কৃপায় তাঁর সাকার-নিরাকার রূপ দর্শন করেছি, মৃত মানুষ অমৃত হয়েছি, ভয়গ্রস্ত অভয়প্রাপ্ত হয়েছি, আমরা ধন্য। তোমরাও ধন্য তাঁর কথা শুনে, না দেখে তাঁকে ভালবেসেছ। তাঁর জন্য সবস্ব ত্যাগ করে পথে দাঁড়িয়েছ। তাঁর ভক্ত যারা ঘরে আছে তারা কেহ সংসারী নয়, ঠাকুর একথা বলেছিলেন।"[৪০]

একবার জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে বললেন: "মা, তোমার ছেলেরা কেউ চোখ বুজে কেউ চোখ চেয়ে ঠাকুরকে দেখতে পান। আমার ভাগ্যে তো মা ঠাকুর-দর্শন হলো না।" মা উত্তরে বললেন: "স্থানটি যদি পবিত্র হয়, মনটি যদি শুদ্ধ থাকে তবে ঠাকুরের দর্শন পাওয়া যায়।" পরে ভক্তটির মাথায় হাত রেখে মা দৃঢ় অথচ মধুর কণ্ঠে বললেন: "আমি বলছি ঠাকুর সামনে না এলে তোমার দেহ যাবে না। এবার তোমার শেষ জন্ম।"[৪১]

স্বামী প্রেমানন্দ একবার স্বামী গিরিজানন্দকে (ইনি মায়ের দীক্ষিত) বলেছিলেন: "তোরা কি কম মনে কচ্ছিস নাকি? শ্রীশ্রীমায়ের ছেলে যারা তারা ঠাকুরের সন্তানের চেয়ে কম নাকি? আমাদের পায়ের ধুলো সকলে নেয় বলে, আমরা খুব বড় হয়ে গেছি মনে করিস? আমরা ঠাকুরকে দেখে এসেছি, আর তোরা না দেখে এসেছিস। তোরাই তো আমাদের চেয়ে বড়। ("মদ্ভক্তানাং যো ভক্তঃ স মে ভক্ততমো মতঃ"।)"

স্বামী গিরিজানন্দ বললেন, "ঠাকুর আপনাদের বড় করে গেছেন।" স্বামী প্রেমানন্দ বললেন, "তিনি আমাদের বড় করেননি, ছোট করে গেছেন। তোরা সব ছোট হবি, অহঙ্কারগুলোকে একেবারে মনের ভিতর থেকে তাড়িয়ে দিবি। ঠাকুর বলতেন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।"[৪২]

গিরিশবাবু এক পত্রে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন: "কেহ কেহ আমার নিকট আসিয়া আক্ষেপ করে যে, ঠাকুরের দর্শন পাই নাই। আমি তাহাদের বলি যে, মা গঙ্গা যেমন সগর বংশের উদ্ধারের নিমিত্ত শতমুখী হইয়াছিলেন, ঠাকুরের প্রেমও সেইরূপ ভক্তপ্রণালী দিয়া শতধারে বহিতেছে, জগৎকে পরিত্রাণ দিবে।"[৪৩]

আজ যদি ঠাকুর থাকতেন

জীবনে যখন ঝড়ঝাপটা আসে, চারিদিক অন্ধকার দেখি, পথ খুঁজে পাই না—তখন কেবল মনে হয় আজ যদি ঠাকুর থাকতেন তবে তাঁর কাছে গিয়ে প্রাণ জুড়োতাম, মনের খেদ মিটাতাম। সংসারের অভাব-অনটন, জ্বালা-যন্ত্রণা, রোগ-শোক মানুষকে অহরহ পুড়িয়ে মারছে। চিতা মানুষকে একবার মাত্র পোড়ায়, কিন্তু দুশ্চিন্তা সর্বদা দাহ করছে। ঐ জন্য মানুষ ছুটে গেছে আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ বলেন: "সব সময় মুখ গম্ভীর করে থাকা ঠিক নয়—হাসবি, তামাসা করবি, তবে তো মনকে প্রফুল্ল রাখতে পারবি। ঠাকুর ফুর্তি করে কত গল্প বলতেন, কত রসিক লোক ছিলেন।"[৪৪]

৪০ শ্রীম-দর্শন, ৯ম ভাগ, পৃঃ ১৭০–১৭১

৪১ মাতৃদর্শন, পৃঃ ২৪৭

৪২ প্রেমানন্দ, ২।৫২–৫৩

৪৩ উদ্বোধন, ৫৩ বর্ষ, পৃঃ ৫০৬ ৪৪ ঐ, পৃঃ ৬০১

দক্ষিণেশ্বরের কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেনঃ "আজ ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। কত অবান্তর এসে যেতে পারে, কত ভুলচুক করে ফেলছি। তাঁদের ভাষা তো থাকবার কথা নয়ই, ভাবটা থাকলেই বাঁচি। যাক—যখন সময়টা আমার ভাল যাচ্ছিল না, সাংসারিক সুখ একেবারেই ছিল না, অভাব আর অভাব, কিছুতেই কুলোয় না: বেশ মনে আছে—ঠাকুরের কাছে অনটন বা অভাবের কথা কোন দিন মাথায় বা মনে উদয় পর্যন্ত হয়নি। তাঁর কৃপা ভিন্ন তা সম্ভবই ছিল না। তাঁর কথা শুনতেই যেতাম, শুনে আসতাম।

"দুই কি আড়াই বছরের মধ্যে যে কয়দিন তাঁর কাছে যাবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল, একদিনও তাঁকে একলা পাইনি। সাংসারিক মনঃকষ্ট তো যাচ্ছিলই, একদিন আপিসে যাব বলে বেরিয়ে ওপারে (বালীর পারে) পৌঁছে আর আপিসে গেলুম না, ইচ্ছা হলো না। গিয়ে কি ফল? তার চেয়ে ঠাকুরের কাছে যাই। কলকাতার ফিরতি পানসি ডেকে পুব-পারে রানী রাসমণির ঘাটে গিয়ে নাবলুম। দেখতে পেলুম ঠাকুর তাঁর ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্ডায় দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন করছেন। নিকটে উপস্থিত হতেই: "কিরে—আপিস পালালি! ওটা ভাল নয়। তোরা কুমীরের মতো, জলের মধ্যে বা সংসারে হাঁপিয়ে উঠলে—শ্বাস নেবার তরে জলের ওপর নাক বাড়িয়ে কিছুক্ষণ থাকিস, আবার সে কথা ভুলে গিয়ে ডুব মারিস—বেশিক্ষণ থাকতে পারিস না। দুঃখকষ্ট না থাকলে কি কেউ এদিক মাড়াতো! দুঃখকষ্ট বড় দরকারি জিনিস রে। সেই তো মানুষকে সংপথ খোঁজায়। ভাগ্যবান পথ দেখতে পায়।"

পরে বলেনঃ "বিবাহ করেছিস, মা আছেন না?" "আজ্ঞে, হ্যাঁ, আছেন।" একটু চুপ করে রইলেন, যেন কি ভাবলেন। শেষে বললেনঃ "যা এখন সংসার কর, একটু দুঃখকষ্ট থাকা ভাল, এগিয়ে দেয়। দুঃখ না থাকলে কেউ ভুলেও ভগবানের নাম নিত না।" এই ভাবের কথা মাঝে মাঝে এক-একটি বলছিলেন। হঠাৎ আমার মনে হলো তিনি যেন কষ্টবোধ করছেন। সত্যিই তো, তখন তাঁর রোগ বাড়ছে। না, আর নয়, বললুমঃ "আপনি একটু বিশ্রাম করুন, এই তো আহারের পর উঠেছেন, আমি বুঝিনি, জ্বালাতন করছি।"

"কষ্ট তো আছেই, কিছু জানবার থাকে তো বল।" হাসতে হাসতে বললুমঃ "আমাদের তো সবই জানবার, জানলুম আর কি?" "কেন, ভগবানকে জানবি, চেষ্টা থাকলেই পাবি। তিনি যখন রয়েছেন,পাবিনি কেন। ইচ্ছা প্রবল হলেই পাবি। সে ইচ্ছা আনা চাই।" "আপনি আশীর্বাদ করুন।" "ওসব আশীর্বাদের বস্তু নয়, নিজের কাজ—আকাঙ্ক্ষা বাড়া। বাড়ি যা।"

জিজ্ঞাস্য কিছু থাকলে তিনি তখনো বলতে প্রস্তুত। কি জিজ্ঞাসা করব—তাই জানি না। তাঁকে প্রণাম করে ঘরে দিয়ে বাড়ি ফিরলুম।"[৪৫]

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের কয়েক বছর পরে কেদারবাবুর মনে তীব্র অনুশোচনা দেখা দেয়। তিনি উদাসীর মতো ঘুরে বেড়াতেন। একদিন এক চলতি নৌকায় কলকাতায় যেতে রানী রাসমণির কালীবাড়ি চোখে পড়ল। হঠাৎ ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "ঠাকুর যদি আজ থাকতেন।"

বাগবাজারের ঘাটে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে নেমে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সেদিন কলকাতায় যাননি। পূর্বের এক শোনা কথা সহসা হৃদয়ে ধ্বনিত হলোঃ "কাঁকুড়গাছিতে ভক্ত রামদত্ত মহাশয়ের বাগানে ঠাকুরের সমাধি-মন্দির হয়েছে।"

কেদারবাবু কাঁকুড়গাছি কোথায় সঠিক জানতেন না। শুধু শুনেছিলেন যে, রেললাইন পেরিয়ে নারকেলডাঙ্গার কাছে। তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। সেই একবার মাত্র রাসমণির বাগানের সামনে একপ্রকার অসম্বিতেই তাঁর প্রাণ বলে উঠেছিল, "ঠাকুর যদি আজ থাকতেন।" ঐ চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসল।

তাঁর আত্মকথাঃ "রেল লাইন পার হয়ে আবার রাস্তা—তার দুধারে বাগানই বেশি। বসতবাটি বিরল। বেলা বোধ হয় দ্বিতীয় প্রহর গ্রীষ্মকাল, রৌদ্র প্রচণ্ড—ঝাঁ ঝাঁ করছে। পথ প্রায় জনশূন্য। দিনের বেলাই উদাস ভাব এনে দেয়।… নিশ্চয়ই রামবাবুর সেই বাগান এইখানেই কোথাও হবে।

৪৫ উদ্বোধন, ৫০ বর্ষ, পৃঃ ৭৪—৭৫

কিন্তু কোথায় ? আরো একটু এগুলাম। দক্ষিণে একটা গলিপথ কিছুদূরে চলে গিয়েছে, প্রান্তে ফটক দেখা যাচ্ছে আর বাঁশঝাড়।... গেট বন্ধ নয়— ভেজানো রয়েছে। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ঢুকে ভেজিয়ে দিলুম।

"কিন্তু মন্দির কই—ঠাকুরের সমাধি-মন্দির ? তবে কি এ বাগান নয় ? মন যে বলছে—এই বাগানই। এগোতেই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটা ছোট পুষ্করিণী। তার চারদিকে রাস্তা। পুষ্করিণীর পূর্ব পারে পশ্চিমমুখো একটি ছোট পাকা কুটুরী —চূণকাম করা। এইবার কুটুরীর দিকে সোজা-সুজি চাইলুম—দ্বার উন্মুক্ত। এ কি ! ঠাকুর যে ! প্রাণ আনন্দে আহা আহা করে উঠল। ধন্য ভক্ত, একেবারে যে জীবন্ত মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন ! সেই প্রফুল্ল মুখ, সেই কাপড়—সেই তেমনি কাঁধে ফ্যালা। আবার দেখলুম—এ কি, হাওয়ায় দাড়ির দুই এক গাছি চুলও মৃদু মৃদু নড়ছে ! আশ্চর্য ! যেমনটি দেখেছি হুবহু সেই মূর্তি !"

তিন-চার মিনিট দর্শনের পর কেদারবাবু বাগানের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে শুনতে পেলেন পূজারীর কণ্ঠস্বর, "কে গা আপনি ? কি দেখছেন ?" "ঠাকুরকে দেখছি। এইটিই কি রামদত্ত মশায়ের বাগান ?"- এই বলে কেদারবাবু পূজারীর দিকে এগুলেন।

"কী দেখছিলেন—বললেন ?"

"পরমহংসদেবের মূর্তি।"

"মূর্তি ? কোথায় ? কি বলছেন ?"

"কেন—ঘরের মধ্যে তবে।"

"ঘর তো বন্ধ। চাবি এই আমার কাছে রয়েছে। ঘরের মধ্যে রূপার বাসন-কোসন রয়েছে—দেখবেন কি ?... বড় জোর এক ঘণ্টা হবে, পূজাদি সেরে ঘর বন্ধ করে খেতে গিয়েছিলুম। আপনি ওসব কি ?..."

তখন উভয়ে ঠাকুর ঘরের সামনে এসে দেখেন, ঐ ঘরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দ্বার উন্মুক্ত, আর ঘরের মধ্যে ঠাকুরের সেই প্রাণ জুড়ানো মূর্তির চিহ্নমাত্রও নেই। বিহ্বল কেদারবাবু একটু সামলে বললেন, "মশাই, আপনার জিনিসপত্রগুলো সব ঠিক আছে কিনা আগে দেখে নিন।" পূজারীও অবাক হয়ে বললেন, "সে সব আমার সামনেই রয়েছে—ঠিক আছে। কিন্তু কয় বৎসর নিত্য এই কাজ করছি এমন ভুল তো কোনদিন ঘটেনি।"

তারপর "এটি রামবাবুর বাগান কিনা ?" কেদারবাবুর এ প্রশ্নের উত্তরে পূজারী বললেন, "হ্যাঁ, তাঁরই যোগোদ্যান। আর এইটি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সমাধি-মন্দির। আচ্ছা, আপনি কে ? কোথা থেকে এসেছেন ? অনেকেই তো আসেন। আপনাকে তো আগে কখনো দেখিনি। বাবুকে কি বলবো ?"

"বাবুকে বলবার দরকারই বা কি ? এই তো বললেন কত লোক আসেন, আমিও সেইরূপ একজন। ঠাকুরের সমাধিক্ষেত্রে প্রণাম করে যাবার ইচ্ছায় এসেছিলুম।"

তারপর পূজারীর কাছ থেকে ঠাকুরের প্রসাদী শশা, কলা, পেঁপে, শাঁকালু, বাতাসা, আর এক গ্লাস জল খেয়ে কেদারবাবু দেহমন শীতল করে পথে বেরিয়ে পড়লেন। অমনি এক ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান, "বাবু যাবেন নাকি—কোথায় যাবেন ?" বলে তাঁর সামনে থামল।

"দক্ষিণেশ্বর।"

"আসুন, আমার বরানগরের বেণী সার আস্তা-বলের গাড়ি।" গাড়িতে বসে কেদারবাবু ঠাকুরের অপূর্ব লীলা চিন্তা করতে লাগলেন : "আজ যখন নৌকা রানী রাসমণির মন্দির সম্মুখে, তখন তো আমার কোন চিন্তা, কোন জ্ঞানই ছিল না, কোথা হতে অবচেতনা সহসা সাড়া দিয়ে উঠল—'ঠাকুর যদি আজ থাকতেন ?' কেন যে একথা (মনে) এসে-ছিল, কি অভাব বোধ হয়েছিল, তারও সুস্পষ্ট ধারণা আমার ছিল বলেও বোধ হয় না। এতটুকু ব্যাকুলতা বা কাতরতা তার মধ্যে গোপন ছিল কিনা—তাও তো জ্ঞানতঃ বলতে পারি না। হে ভাবরূপী ভাবগ্রাহী অন্তর্যামী, তুমিই অন্তরে বসে ওকথা বলিয়ে থাকবে, আবার অহেতুক কৃপাসিন্ধু, তুমিই ব্যবস্থা করে সে অভাব মেটালে ! এ অভাগার প্রতি একি অনির্বচনীয় করুণা ! 'সাপ হয়ে কামড়াও রোজা হয়ে ঝাড়ো !' এমন ব্যথার ব্যথী আর কে আছে ? কোথায় পাব ?"[৪৬]

৪৬ উদ্বোধন, ৪০ বর্ষ, পৃঃ ২৯২-২৯৮

ভারতে জাতীয়তার উন্মেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে-ব্যক্তির ছবিটি অধিকাংশ মানুষের মনে সাধারণতঃ ভেসে ওঠে তা হলো অসাধারণ অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী এক সাধক যিনি দক্ষিণেশ্বরে সিদ্ধিলাভ করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়েকজন প্রখ্যাত সন্ন্যাসীর যিনি আচার্য। তাঁর অপূর্ব উপদেশের মাধ্যমে তিনি আপামর জনগণকে ধর্মের পথে নিয়ে আসেন। অনেকে তাঁকে একজন অবতার বলেও মনে করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় তিনি হলেন 'অবতারবরিষ্ঠ' অর্থাৎ ঐশী শক্তির বিচারে ভগবানের অন্য সকল অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর মার্কিন সাহিত্যিক ক্রিস্টোফার ঈশারউডের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন কোন ব্যক্তি মাত্র নন বা কোন পবিত্র সাধু মাত্র নন, তিনি ছিলেন একটি অসাধারণ ঘটনা (phenomenon)। এরকম আরো নানা অভিধায় তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে। এসকল বর্ণনাই ধর্মীয় ভক্তের ভাষা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও কাজকে ভক্তের চোখ দিয়ে না দেখে যদি সমাজসচেতন, বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসাশ্রিত গবেষকের চোখ নিয়ে দেখা যায় তাহলে তাঁর যে-ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তা হলো ভারতে জাতীয়তার উন্মেষে তাঁর বিরাট ভূমিকা। একদিকে যেমন বহু সহস্র বৎসরের ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সাধনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে, অন্যদিকে তিনি হলেন আধুনিক ভারতের সবশ্রেষ্ঠ সমাজবিপ্লবী। তিনি হলেন ভারতের অধ্যাত্মসাধনার শ্রেষ্ঠ ফল, ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক, আবার একই সঙ্গে উনবিংশ শতকে সমাজবিপ্লবের সবচেয়ে সাহসী উদ্বোধক। তিনি যেমন অবতারবরিষ্ঠ, আবার তেমনই একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী লোকশিক্ষক। তাঁর প্রতিভা যেমন বহুমুখী, তাঁকে দেখার ও বোঝার পথও একাধিক। তিনি একই সঙ্গে সন্ন্যাসীর ও গৃহিভক্তের আচার্য। ধর্মীয় সংস্কারের ও সমাজবিপ্লবের মন্ত্রদাতা, উচ্চশিক্ষিতের এবং সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়ের ত্রাতা। সবকিছু মিলিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের যে-ভূমিকা সমাজ-সচেতক গবেষকের কাছে প্রধানতম হয়ে দেখা দেয় তা হলো এই যে, তিনি পরাধীন ভারতবাসীর মন থেকে পরাধীনতা থেকে উদ্ভূত হীনম্মন্যতাকে দূর করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর সরল অথচ গভীর উপদেশাবলী ভারতীয়দের বোঝাতে চেয়েছে যে, তারা জগতে অন্য কারোর থেকেই শৌর্যে-বীর্যে বা জ্ঞানে-বিদ্যায় কোন অংশে কম নয়। এক মহৎ মানবিকতার অংশ সবাই, সুতরাং জাত্যাভিমান অশ্রদ্ধেয় এবং পরিত্যাজ্য। আর যে-কোন মহৎ মানবতাবাদীর মতোই তিনি স্বদেশবাসীর হীনম্মন্যতা দূর করতে গিয়ে অন্যজাতির প্রতি বৈরিতা সৃষ্টি করেননি। কারণ তাঁর স্বদেশচিন্তা ছিল বৃহৎ মানবহিতচিন্তার একটি অংশ। ভারতবাসীর চেতনার নবজাগরণে তিনি যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করেন তার প্রকাশ প্রধানতঃ ধর্মীয় আদর্শকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বাতাবরণে ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই আদর্শ ও বাতাবরণের সামাজিক ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে এমন এক সাহসী পুরুষকে যাঁর প্রবল উপস্থিতি ও প্রবলতর কার্যধারার ফলেই সম্ভব হয়েছিল পরাধীন ভারতবাসীর পুনর্জাগরণ। ভারতবাসীর মনে শ্রীরামকৃষ্ণ যে আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন তাকে স্পষ্টভাবে বহুল প্রচার করেছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গে রূপদান করেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে বিপ্লবের যে বিপুল প্রচেষ্টা দেখা যায় এবং পরবর্তী সময়ে সহিংস ও অহিংস পথে জাতীয় আন্দোলনের প্রবল ঢেউ আসমুদ্রহিমাচল ভারতের প্রতি প্রান্তে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সবকিছুর মধ্যেই দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের পরোক্ষ প্রভাব। ব্রিটিশ শাসনের রাজকর্মচারীদের বিভিন্ন সময়ে রচিত গোপন প্রতিবেদনে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লেখিত হয়েছে যদিও তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কোনরকম সংযোগ খুঁজে বের করা যায়নি। কেননা শ্রীরামকৃষ্ণ কাজ করে গেছেন মানুষের মনোভূমিতে যেখানে তিনি সযত্নে ও অনবদ্যভাবে আত্মশক্তির বীজ বপন করেছেন। কালে সেই বীজ থেকেই জন্ম নিয়েছে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ।

ইতিহাসের বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সময়-সীমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। শিক্ষা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থায় ভারতের পরাধীনতা শুরু হয় ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে। এই বছরেই কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার নীতি হিসাবে বেণ্টিঙ্ক-মেকলের নেতৃত্বে লর্ড বেণ্টিঙ্কের ৭ মার্চ ১৮৩৫ তারিখের প্রস্তাব অনুসারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, এদেশে প্রাচ্য-শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য-শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। সংস্কৃত-ফার্সীর স্থান নেবে ইংরেজী শিক্ষা। মেকলে আশা প্রকাশ করেন যে, এর ফলে পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে শিক্ষিত ভারতীয় গাত্রচর্মে কালো থাকলেও মননে ও রুচিতে হবে পুরোপুরি ইংরেজ এবং তার ফলে এদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থায়ী হবে। মেকলে প্রকৃতই একটি স্পষ্ট সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন যা কার্যে পরিণত হলে ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। এই সম্ভাবনাকে নির্মূল করার জন্যই যেন ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের গোড়াতেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম। আর জীবনের পঞ্চাশটি বছর ধরে তিনি যে কাজ করে গেলেন, যেভাবে করে গেলেন এবং যে উপদেশাবলী রেখে গেলেন তার ফলে ভারতবাসীর মনে উচ্চ জাতীয়তাবোধের, বিশ্বমানবিকতাকে স্বীকার করেই এক প্রবল স্বদেশচিন্তা ও স্বাজাত্যাভি-মানের উন্মেষ ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন তখন তাঁর অভীষ্ট কর্ম সমাধা হয়েছে। ভারতের জাতীয়তাবোধ সাংগঠনিকরূপ গ্রহণ করেছে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মিলনমঞ্চ হিসাবে গড়ে উঠেছে। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই শহরে যে-সংগঠনের সূত্রপাত হলো সেটি সাংগঠনিক পরিপূর্ণতা লাভ করল ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের কলকাতা অধিবেশনে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষাতেই বলা যায় যে, তিনি সারাজীবন 'এক হাত' ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখেছিলেন 'আর এক হাতে' জাতীয় আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত করার জন্য কাজ করে গেছেন। যখন ভারতের জাতীয়তাবোধ সচেতন হয়ে সাংগঠনিক পথে তার জয়যাত্রা শুরু করেছে তখনই তাঁর কাজ শেষ হয়েছে মনে করে তিনি 'দুই হাতই' ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করে বিদায় নিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই ব্রিটিশ রাজশক্তি ধাপে ধাপে ভারতকে কৃষ্টি ও রাজনীতির দিক দিয়ে পরাধীন করার কাজ সমাধা করে। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে ফার্সী ভাষার স্থানে ইংরেজীকে সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার ঘোষণা করে যে, সরকারি কর্মনিয়োগে ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই দুই কারণে ১৮৩৭ থেকে ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দ—এই সময়টি ছিল প্রকৃত অর্থে transitional period, এবং হিন্দু-মুসলিম সকল ভারতবাসীর কাছেই এসময়কার পরিবর্তনগুলি এনেছিল একটা বিরাট মানসিক ধাক্কা (shock)। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ১৮৪৪-এর পর থেকে দ্রুত ফার্সীর বদলে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করে। এদের মধ্যে জমিদারশ্রেণী 'ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করে ১৮৪৪-১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে এবং ব্রিটিশশক্তির সঙ্গে নানান সুবিধা প্রার্থনা করে আলোচনা চালাতে থাকে। মুসলমান সম্প্রদায় নিজেকে ইংরেজী শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এরপর ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট স্যার চার্লস উড তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক বিখ্যাত ডেসপ্যাচে একটি সামগ্রিক শিক্ষা-নীতি গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন যার ফলে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্র ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য-শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথা বলা হয়। শিক্ষা ও কৃষ্টির দিক থেকে ভারতীয় মননকে পুরোপুরি পরাধীন করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। অল্পকালের ব্যবধানে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ঘটে যায় মহাবিদ্রোহ যার পরিণতিতে কোম্পানীর প্রশাসন উঠে গিয়ে আসে সরাসরি ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসন। ইংলন্ডের রানীকে ভারতের সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করা হয় এবং ভারত শাসনের পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ ক্ষমতা গ্রহণ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও তার মন্ত্রীসভা। ভারত পরিণত হয় ব্রিটেনের উপনিবেশে। ইতিমধ্যে ওয়াহাবি বিদ্রোহ ও সাঁওতাল বিদ্রোহের মতো ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনগুলিকে পরাস্ত করা হয়েছে। আর ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার হিন্দু কলেজকে রূপান্তরিত করা হয়েছে প্রেসিডেন্সী কলেজে নতুন পাশ্চাত্যশিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে এবং ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলকাতা, বোম্বাই ও

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তি ও পাশ্চাত্য-শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে এই সময়েই দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে ভারতবাসীর শক্তিসাধনার প্রতীক হিসাবে কাজ শুরু করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। রানী রাসমণির উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হলো জগদীশ্বরী বা ভবতারিণীর মন্দির এবং সেখানে দেবীর পূজাসেবাদি কাজের ভার দেওয়া হলো গদাধর চট্টোপাধ্যায়কে যিনি শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে। এখন থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে শুরু হলো ভারতে জাতীয় জীবনে জাতীয় বনাম বিজাতীয় জীবনাদর্শের দ্বন্দ্ব। এই দুই জীবনাদর্শকে কূপমণ্ডুকের মতো অস্বীকার না করেও উভয়কে অতিক্রম করে তিনি এক উচ্চতর জীবনাদর্শ প্রচার করলেন যার মূল কথা হলো সর্ব-মতের সমন্বয়। তিনি ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমান সকল বিভেদ দূর করে ভারতে সমন্বয়ী ধর্মভাবনার সাহায্যে এক মহাজাতি গঠনের ভাবধারা গড়ে তুললেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সামাজিক ভূমিকা এই ডায়ালেকটিকস-এর (dialectics) শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা জার্মানীতে জাতীয়তাবোধের জাগরণে মার্টিন লুথার, হার্ডার এবং ফিকটে প্রমুখ রোমান্টিক চিন্তা-বিদ্‌গণের ভূমিকার সঙ্গে তুলনীয়। এঁরা সবাই জাতীয়তাবোধের উন্মেষে সাহায্য করেছিলেন ধর্ম ও দর্শনচিন্তাকে কেন্দ্র করেই এবং আপামর জনগণের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন ধর্মীয় বাগ্‌ধারাকে ব্যবহার করে। তাঁদের এক-একজনের কাছে, বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে, যুগপ্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বিভিন্নভাবে, কিন্তু যেখানে এঁরা সবাই একমত তা হলো যুগ-প্রয়োজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই গণ-সংযোগের ভাষা ও রীতি নিরূপণ করতে হবে। দেশের আপামর জনগণের মধ্যে যদি আত্মশক্তির উদ্বোধন করে লোকশক্তি সৃষ্টি করতে হয় তাহলে জাতীয় অবস্থা বিবেচনা করেই তাদের বোধগম্য রূপকল্প, ভাষা, বাগ্‌ধারা, প্রবচন, গল্প, রূপক ও উপমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া আর অন্য পথে সাফল্যলাভ দুরূহ হয়ে উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটি ছিল বিশেষ কঠিন, কেননা তাঁকে যেমন পরাক্রান্ত বিদেশী রাজশক্তির পদানত সমাজে বাস করেই কাজটি করতে হয়েছে, তেমনই আবার তাঁর স্বদেশীয় সমাজটিও তখন ছিল নানা মত ও পথের টানা-পোড়েনে বিভ্রান্ত ও অস্থির। হিন্দুসমাজের অনেক সংস্কার ও অসুস্থ জীবনবোধের বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে বাস করে এবং ধর্মীয় আচার-আচরণের বাইরে না গিয়েও এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন তিনি। তিনি সংগ্রাম চালিয়েছেন সাধারণ মানুষের বোধগম্য গ্রাম্যভাষায় ও কথনরীতিতে, দরিদ্র ও নীচুতলার মানুষের মতো বেশভূষা পরিধান করে এবং তদানীন্তন ভারতের রাজধানী কলকাতার ইংরেজ নবীশ, অর্থগৃধ্নু 'বাবু' সম্প্রদায়ের চালচলন থেকে সযত্নে নিজেকে সরিয়ে রেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সামাজিক বিচারে ছিলেন আজীবন সংগ্রামী ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিলেন একজন বিশেষ ধরনের বিপ্লবী। তাঁর বিপ্লব মানুষের মননে, রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়। তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ-সন্ধানে জীবন-পাত করেছিলেন, কিন্তু জীবজগৎকে অস্বীকার করেননি। মাটির ওপর শক্তভাবেই তিনি দাঁড়িয়ে-ছিলেন, জীবনকে মায়া বলে উপেক্ষা করেননি। তিনি যেমন ঈশ্বর-প্রেমী ছিলেন, ঠিক তেমনই ছিলেন মানবপ্রেমী। দেশ ও কালের বিচারে তাঁর মনে হয়েছিল যে, ধর্মের পরিভাষা ব্যবহার করলেই তিনি সকল মানুষের মনে প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারবেন। বিজ্ঞানী যেমন বিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করেন, সমাজ-সচেতন মানবপ্রেমী রামকৃষ্ণদেব ঠিক তেমনি তাঁর বিস্ময়কর কবি-প্রতিভায় যে অজস্র রূপক, প্রতীক ও উপমা ব্যবহার করলেন সেগুলির যথাযথ মর্মোদ্ধার করতে পারলে তবে তাঁর ভূমিকার মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। তাঁকে কেবল ঠাকুর বা দেবতা হিসাবে মনে করে মনো-সিংহাসনে বসিয়ে রাখলে সেটা হবে আত্মপ্রবঞ্চনা। তদানীন্তন সামগ্রিক সামাজিক পটভূমিতে স্থাপন করেই শ্রীরামকৃষ্ণের সামাজিক ভূমিকাকে বুঝতে হবে।

বাংলাদেশে তাঁর কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে আরো চার ধরনের ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলন

হয়েছিল ঃ (১) রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম আন্দোলন, (২) রাধাকান্তদেবের রক্ষণশীল ধর্মীয় আন্দোলন, (৩) 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর কালাপাহাড়ী আন্দোলন, এবং (৪) বিদ্যাসাগরের জনহিতৈষী সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন এবং নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাকে প্রকৃত ধর্ম বলে প্রচার করেন। আর ব্রাহ্ম আন্দোলন নারী-স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থিত করে হিন্দুসমাজের মধ্যে গতিশীলতা আনতে চেষ্টা করে। এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এসকল কাজে ব্রিটিশ রাজ-শক্তির সাহায্য নেন এবং সরাসরি Comprador bourgeoisie-র ভূমিকা পালন করেন। ভারতবাসীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে স্বাধীনচিন্তা করতে তাঁরা শিখিয়েছিলেন, কিন্তু মনে-প্রাণে ও কাজে চেয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তি এদেশে পাকাপোক্তভাবে থেকে যাক। দ্বিতীয় আন্দোলনটি প্রধানতঃ ব্রাহ্ম আন্দোলনের এবং বিদেশী মিশনারীদের খ্রীস্টধর্ম প্রচারের মুখে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে রক্ষা করতেই তার সব যুক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করে। রাজা-জমিদারদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থরক্ষাকে রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সমাজনেতারা তাঁদের অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করে-ছিলেন। একদিকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গ ও অন্যদিকে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এই দুই পক্ষের সমর্থন নিয়ে তাঁরা এগিয়েছিলেন। ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ জাগরণে এই রক্ষণশীল আন্দোলনের ভূমিকা ছিল নিতান্তই গৌণ। তৃতীয় আন্দোলনটি ছিল মূলতঃ কিছু বিপথগামী ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদের আন্দোলন। মূলতঃ কলকাতা-কেন্দ্রিক এই আন্দো-লনের নেতারা হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে আনন্দ পেত এবং গোলদীঘিতে বসে প্রকাশ্যে হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস খেয়ে উচ্ছিষ্ট অন্যের গায়ে ছুঁড়ে মারত। এরা শুধু ভাঙতে চাইল, গড়তে পারেনি কিছুই। ভারতীয় জাতীয়তার পক্ষে এদের দান উপেক্ষণীয়। চতুর্থ আন্দোলনটি প্রায় একজনমাত্র ব্যক্তিকে ঘিরেই গড়ে ওঠে। সংস্কৃতের পণ্ডিত হয়েও তিনি ইংরেজী শিখেছিলেন এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করেছেন। করুণা-সাগর বিদ্যাসাগর হিন্দুসমাজ থেকে অল্পবয়সী বিধবাদের দুঃখমোচনের জন্য বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং শেষপর্যন্ত রাজ-শক্তির সহায়তায় এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করাতে সক্ষম হন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারেও তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তিনি সমাজ-সংস্কারেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং শেষ জীবনে দেশবাসীর ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এসকল ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনগুলি তাঁদের শক্তি হারিয়ে ফেলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়াতেই। ভারতবাসীর মননে নেমে আসে বিভ্রান্তি, হতাশা ও পরাধীনতা-জাত এক ধরনের হীনমন্যতা। ভারত ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণেই দক্ষিণেশ্বরে মাতৃরূপে শক্তির আরাধনা শুরু করেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু বিপ্লবী রামকৃষ্ণ শক্তির আরাধনাতে আনলেন নতুন পদ্ধতি ও নতুন ভাবধারা যা দ্রুত ভারতবাসীর মন থেকে সকল বিভ্রান্তি ও হীনম্মন্যতা দূর করতে সাহায্য করে এবং দেশবাসীর মনে নিজ নিজ কর্তব্যকর্মে একনিষ্ঠতা জাগিয়ে তোলে। তিনি স্বদেশবাসীদের নিজের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করেন, তাদের মধ্যে ধর্ম ও সম্প্রদায়-গত বিভেদ দূর করেন, এবং এক অপূর্ব সমন্বয়ী ধর্মের বাণী প্রচার করে ভারতের আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবোধকে পূর্ণমাত্রায় জাগিয়ে তোলেন। আধ্যাত্মিক জাতীয় সংহতি শীঘ্রই রাজনীতিক জাতীয়তাবোধের জন্ম দেয়। জার্মানীতে যাকে বলা হয় 'volk' ইংরেজীতে তাকে বলে 'folk', সে ধরনের জাতীয় জনসমাজের চেতনা ভারতে সৃষ্ট হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং সেই ভারতচেতনার উন্মেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা ছিল অনন্য। তাঁর তিরোভাবের পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ওপর ও ভারতের বিপ্লবীদের ওপর তাঁর প্রভাব গভীরভাবে রেখাপাত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও কাজ গভীর অর্থব্যঞ্জনায় মণ্ডিত। আপাতদৃষ্টিতে একজন অপ্রকৃতিস্থ সাধু বলে তাঁকে সেকালে অনেকে মনে করেছিলেন, কিন্তু দেশকালের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করলে তাঁর ব্যক্তিত্ব, কাজকর্ম ও কথা সবই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমরা বুঝতে পারব। ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করার আগে থেকেই সমাজবিপ্লবীরূপে গদাধর চট্টোপাধ্যায় তদানীন্তন হিন্দুসমাজকে প্রবলভাবে

ধাক্কা দিতে থাকেন। বাল্যে উপনয়নের সময় তিনি জিদ ধরে ধনী কামারনীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেন। নিজে কুলীণ ব্রাহ্মণ-পরিবারের অন্তর্গত হয়েও কৈবর্ত রানী রাসমণির মন্দিরে যাজনবৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি চাল-কলা বাঁধা পুরুত হতে অস্বীকার করেন। দক্ষিণেশ্বরে পূজার সময় শাস্ত্রমতে মন্ত্র পাঠ না করে ভবতারিণীর কাছে আকুল হয়ে আত্মনিবেদন করেন যাতে অনেকেই তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ বলে সন্দেহ করেন। তিনি সরাসরি জানিয়ে দেন যে, তিনি 'বাবু' হতে পারবেন না অর্থাৎ তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালীর আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আসলে তাঁর এসকল কাজ ও ব্যবহার ছিল হিন্দুধর্মের গোঁড়ামিকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দেওয়া। যদিও ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সঙ্গে তাঁর কোন রকম ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না, তবুও দেখা যায় যে, এই ব্রিটিশবিরোধী বিক্ষোভের প্রাক্কালে রামকৃষ্ণ অধীর হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও চিৎকার করে বলছেন : "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়"। এ যেন সহজ ভাষায় সেই কবির আহ্বান : "মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা / সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—/আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥" এই মা ভক্তের কাছে মৃন্ময়ী ভবতারিণী কিন্তু অন্যের চোখে তা চিন্ময়ী দেশমাতৃকা।

সমাজে প্রচলিত অত্যাচার ও কুপ্রথা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের যথেষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কিভাবে ইংরেজশাসন-সৃষ্ট জমিদার-প্রশাসনের প্রশ্রয় তার নিজস্ব সম্পত্তি বাড়াবার জন্য অন্যকে ভিটেমাটি ছাড়া করে সে অভিজ্ঞতা তাঁর পিতার ভাগ্যেই ঘটেছিল। তাঁদের পরিবারকে নিজস্ব ভিটে ছেড়ে কামারপুকুরে চলে আসতে হয়েছিল। আবার তিনি এটাও স্বচক্ষে দেখেছিলেন কিভাবে ভারতের সাধারণ মানুষ 'অন্নগত প্রাণ' হয়ে পড়েছে। টাকা রোজগারের জন্য মানবের কাছে কাজ করে এবং সেই অর্থে পরিবার প্রতিপালনেই তার সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়। বিদেশী রাজশক্তি ও তার পুষ্ট সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেদের অনুতপরায়ণতা এবং সাধারণ অন্নগত মানুষের হীনম্মন্যতা দেখে দেখে তিনি মনে মনে পীড়িত হতেন। অথচ বুঝেছিলেন যে, এখনই এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব যতক্ষণ না মানুষ নিজেকে বুঝতে শিখছে। নিজের জীবনের পরিবেশ ও জীবনধারণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না জন্মালে তার নিজস্ব 'মান' সম্পর্কে 'হুঁশ' হয় না। এই মানসিক দৈন্য ও ক্লীবতা দূর করতে না পারলে স্বাধীন হওয়া যায় না, কেননা আত্মশক্তির উদ্বোধন না হলে যথার্থ দেশপ্রেম জন্মায় না এবং মানুষের মধ্যে কোন উচ্চ আদর্শের জন্য কাজ করার ইচ্ছেও সৃষ্টি করা যায় না। সেই ধর্মের চেয়ে বড় আদর্শ নেই যে-ধর্মে অনুপ্রাণিত হলে মানুষ তার ক্লৈব্যভাব ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্মের জন্য উদ্যোগী হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যত কথা বলেছেন তার সারকথা হলো "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।" উপনিষদেও রয়েছে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। রয়েছে "চরৈবেতি চরৈবেতি" অর্থাৎ অলস নিদ্রা ত্যাগ করে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিতে আস্থা রেখে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং চলতে হবে সামনের দিকে। এদেশের মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ গল্প-রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে এগিয়ে চলার, আত্ম-উদ্বোধনের শিক্ষাই দিয়েছেন। সেজন্যই জাতীয়তার উন্মেষে তাঁর দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জাতির জাগরণে যেটা সবথেকে বড় প্রয়োজন তা হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ-স্বীকার ও কর্মপ্রবৃত্তি। মনে হয় যেন হাতে ধরে সবাইকে তিনি এইগুলি শেখাতে চেয়েছেন তাঁর কাজ ও কথার মধ্য দিয়ে। দক্ষিণেশ্বরে শক্তিময়ীকে পূজো করতে এসে তাঁর প্রথম প্রার্থনায় দেখা গেল পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, শুচি-অশুচি, ধর্ম-অধর্ম সবকিছুর পরিবর্তে শুধু ভক্তিলাভ করার জন্য আকুলতা। সবকিছু তিনি ছাড়তে রাজি কিন্তু বলতে পারেননি সত্যকেও ত্যাগ করলাম। তিনি বিশ্বাস করতেন, সত্যের জন্য সবকিছুকে ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। তাঁর একটি প্রধান উপদেশ হলো : 'সত্যে আঁট হয়ে থাক'। তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থ হলো অন্তরাত্মার মুক্তি। এই মুক্তিলাভ হলে তবেই ঘটবে মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার প্রস্ফুটন। আর অন্তরাত্মার মুক্তি আসবে ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি ও

তাঁর প্রেমময়তাতে অটুট বিশ্বাস থেকে। কথাগুলি যে আধ্যাত্মিক ভাবধারার দ্যোতক ও বাহক তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ভাবধারার সামাজিক তাৎপর্য ছিল এই যে, বিদেশী রাজশক্তির চেয়ে অনেক অনেক উঁচুতে আছেন মানুষের প্রকৃত প্রভু; সুতরাং ক্ষমতার চাকচিক্য ও প্রভাবের জন্য বিদেশী মনিবের কাছে নিজের অন্তরাত্মা বিকিয়ে দেওয়া উচিত নয়; তা হবে ভারতবাসীর পক্ষে এক চরম অধর্মের কাজ।

হিন্দুধর্মে আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভের তিন প্রধান মার্গ নির্দেশিত হয়েছে—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়েছেন যে, তিন মার্গেই আরাধ্যলাভ হয়, তবে আধুনিক জটিল জীবনযাত্রায় ভক্তিমার্গই অপেক্ষাকৃত সহজ। জ্ঞান হলো সূর্যের মতো, তার উদয় হলে সব পরিষ্কারভাবে জানা-বোঝা যায়। কর্ম নিষ্কাম হলে কোন পিছুটান জন্মায় না, তাতেও মুক্তিলাভ হয়। সামাজিক দায়িত্ব ও সচেতনতা সহযোগে কর্ম করলে তা-ই হয়ে দাঁড়ায় ধর্ম। আর ভক্তিরসে মুক্তির ধারণা জমাট রূপ নেয়। ভক্তির পথ সহজ পথ, শুধু প্রেম ও বিশ্বাস নিয়ে ধরে থাকতে হয়। ঈশ্বরভক্তি থেকে দেশভক্তিও প্রেরণা আসে ভক্তদের মনে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও পরিষ্কার হয়ে যায় সে দেশভক্তি হতে হবে খাঁটি, তাতে ভেজাল থাকলে ইষ্ট সিদ্ধ হবে না অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হবে না। এর থেকেই জন্ম নেয় ইষ্টলাভের জন্য ব্যাকুলতা, কাজে একাগ্রতা ও উদ্দেশ্যের সততা। খাঁটি মানুষ তৈরির কাজে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশ দেশবাসীর ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। একাজটি না হওয়া পর্যন্ত জাতীয়তার আন্দোলনে জোয়ার আসতে পারেনি।

জ্ঞানকে কর্ম ও ভক্তি দিয়ে সঞ্জীবিত করতে হয়, নয়তো জ্ঞান জীবনকে শুষ্ক করে দেয়, মানুষকে নির্মম করে তোলে। তিনি ধর্মের কচকচানিকে বিদ্রূপ করেছেন। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এই তর্ক যে অর্থহীন তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। বলছেন: "জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বর নিরাকার আর ভক্তের কাছে ঈশ্বর সাকার।" আবার বলেছেন: "ভক্তের কোন জাত নেই।" সুতরাং ভক্তি জন্মালে জাতিভেদ চলে যাবে। তাঁর কথার মর্মোদ্ঘাটন করে বলা যায়, এই ভক্তি যখন দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি বোঝাবে তখন আর জাতবিচারের ঝগড়া থাকার সুযোগ থাকে না।

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নামে মানুষে মানুষে যে হানাহানি তা-ও অর্থহীন, অন্ততঃ এ-ধরনের কলহের পেছনে ধর্মের কোন সমর্থন নেই। তিনি তোতা-পুরীর কাছে এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে সাধনা করেছেন। তিনি উপবীত ত্যাগ করে সুফী সাধক গোবিন্দ রায়ের কাছে ইসলাম ধর্মে সাধনা করেন। আবার অন্য সময় সবকিছু ছেড়ে যীশুর ভাবে তন্ময় হয়ে সাধনা করেছেন। দেখেছেন সব মত সব পথ একই জায়গায় নিয়ে যায়। ঋগ্বেদের ঋষি বলেছেন: "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—সত্য এক, জ্ঞানিগণ তাঁকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনই তাঁর সকল প্রকার সাধনার পর ঘোষণা করলেন অপূর্ব সমন্বয়ের বাণী "যত মত তত পথ"। যারা শুধু নিজের মতকেই সত্য ও বিশুদ্ধ বলে দাবি করে এবং অন্যের মতকে ভুল বলে প্রচার করে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় তাদের হলো 'মতুয়ার বুদ্ধি' যা তিনি পরিহার করতে বলেছেন। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতপাতের ক্ষুদ্র আচার-বিচারে যে ভারতীয় জনজীবন শতধা-বিভক্ত ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে একথা বলা খুবই বৈপ্লবিক কাজ, সন্দেহ নেই। ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি ভারতীয় জনসমাজ ও তার নিজস্ব জাতীয়তাবোধের সৃষ্টির প্রথম ধাপ শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী। জাতীয় ঐক্য-সাধনা থেকে মানবজাতির ঐক্য-সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত পথেই হবে একথা স্বামী বিবেকানন্দ, রোমাঁ রোলাঁ, ম্যাক্সমুলার থেকে অরবিন্দ, গান্ধীজী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, আর্নল্ড টয়েনবী সবাই বলেছেন তিনি চেয়েছিলেন ভারতবাসীর মননে বুদ্ধিবিভাসার (enlightenment) পূর্ণ বিকাশ ও তার সঙ্গে মানবাত্মার উদ্বোধন। অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে ভোলতেয়র, দিদেরো, রুশো এবং জার্মানীতে কান্ট, হার্ডার, ফিকটে সবাই মিলে যে-ভূমিকা পালন করেছিলেন ভারতে সেই ভূমিকা পালন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ একা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রচণ্ড কর্মযোগের মাধ্যমে তাঁর গুরুদেবের বাণী প্রচার করে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের মধ্যে গতি সঞ্চার করেছিলেন সত্য, কিন্তু বিবেকানন্দের সমস্ত চিন্তা-

ভাবনার উৎস তো শ্রীরামকৃষ্ণই। তাঁর ভাবে উদ্দীপিত শিষ্যগণ তাঁদের ভাবপ্রচার মুখপত্রের সার্থক নামকরণ করেছেন—'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত'।

শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তার আর একটি প্রধান দিক হলো বেদান্তের অদ্বৈত দর্শনের ফলিত ব্যবহার। "যত্র জীব তত্র শিব" এই দর্শন থেকে এল তাঁর শিবজ্ঞানে জীব সেবা করার উপদেশ। বৈষ্ণবধর্মের আলোচনা-প্রসঙ্গে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় তিনি বলেছিলেন 'জীবে দয়া' কথাটা ঠিক নয়। এক মানুষ অন্য মানুষকে দয়া করতে পারে না, কারণ সকল মানুষের মধ্যেই পরম ব্রহ্মের প্রকাশ। মানুষের সাধ্য কি অন্যকে দয়া দেখায়, বরং মানুষের কর্তব্য হলো ঈশ্বর জ্ঞানে সকল জীবের সেবা করা। সেদিন তাঁর কথা স্বকর্ণে শুনেছিলেন তাঁর প্রিয়তম পার্ষদ নরেন্দ্রনাথ যিনি সেদিন রোমাঞ্চিত বোধ করেছিলেন। এই কথা থেকে এক অপূর্ব আলো বা নতুন জীবন-দর্শন লাভ করেছিলেন এবং সঙ্গেসঙ্গেই মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলেন যে, যদি কোনদিন সুযোগ আসে তবে শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবনাকে কার্যে রূপায়িত করবেন। বিবেকানন্দের সেই সংকল্পের ফল 'রামকৃষ্ণ মিশন' যে-প্রতিষ্ঠানটি তাঁর জন্মলগ্ন (১৮৯৭) থেকে আজপর্যন্ত 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' করার মহৎ কাজে নিরলসভাবে ব্যাপৃত। পরবর্তী কালে গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন ও নরনারায়ণ সেবার অনুপ্রেরণা এসেছিল এই জীবনদর্শন থেকেই। রামকৃষ্ণ মিশন তার কাজকর্মের মাধ্যমে ভারতবাসীর হৃদয় জয় করে ফেলে এবং অনেকাংশে সেজন্যই একসময় ব্রিটিশরাজের সন্দেহের বস্তুতে পরিণত হয়। মিশনের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের প্রসঙ্গ আলোচনার আগে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ উল্লেখযোগ্য বক্তব্যটি লক্ষ্য করা যাক।

যেদিন তিনি কল্পতরু হয়েছিলেন সেদিন সমাগত ভক্তবৃন্দকে তিনি শুধু এই কথাই বলেছিলেন: "তোমাদের চৈতন্য হোক।" সমাগত ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে কথাটি উচ্চারিত হলেও সেটি উদ্দেশিত ছিল ভারতবাসী তথা মানবজাতির প্রতি। এই ক্ষুদ্র অথচ গভীর অর্থবহ কথাটির মধ্যে যে দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনার্থ রয়েছে তার মূল কথা হলো চেতনার বিপ্লব না হলে অন্য কোন বিপ্লব সম্ভব নয়। ভারতে জাতীয়তার উন্মেষে এটাই ছিল তাঁর প্রায়-শেষতম আশীর্বাণী ও মহত্তম শুভেচ্ছা। ঘটনাটি ঘটে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি আর সে বছরের আগস্ট মাসেই তাঁর তিরোধান ঘটে। এই বছরই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের জাতীয়তাবাদিগণ তাঁদের ব্যক্তিগত ও দলগত মতান্তর দূরে সরিয়ে একটি সাধারণ জাতীয় মঞ্চে মিলিতহয়ে ভারতবাসীর স্বাধিকার অর্জনের জন্য তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রথম শুরু করেন।

রামকৃষ্ণ জীবনদর্শনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারীজাতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি সন্ন্যাস নিলেও গৃহে বাস করতেন এবং সহধর্মিণীকে ত্যাগ করেননি। পুরুষের কর্মযজ্ঞে নারীর অংশগ্রহণ যে প্রয়োজনীয় সে-কথা তিনি বুঝেছিলেন এবং বেশি করে যা বলার চেষ্টা করেন তা হলো নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা না দিলে মানুষের সামগ্রিক প্রচেষ্টা হবে খণ্ডিত ও সাফল্যও পূর্ণাঙ্গ হবে না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল গান্ধীজীর আহ্বানে বিংশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে। কিন্তু ভারতীয় নারীর সামাজিক ভূমিকা ধর্মীয় ভাবায় আভাসিত হয়েছিল তার অনেক আগে রামকৃষ্ণ-সারদার সম্পর্কের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের সকল কাজে সকল সময় সহায়তা করতেন তাঁর স্ত্রী সারদাদেবী যাঁকে তিনি একদিন জগন্মাতার সাক্ষাৎ প্রকাশ হিসেবে পূজা করেছিলেন এবং প্রণাম করেছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় মননে এই ঘটনা ছিল বিপ্লবের সামিল, কিন্তু একদিনের এই ঘটনা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ যা বোঝাতে চাইলেন তা হলো নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমমর্যাদায় তার সামাজিক ভূমিকা পালন করতে দিলে তবেই ঘটবে পরিপূর্ণ জাতীয়তার উন্মেষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আর একটি প্রতীকী ঘটনা ঘটেছিল যেদিন গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে তিনি একহাতে মাটি আর অন্যহাতে টাকা নিয়ে অনেকক্ষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ঝুলেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলি গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শান্তিলাভ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি ধনসর্বস্ব, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, ভোগাসক্ত জাতিকে ধিক্কার জানাতে চেয়েছিলেন। সারাজীবন টাকা না ছুঁয়ে এবং স্ত্রীর প্রতি ইন্দ্রিয়াসক্ত না হয়ে তিনি যে-জীবনাদর্শ স্থাপন করলেন তা

থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল ভারতের হাজার হাজার মানুষ, বিশেষ করে বিপ্লবী যুবসমাজ—যাদের প্রধান ছিলেন আধুনিক সমাজসচেতন পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত মননের প্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথ।

নরেনকে বিবেকানন্দ হিসাবে গড়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব। তাঁর নিজের কাজ প্রায় শেষ বুঝতে পেরে তিনি নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে যান তাঁর স্বোপার্জিত সব শক্তি। তখন নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধিলাভ করতে চাইলে তাঁকে তীব্র ভৎসনা করেছিলেন এই বলে যে, চরম স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের মুক্তি চাওয়া অন্যায়। স্পষ্টভাষায় নরেনকে বলেছিলেন, তাঁকে লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি তৈরি করেছেন। আর নরেন সে-কাজে তার অসামর্থ্যের কথা তুললে তিনি জোরের সঙ্গে বলেন: "তোর ঘাড় করবে"। অন্যদিকে স্ত্রী সারদাদেবীকেও তিনি ছাড়েননি। তাঁর জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি সারদাদেবীকে বলেন, তিনি স্থূলদেহে না থাকলেও তাঁর কাজ সারদাদেবীকে করে যেতে হবে। বললেন: কলকাতার লোকগুলো পোকার মতো কিলবিল করছে, তাদের দেখাশুনো করে মানুষ করতে হবে সারদাদেবীকে। স্ত্রী ও প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে রামকৃষ্ণের এই কথোপকথন পুরোপুরি ব্যঞ্জনাময়। ভারতের যে নবজাগরণ ঘটছে তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এই জাতীয় জাগরণের উন্মেষ ঘটাতে তিনি প্রভূত সাহায্য করেছিলেন এবং পরবর্তী যে-কাজ বাকি ছিল তার জন্য প্রয়োজনীয় চাপরাশ দিয়ে গেলেন স্ত্রী সারদাদেবীকে এবং প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে।

জাতীয়তার উন্মেষে তাঁর ভূমিকাকে ফলপ্রসূ করার জন্য তিনি তৎকালীন বঙ্গসমাজের উচ্চশিক্ষিত নেতাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেছেন কখনো নিমন্ত্রিত হয়ে আবার কখনো নিমন্ত্রিত না হয়ে। কারণ যুগপ্রয়োজনটাই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়। সমাজনেতাদের সহযোগিতা ছাড়া সামগ্রিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো সম্ভব নয় জেনেই সাক্ষাৎ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে। নিজের কাছে টেনে এনেছিলেন নরেন্দ্রনাথের মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক থেকে আরম্ভ করে লাটুর মতো গৃহভৃত্য এবং শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতো ধর্মজিজ্ঞাসুদের। তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছিলেন চরিত্রহীন গিরিশচন্দ্রকে, নটী বিনোদিনীকেও। বিদ্যাসাগরকে প্রশংসা করেছেন তাঁর দয়ার জন্য। দেবেন্দ্রনাথকে তাঁর ভগবদ্ভক্তির জন্য সম্ভ্রম জানিয়েছেন, বিজয়কৃষ্ণ-শিবনাথের চরিত্রের প্রশংসা করেছেন, কেশবচন্দ্রকে ভালবেসেছেন তাঁর ভক্তি ও বাগ্মীতার জন্য গিরিশকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন আর বিনোদিনীকে বলেছেন তার যেন চৈতন্য হয়। আরো কত কৃতী ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন তিনি, যেমন: মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম), রামচন্দ্র দত্ত, ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ইত্যাদি। এঁদের সবার সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে অসাধারণ ভাবের কথা বলেছেন। সবাইকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বোঝাতে চেয়েছেন মানুষের মহত্ত্বের কথা। মানুষ পাপের সন্তান নয়, সে আনন্দের সন্তান, সে পরম ব্রহ্মের অংশ। আর বলেছেন মানুষের একমাত্র কাজ হলো একনিষ্ঠ হয়ে নিজের নিজের কাজ করে যাওয়া, কারণ কর্ম ছাড়বার যো নেই। তিনি নিজে অনেক চেষ্টা করেও কর্মত্যাগ করতে পারেননি, স্বদেশবাসীদের তাদের বিরাট ঐতিহ্য সম্পর্কে সজাগ করে দেওয়ার বিরাট কাজটি তাঁকে করতে হয়েছে। ছাগলের দলে ব্যাঘ্রশাবকের রূপক গল্পের সাহায্যে ভারতবাসীদের তাদের বিরাট আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। মনুষ্যত্বের অনন্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন নানান গল্পের মাধ্যমে, রূপক ও প্রতীকের সাহায্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের ভাবের ঘরে কোন ফাঁকি ছিল না। শিশুর সারল্য নিয়েই তৎকালীন দিশেহারা সমাজকে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে সমগ্র সমাজের জীবনকে যোগ করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর 'গানের পসরা' ব্যর্থ হয়নি। সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, মানুষকে মানসিক ভীরুতা ও দুর্বলতা থেকে মুক্তি দিয়ে গেছেন। সকলের সঙ্গে মিশেছেন আর সকলকে বলেছেন যাচাই না করে কিছু গ্রহণ না করতে, এবং যাচাই-পরীক্ষা না করে তাঁর কথা মেনে নিতেও নিষেধ করেছেন। নরেনের (স্বামী বিবেকানন্দের) ও যোগীনের (স্বামী যোগানন্দের) মনে তাঁর নিজের আচার-

বিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা মাত্রই তিনি খুশি হয়ে তাদের স্বাধীন মনের তারিফ করেছেন। মুক্তবুদ্ধির পক্ষে কোন ধর্মীয় ব্যক্তির এমন জোরালো কণ্ঠস্বর খুব কমই শোনা গেছে পৃথিবীর ইতিহাসে। শ্রীরামকৃষ্ণের জাতীয়তাবোধের ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিক, কিন্তু চিন্তার প্রেক্ষাপট ছিল সামাজিক। আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবোধের যে দীপ তিনি জেবলেছিলেন কয়েকটি প্রাণে, তা দ্রুত শত শত ভারতীয়ের প্রাণে রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। দেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্বন্ধে গর্ববোধ না জাগলে স্বদেশভক্তি জাগে না এবং স্বদেশভক্তি ব্যতীত জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে ওঠে না। শ্রীরামকৃষ্ণ জাতীয়তার উন্মেষ ঘটিয়ে গেলেন আর তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে থাকল ঊনবিংশ শতকের শেষপাদ থেকে শুরু করে। তাঁর অধ্যাত্মচিন্তার রূপকাথ ও ব্যঞ্জনা বাংলার বিপ্লবীদের কাছে মন্ত্রশক্তির মতো কাজ করেছিল যখন পরাধীন ভারত সেই মন্ত্রধ্বনি শুনতে পেল তাঁর বার্তাবাহক স্বামী বিবেকানন্দের বজ্র-নির্ঘোষের মধ্য দিয়ে।

দেশাত্মবোধের উন্মেষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দুটি জিনিস—কর্মে নিষ্ঠা ও ত্যাগব্রতে দীক্ষা। এই দুটির উৎস নিহিত থাকে অধ্যাত্মশক্তির উদ্বোধনে। ভারতীয় তরুণদের পক্ষে দেশকে মাতারূপে কল্পনা করা এবং তাঁর জন্য সর্বস্ব পণ করে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা তখনই সম্ভব হয়েছিল যখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী তাদের কাছে পৌঁছাল। দেশমাতা আর জগন্মাতাকে অভেদ কল্পনা করা ছিল প্রথম যুগের বিপ্লবীদের মানসিক চরিত্র। দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করার মন্ত্র শিখিয়েছিলেন বঙ্কিম-চন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং এই তত্ত্ব বিপ্লবীদের কাছে তথা জাগ্রত জনমানসে প্রচার করেছিলেন অরবিন্দ। স্বদেশের রাজনৈতিক মুক্তি জাতীয় বিকাশের জন্য অপরিহার্য—এমন কথা তখনই সোচ্চার হয়ে উঠল যখন ভারতবাসী অতীতের গৌরবের কথা ও মানুষের মহত্ত্বের কথা ভালভাবে বুঝতে পারল। অরবিন্দের চোখে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ছিল এক *ধর্মযুদ্ধ এবং এই ধর্মযুদ্ধের প্রথম অগ্রদূত হিসাবে* তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই বারবার উল্লেখ করেছেন। সূর্যোদয়ের অনেক আগেই প্রত্যূষের আগমনবার্তা বহন করে আনে একদল পাখি। ভারতে জাতীয়তা-বোধের জাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভোরের পাখির ভূমিকাই পালন করেছিলেন।

অরবিন্দ তাঁর 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকাটিতে (১৯০৩) শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকার কথা বারবার উল্লেখ করেন। তাঁর মতে রামকৃষ্ণের জীবনসাধনা এই মহান বাণীই প্রচার করে গেছে যে, প্রতিটি মানুষের অন্তরে জীবন্ত ঈশ্বর আছেন এবং আমাদের মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বরের তেজ। ভারতবর্ষের ওপর অর্পিত হয়েছে মানুষের ঐক্যসূত্রসন্ধানী ধর্মের প্রতিষ্ঠা করার ভার। আর এই কাজটি আরম্ভ করে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সেই ধর্ম প্রচার করে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। অরবিন্দ সকলকে স্মরণ করতে বলেছেন যে, যিনি কালী তিনিই ভবানী, শক্তিদায়িনী মা, যাঁকে দক্ষিণেশ্বরে পূজা করতেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। পরে তিনি বলছেন, "শক্তিলাভ করতে হলে শক্তিস্বরূপা জগদম্বাকে পূজা করার প্রয়োজন। আমাদের জাতির চাই শক্তি। শক্তি এবং অধিকতর শক্তি।" বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্কে রচিত কলকাতার গোয়েন্দা পুলিস-প্রধান টেগার্টের রিপোর্টে (১৯১৪) 'ভবানী মন্দির' রচনা থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি আছে।

অরবিন্দের জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে ধারণা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাধারায় সঞ্জীবিত ছিল। তাঁর মতে ভারতের "জাতীয়তার আন্দোলন হচ্ছে একটি ধর্ম যাকে আশ্রয় করে আমরা বাঁচতে চেষ্টা করব। এ একটা ধৃতি যার সাহায্যে আমরা জাতির মধ্যে, দেশবাসীর মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে চাই।" এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অরবিন্দের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন: "আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য মতবাদে আস্থাবান কোন ব্যক্তি হয়তো বলিয়া বসিবেন, 'এই লোকটি জ্ঞান-হীন। কি সে জানে? আমি আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, আমাকে সে কি বা শেখাবে? কিন্তু শুধু ঈশ্বর জানেন যে, তিনি কি আজ ঘটাইয়া তুলিতেছেন।... আজ ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম হইতে শিক্ষিত জনগণ—যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, পাশ্চাত্যের সমস্ত শিক্ষা যাঁহাদের অধিগত—তাঁহারা এই তাপসের পদপ্রান্তে আসিয়া নিপতিত হইতেছেন। তাই আমি

বিশ্বাস করি মুক্তির কাজ সত্যই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।"

'ধর্ম' পত্রিকায় অরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখেন: "যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম-প্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরূপ তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই—একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস যাহা তিনি মুখে বলেন নাই, তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেম তাঁহার নিজস্ব, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেম তাঁহার পূজ্যপাদ গুরুদেবের দান।...শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলিতেন—'তুই যে বীর রে।' তিনি জানিতেন যে, নরেন্দ্রনাথের ভিতর যে-শক্তি তিনি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্যকরজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাব সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বে-পরোয়া হইয়া দেশের কার্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবদ্বাণী স্মরণ রাখিতে হইবে, 'তুই যে বীর রে'।"

অরবিন্দের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় যে, আলিপুর বোমার মামলার প্রাক্কালে দক্ষিণেশ্বরের কিছুটা পবিত্র মাটি তিনি শ্রদ্ধাভরে নিজের ঘরে রাখতেন। তাঁর বাসস্থান তল্লাসী করার সময় পুলিস উহাকে বোমা তৈরির মশলা মনে করে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে। বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর পুলিস অফিসার ক্লার্ক সাহেব মাটিকে মাটি বলে চিনতে পারেন এবং তা রাসায়নিক বিশ্লেষণে পাঠানো প্রয়োজনীয় নয় বলে সিদ্ধান্ত করেন। এই মাটি রাখার ব্যাপারে অরবিন্দের যে বিশ্বাস প্রকাশ পায় তা হলো এ যুগের বিস্ফোরক শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের পদ-স্পর্শরঞ্জিত দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে আত্মগোপন করে আছে।

অরবিন্দ ব্যতীত, বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মতো জাতীয়তাবাদী নেতারাও স্বীকার করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি ও তেজ দেশকে জাগাচ্ছে এবং মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অগ্নিযুগের তরুণদের সমিতিগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিকে নিত্যপূজা করা হতো। অরবিন্দ-বারীন্দ্র ছাড়াও অন্ততঃ আরো দুজন বিপ্লবী নায়কের কথা জানা যায় যাঁদের জীবন এবং চিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। এঁদের একজন রাসবিহারী বসু। টেগার্টের রিপোর্ট থেকে জানা যায় বিপ্লবী আন্দোলনের কাজে ইনি পাঞ্জাব ও বাংলার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেন। তাঁর চন্দননগরের বাড়িতে তল্লাসী চালিয়ে (মার্চ ১৯১৪) পুলিস রামকৃষ্ণের আলোকচিত্র সহ মিশনসংক্রান্ত পুস্তিকাদি খুঁজে পায়। দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধানের সময় পুলিস জানতে পারে যে, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের হরিদ্বার কনখল শাখার সদস্য ছিলেন। অন্য বিপ্লবীর নাম হেমচন্দ্র ঘোষ যিনি বিনয়-বাদল-দীনেশের মতো শত শত বাঙালী যুবককে দেশমাতার সেবায় জীবনপণ করে সর্বস্ব ত্যাগ করতে শিখিয়েছিলেন। [স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থে হেমচন্দ্র ঘোষের প্রেরণার উৎস সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রয়েছে।] টেগার্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগুলি দিগ্বিদিকে প্রচার করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দই ভারতের সর্বত্র মিশনের শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপদেশ দেন এবং তাঁর সেই আদেশ বিপ্লবীরা চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

বাংলায় বিপ্লব-যুগে বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতি-গুলিতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও স্বামী বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' পাঠ শুনিয়ে তরুণ কর্মী সংগ্রহ করা হতো। বিপ্লবীদের পরিচালিত পাঠাগারগুলিতে 'কথামৃত' বইটি ছিল অবশ্য পাঠ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী মুক্তিমন্ত্রের কাজ করতো এবং তার মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ দেশসেবার জন্য জাতীয়তার মন্ত্রে আকৃষ্ট হতো। পুলিসের কাছে বা আদালতে বিচারের সময় বহু বিপ্লবীর জবানবন্দী থেকে এ কথা জানা যায়। ১৯১০—১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পুলিসের জেরার উত্তরে বাংলার অধিকাংশ বিপ্লবীই নিজেদের স্পষ্ট ভাষায় "রামকৃষ্ণের অনুগামী" বলে অভিহিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' করার উপদেশ বিবেকানন্দের ভাষায় অনুরণিত হয়: বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর / জীবে

প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। দরিদ্র নরনারায়ণের সেবা এবং বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে আর্ত-পীড়িতের সেবার কাজে বিপ্লবীদের সোৎসাহে শ্রমদান করতে দেখা যেত বাংলার গ্রামে-শহরে। টেগার্ট রিপোর্ট স্পষ্টভাবেই এখানে রামকৃষ্ণের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছে। স্বদেশবাসী ও জন্মভূমির সেবা ও তার মঙ্গলের জন্য সর্বস্বত্যাগ হলো ধর্ম এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম-সম্পর্কিত ধারণা বিপ্লবকার্যে ইন্ধন যুগিয়েছিল বলেই টেগার্টের মনে হয়েছিল।

ভারতে বিপ্লবী কাজকর্মের অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় বিচারপতি রাওলাটের নেতৃত্বে গঠিত সিডিশন কমিটিকে। সিডিশন কমিটির রিপোর্টে (১৯১৮) বিপ্লবীদের ওপর বিবেকানন্দের মাধ্যমে সাধক রামকৃষ্ণের পরোক্ষ প্রভাবের উল্লেখ করা হয়।

দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু একজন ঈশ্বরে নিবেদিত প্রাণ আধ্যাত্মিক পুরুষমাত্র ছিলেন না, তাঁর মধ্যে কোটি-কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি ঘটেছিল। তাঁর সমন্বয়ী ধর্মভাবনা ভারতে সাম্প্রদায়িক সংহতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তাঁহার ধর্ম জীবনমুখী যার কেন্দ্রস্থলে আছে মানুষ, শাস্ত্র নয়। তিনি কোন নিজস্ব ধর্মমত প্রচার করতে বসেননি। গণমানুষের জয়কে তিনি বড় করে দেখিয়েছেন এবং ভারতের অতীত ঐতিহ্যকে নতুন ও চমকপ্রদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সে-কারণেই ভারতাত্মার প্রতীক, আধুনিক যুগে আমাদের আদর্শ পুরুষ। তাঁর সংগ্রাম না ছিল সাম্প্রদায়িক, না ছিল রাজনৈতিক। তিনি কোন সংগঠন বা দল গঠন করেননি। ভারতের শাশ্বত মূল্যবোধ অনাবিষ্কারের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন ভাবলোকে (world of ideas)। তাঁর সাধনা ছিল জাতির আত্মশক্তি উদ্বোধনের সাধনা। সেজন্য লোকশিক্ষার ওপর অত জোর দিয়েছিলেন এবং জোর করে স্ত্রী সারদামণিকে ও শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে এই কাজের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবন ও বাণীতে মৃতপ্রায় ভারতবাসীর জীবনে জেগে উঠেছিল নতুন প্রাণশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও ক্ষাত্রতেজ। ভারতের অবহেলিত ও উপেক্ষিত জনসমাজ ফিরে পেয়েছিল আত্মসম্মান। স্বধর্মে হতাশাগ্রস্ত ধর্মত্যাগীরা আপনধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি ও তাৎপর্য সম্পর্কে নতুন আলোর সংকেত পেয়েছিলেন। তিনি কোনদিন আপন গৌরব প্রচার করার জন্য অলৌকিক ক্ষমতা ও সিদ্ধাই দেখাননি। শুধু ভক্তির পথ ধরে এগিয়ে সত্যকে আঁকড়ে ধরতে বলেছিলেন। সকলকে শিখিয়েছিলেন যে, মানুষ অনন্ত শক্তির অধিকারী।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মানুষী চরিত্রের অন্বেষণ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, ঈশ্বর লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে আদর্শ মনুষ্য রূপে লোকালয়ে আসেন। এই ধরনের মানুষ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন না কিন্তু নিজে মানবতার শ্রেষ্ঠ গুণরাজিতে ভূষিত হয়ে স্বকার্য সাধন করেন। যুগ প্রয়োজনেই এই ধরনের আদর্শ মানুষ আসেন এবং প্রয়োজনীয় যুগধর্ম প্রবর্তন করে বিদায় নেন। শ্রীকৃষ্ণের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রের স্থূল মর্ম মনুষ্যত্ব, দেবত্ব নয়। কিন্তু চরিত্রের মহত্ত্বে তিনি অন্যের চোখে দেবত্ব লাভ করেছেন। লোকহিত পরিত্যাগ করে তিথিতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব ইত্যাদি কচ্‌কচানিতে নিবদ্ধ না থেকে লোকহিতার্থে কর্ম করাই যথার্থ ধর্ম এবং এই ধর্মই জাতীয়তার প্রথম ধাপ, কেননা এর দ্বারাই জাতির বিকাশ ও উন্নতি সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষার মূল কথাগুলি হলো পরমতসহিষ্ণুতা, শিব জ্ঞানে জীব সেবা, সকল মানুষের সাম্য, দরিদ্র ও অবহেলিতের প্রতি ভালবাসা, সকল মানুষের মধ্যে উদাম ঐক্য ও তাদের চৈতন্যের বোধন। এই লোকশিক্ষার ধর্মই শ্রীরামকৃষ্ণকে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসব

কুমুদবন্ধু সেন

[বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে আছে ; তথাপি ঐ অবিস্মরণীয় ঘটনার জনৈক প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হিসাবে বর্তমান লেখক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যযুক্ত এই যে স্মৃতিধ্যানটি পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা পাঠকপাঠিকাগণের উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই।]

প্রায় তিপ্পান্ন বৎসর আগেকার কথা। সেই পুণ্য স্মৃতি আজও মাঝে মাঝে মনে উদিত হয়। পুরাতন জীর্ণ কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একদিন এক টুকরা নিজের লেখা ১৩০৮ সালের দিন-তারিখ-সমেত বেলুড় মঠের দুর্গোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাইলাম। এই স্মৃতির অর্ঘ্য পাঠকবর্গকে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইব।

বাংলা ১৩০৮ সাল—ইংরেজী ১৯০১ খ্রীস্টাব্দ। সেবার মহালয়া ২৬ আশ্বিন, শনিবার। বেলুড় মঠে গিয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দ আছেন। কয়েকমাস পূর্বে পূর্ববঙ্গ ও কামাখ্যা-তীর্থ দর্শন করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। এই ভগ্ন স্বাস্থ্যেই সদানন্দ মহাপুরুষের মুখমণ্ডল দিব্য ভাবজ্যোতিতে দীপ্তিমান্। আকর্ণবিস্তৃত নয়নদ্বয় তেজঃপূর্ণ, প্রেমকরুণায় সমুজ্জ্বল। মহালয়ার দিন মঠে শুনিলাম, বেলুড় মঠে প্রতিমায় দুর্গোৎসব হইবে, ইহা ঠিক হইয়াছে।

সুহৃদ্বর, 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর মুখে পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, কামাখ্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মৃন্ময়ী প্রতিমাতে শ্রীশ্রীমা দশভুজার পূজার সঙ্কল্প স্বামীজীর মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু মহালয়ার পূর্বে বহুবার যাতায়াত করিয়াও কাহারও নিকট স্বামীজীর এই সঙ্কল্পের কথা শুনিতে পাই নাই। মহালয়ার দিন অপরাহ্ণে পশুপক্ষী-দের লইয়া খানিকক্ষণ খেলা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী বিল্বমূলে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া তিনি মধুরকণ্ঠে আপন মনে গাহিতে লাগিলেন—বোধনের গান।

"গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী
চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী জটাজুটধারী॥
মেয়ের কোলে মেয়ে দুটি রূপসী
লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী
সুরেশ কুমার গণেশ আমার
তাদের না দেখিলে ঝরে নয়ন-বারি॥"

ঠাকুরঘরে সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল স্বামীজী ধীরে ধীরে দোতলায় নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই রাত্রিতে আমি মঠে বাস করিলাম। পরদিন রবিবার প্রাতে একটু বেলা হইলে স্বামীজী নিচে নামিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মঠের গঙ্গাতীরের বারান্দায় হেলানদেওয়া বেঞ্চিতে বসিলেন। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও স্বামী প্রেমানন্দজী সেখানে আসিলেন। তাঁহাদের সহিত পূজার আয়োজন এবং নানা-বিধ বন্দোবস্তের প্রসঙ্গ আলোচিত হইল। নানাস্থানে গৃহস্থ ভক্তগণ এবং বালি উত্তরপাড়া প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রামসমূহের ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে, জাতিবর্ণনির্বিচারে সকলকে এবং বিশেষভাবে দরিদ্রনারায়ণগণকে পূজার দিবসত্রয় প্রতিমাদর্শন ও প্রসাদ গ্রহণের আমন্ত্রণ করিবার কথা হইল। স্বামীজী গুরুভ্রাতৃদ্বয়কে বলিলেন—"খরচের জন্য ভাবনা নেই—মহামায়ার ইচ্ছা, তা পূর্ণ হবে। নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে মা ঠাকরুণ

সদলবলে থাকবেন। একমাসের কম যখন ভাড়া দেবে না—তখন তাই স্বীকার করে নিতে হবে।" মহারাজ বলিলেন, "ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। এখন প্রতিমা পেলে হয়। কুমারটুলিতে কোনও কুমোরই এত অল্প সময়ে নূতন প্রতিমা তৈয়ার করতে রাজী হলো না। তৈয়ারী প্রতিমা তো কৃষ্ণলাল* পেলে না। একজনের মাত্র একখানি ফরমাশী প্রতিমা আছে, ৫।৭ দিন পূর্বে তার নেবার কথা ছিল, কিন্তু নেয়নি। কৃষ্ণলাল ঐ প্রতিমাখানি নিতে চাইলে—খুব ইতস্ততঃ করছে, আরও দুদিন অপেক্ষা করতে চাইছে।"

স্বামীজী বলিলেন, "বাবুরাম, তুই যা কৃষ্ণলালকে নিয়ে। যে টাকা চায় সেই টাকা দিয়ে প্রতিমাখানি কিনে ফেল। কৃষ্ণলাল ছেলেমানুষ, তোরা গেলে সে রাজী হয়ে যাবে। আমিও তোদের সঙ্গে কলকাতায় যাব।"

গুরুভ্রাতারা অমনি বলিয়া উঠিলেন—"তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমরা সব করব। তুমি এখানে বসে থাক। ঠাকুরের ইচ্ছায় তোমার শরীর ভাল থাকলে, তবে তো আনন্দময়ীর উৎসবে সকলে আনন্দোৎসব করতে পারবে।"

স্বামীজী বলিলেন, "মার কৃপায় ভাল থাকব, ভাবিসনি। প্রতিমা ঠিক করে মা ঠাকরুণকে নিমন্ত্রণের পর সিমলায় আমার মার কাছে যাব, তাঁকে পুজোয় মঠে আসতে বলব। আজ রবিবার, এখনই নৌকা ঠিক কর, আর দেরি করা হবে না। প্রতিমাখানি না কেনা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারা যায় না।"

কানাই মহারাজের (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) নিকট শুনিলাম, দুইদিন আগে স্বামীজী নৌকায় কলিকাতা হইতে মঠে আসিবার সময় দেখিলেন যেন মঠে দুর্গোৎসব হইতেছে, মায়ের প্রতিমাখানি চারিদিক আলো করিয়া শোভা পাইতেছে। মঠে নামিয়াই রাজা (মহারাজ) কোথায় খোঁজ হইল। মহারাজ আসিলে তাঁহাকে "এবার মঠে প্রতিমা এনে দুর্গোৎসবের আয়োজন কর" বলিয়াই স্বামীজী তাঁহার দর্শনের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। মহারাজও বলিলেন, "মঠে এই বেঞ্চিতে বসে গঙ্গাদর্শন করছি—এমন সময় দেখি, মা দুর্গা দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গার উপর দিয়ে চলে এসে একেবারে বেলতলায় উঠলেন।" তাহা শুনিয়া স্বামীজী আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "যেরূপে হোক, এবার মঠে পুজো করতেই হবে।" মহারাজ বলিলেন, "সময় সংক্ষেপ আগে প্রতিমা পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিতে হবে—দুদিন পরে তোমাকে কথা দেব।" এদিকে মঠের সাধুব্রহ্মচারীরা আয়োজন ও নিমন্ত্রণ করিতে ইতোমধ্যেই আরম্ভ করিয়াছেন, মঠে দুর্গোৎসব—স্বামীজীর ইচ্ছা কে রোধ করিবে?

যে প্রতিমা কুমারটুলিতে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল দেখিয়া ঠিক করিয়াছিলেন, তাহার গ্রাহক আর আসে নাই। স্বামী প্রেমানন্দ কুমারের প্রার্থিত মূল্য দিয়াই কিনিলেন।

৩১শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর), বৃহস্পতিবার মঠের সাধু ব্রহ্মচারীরা শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা নৌকায় করিয়া মঠের ঘাটে তুলিলেন, ধীরে ধীরে যত্নসহকারে ঠাকুরঘরের নিচের দালানে প্রতিমা রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে প্রবল বৃষ্টি—আকাশ যেন ভাঙিয়া পড়িল। মঠের জমিতে উত্তর দিকে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসবে এখন বৃহৎ মণ্ডপ নির্মিত হয়—সেইখানে সেবার শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। জলঝড় হইলেও যাহাতে কোনও প্রতিবন্ধক না হয়, সেইরূপ সাবধানতার সঙ্গে মণ্ডপটি তৈয়ার করা হইয়াছিল।

১লা কার্তিক (১৮ই অক্টোবর) ষষ্ঠীতে বিল্বতলায় বোধন হইল—

"বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন—"

স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত সেই গীত সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল। শ্রীশ্রীমাও এইদিন কলিকাতার বাগবাজার হইতে অন্যান্য পরিজনবর্গ ও মেয়ে ভক্তদের লইয়া গঙ্গাতীরে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে আগমন করিয়াছিলেন। প্রতিমা মণ্ডপে আনা

* পরে স্বামী ধীরানন্দ

হইল। কলিকাতা হইতে বহু প্রাচীন ও নবীন ভক্ত আসিয়াছিলেন। মহোৎসব আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীজগজ্জননী দুর্গামায়ীর প্রাক্ বোধন, অধিবাস ও ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। অগ্রে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লইয়া পূজা করিতে বসিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল এবং তন্ত্রধারক হইলেন পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) পূর্বাশ্রমের পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। ঈশ্বরচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক পণ্ডিত 'জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

প্রতিমার সম্মুখে যখন পূজক ব্রহ্মচারী ভক্তিভাবে অর্চনায় সমাসীন, পার্শ্বে দীর্ঘকেশ শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত রুদ্রাক্ষমালা পরিশোভিত তেজোদীপ্ত কাষায়বস্ত্রধারী তন্ত্রধারক ঈশ্বরচন্দ্র সুললিত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন—তখন দর্শনার্থীরা তন্ময়চিত্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিল। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীবক্ষে প্রাতঃকালে রোশনচৌকীর সানাই মধুরসুরে নানা রাগিণীতে বাজিতেছিল এবং মাঝে মাঝে ঢাকঢোল দুই কূল পরিপ্লাবিত করিয়া মহামায়ীর পূজাবার্তা বীরগর্বে ঘোষণা করিতেছিল। বালি-উত্তরপাড়া-বেলুড়ের স্থানীয় অধিবাসীদের স্বামী বিবেকানন্দ এবং মঠের সাধুদের সম্বন্ধে কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল। দেখিয়াছি, কেহ কেহ ফলমিষ্ট প্রসাদস্বরূপে গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত। কিন্তু মঠে যোড়শপচারে শ্রীশ্রীদুর্গামায়ীর শাস্ত্রবিহিত বিস্তারিত পূজা, আনুপূর্বিক সকল অনুষ্ঠান, শুদ্ধাচারে ক্রিয়াকলাপ তাহাদের চিত্তে মঠ ও স্বামীজীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক করিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই অপূর্ব পরিবেশ—আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ সকলের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীমার নামে পূজার সংকল্প হইয়াছিল। তাঁহার অনভিপ্রেত বলিয়া পূজায় পশু-বলিদান হয় নাই। ভক্তেরা দেখিতেছেন—একদিকে দশপ্রহরণ-ধারিণী-সিংহবাহিনী অসুরদলনী দশভুজা—দক্ষিণে সর্বৈশ্বর্যদায়িনী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ—বামে পরাবিদ্যাস্বরূপিণী জ্ঞানদাত্রী কমলদলবাসিনী সরস্বতী ও দেবসেনাপতি কার্তিকেয়—মৃণ্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী দেবীর আবির্ভাব, অপরদিকে স্বয়ং মহাশক্তি মানবী দেহে শ্রীশ্রীজগজ্জননী মাতৃরূপে অবতীর্ণা—উপাস্য ও উপাসিকা ভাবে পূজামণ্ডপে বিদ্যমানা। এই অপূর্ব ছবি দেখিয়া আনন্দরসে ভক্তদের হৃদয় পরিপ্লুত হইতেছিল।

স্বামীজী মহাষ্টমীর দিন সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় (প্রথম ভাগ) আছে—শ্রীমা বলিতেছেন, "পূজার দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই খাটছে। নরেন এসে বলে কি, 'মা, আমার জ্বর করে দাও।' ওমা, বলতে না বলতে খানিক বাদে হাড় কেঁপে জ্বর এল। আমি বলি, 'ওমা, একি হল, এখন কি হবে?' নরেন বললে, 'কোন চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম এই জন্যে যে, ছেলেগুলো প্রাণপণ করে তো খাটছে, তবু কোথাও কি ত্রুটি হবে আমি রেগে যাব, বকব, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসব। তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম—কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।' তারপর কাজকর্ম চুকে আসতেই আমি বললুম, 'ও নরেন, এখন তা হলে ওঠ।' নরেন বললে, 'হ্যাঁ মা, এই উঠলুম আর কি'—বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি ওঠে বসল।" মাতা পুত্রের এই কথাবার্তা আমাদের তখন অজ্ঞাত। সপ্তমীর দিন সদানন্দময় পুরুষ স্বামীজীকে এদিক ওদিক পায়চারি, গল্প ও হাস্য-কৌতুক করিতে দেখিয়াছি—সমাহিত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শ্রীশ্রীদুর্গামণ্ডপে বসিয়া আছেন—কখনো গুন গুন স্বরে গাহিতেছেন—

"সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা
করতালি।"

রবিবার, মহাষ্টমী। মঠে হাজার হাজার নরনারী পূজা দেখিতে ও পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিয়াছে। কেহ কেহ স্বামীজীকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শুনিল স্বামীজী দোতলায় স্বীয় কক্ষে জ্বরে শয্যা-গ্রহণ করিয়াছেন। তবুও চারিদিকে আনন্দের হাট চলিয়াছে, হাজার হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ পাইতেছে। দরিদ্রনারায়ণদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া খাওয়াইতে হইবে—ইহা ছিল স্বামীজীর আদেশ।

পরদিন সোমবার প্রাতে সন্ধিপূজা—ভোর সাড়ে ছয়টার কিছুক্ষণ পর সন্ধিপূজা আরম্ভ—স্বামীজী পূজামণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার পাদপদ্মে সচন্দনজবাবিল্বদলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন—কে বলিবে গতকল্য তিনি অসুস্থ ছিলেন? উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় সহাস্য মুখমণ্ডল,—ভাবগম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। যথাবিধি কয়েকটি কুমারীর পূজা হইল—স্বামীজী একজনকে পূজা করিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! শ্রীশ্রীমা উপস্থিত ছিলেন।

মহানবমীর সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর স্বামীজী স্বয়ং ভজন গান ধরিলেন। ঠাকুর যেসব গান নবমীর রাত্রিতে গাহিতেন, উহাদের কয়েকটি গাওয়া হইয়াছিল।

৫ই কার্তিক মঙ্গলবার ৺বিজয়া দশমী। অপরাহ্নে দলে দলে লোক মঠে প্রতিমা-বিসর্জন দেখিতে আসিল। গঙ্গাতীরে মঠের ঘাটটি লোকে লোকারণ্য হইল। প্রতিমা যখন নৌকায় উঠান হইল—তখন ঢাক, ঢোল, রোশনচৌকী এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী বাদ্য ব্যাণ্ড প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। গঙ্গাবক্ষে প্রতিমা যখন নৌকায় তোলা হইতেছিল, চারিদিকে "মহামায়ী-কী জয় দুর্গামায়ী-কী জয়" শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।—এই সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটি বৃন্দাবনী চাদরের গাঁতি বাঁধিয়া সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। দেবী-প্রতিমার সম্মুখে ভাবে বিভোর হইয়া তালে তালে মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহারাজের সেই অপূর্ব ভাবময় মনোরম মধুর নৃত্য সকলে নির্বাক-ভাবে মুগ্ধনেত্রে আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে দর্শন করিল। স্বামীজী ভগ্নস্বাস্থ্যে ভিড়ে নিচে নামিয়া আসেন নাই। কিন্তু পরে মহারাজ নাচিতেছেন শুনিয়া মঠের দোতলার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্য দেখিতে লাগিলেন।

নৃত্য থামিলে চারিদিকে আবার ঘন ঘন উচ্চ কণ্ঠে "মহামায়ী-কী জয়—দুর্গামায়ী-কী জয়" ধ্বনি গর্জিয়া উঠিল। ভাগীরথীর তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে নৌকা চলিল—প্রতিমার বিসর্জনে।

পরদিন শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে চলিয়া আসিলেন। আজও বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবে সেই স্মৃতি জাগিয়া উঠে। এখনও শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী সাধু ব্রহ্মচারীদের অর্চনায় আনন্দময়ীর পূজায় যে আনন্দ ও অপূর্ব ভাব উদ্দীপিত হয়—তাহা অন্যত্র দুর্লভ।*

* উদ্বোধন, ৫৬তম বর্ষ (১৩৬১), ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন, পৃঃ ৫০৫—৫০৮

নিবন্ধ

মৃত্যুঞ্জয়

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ভবতোষবাবু মৃত্যুশয্যায়। অনেকদিনকার ভক্ত। কিছুকাল হইতে ভুগিতেছিলেন। বড় ইচ্ছা ছিল দেশে ফিরিলে একবার যেন দেখা করিয়া আসি। বেলুড় মঠে পৌঁছিবার দুদিন পরেই ফোন আসিল ভবতোষবাবুর অবস্থা বড়ই সংকটজনক। মঠের পূজনীয় ম্যানেজার মহারাজ বলিলেন, যাও একবার দেখা করে এস। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের বর্ষাকাল। ১৫ বৎসর দেশ ছাড়া। রাত্রি হইয়া গিয়াছে। একজন সাধুভাইকে সঙ্গে লইয়া বাসে রওনা হইলাম দক্ষিণ কলিকাতায়। বাসে ভ্রমণ—১৫ বৎসর আগে অনেক করিয়াছি, কিন্তু এখন সেই ভ্রমণ যে কি কষ্টকর তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিলাম। অবশ্য ট্যাক্সির চেষ্টা করা হইয়াছিল পাওয়া যাইল না।

দুই সন্ন্যাসী ভবতোষবাবুর শয্যার পাশে গিয়া বসিলাম। দক্ষিণদিকের দেওয়ালে ঠাকুর ও তাঁহার গুরুদেবের ফটো টাঙানো রহিয়াছে। ধূপ জ্বলিতেছে। তাঁহার পুত্রেরা এবং নাতনী তাঁহার মাথার কাছে গিয়া আমাদের আগমনসংবাদ দিলেন। ভবতোষবাবুর চোখ বন্ধ নয়। পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছেন এবং অনিমেষ চোখে গুরু ও ইষ্টের ছবির দিকে তাকাইয়া আছেন। অতি পরিচিত সন্ন্যাসি-দ্বয়ের দিকে একবারও চোখ ফিরাইলেন না। বৃহৎ সংসার। রোগীর ঘরে আত্মীয়স্বজনগণের আনা-গোনা চলিতেছে। ভবতোষবাবুর কোনও হুঁশ নাই। চেতনা যে হারাইয়াছেন তাহা মনে হইল না। তবে চেতনা এখন অন্তর্মুখ। খেলাঘর ভাঙিতেছে।

এখন আর খেলার পুতুলের দিকে মন দিবার বাতুলতা কেন? একজন সন্ন্যাসী দু-তিনটি স্তব পাঠ করিলেন, দুটি ভজনও গাহিলেন। ভবতোষবাবু শুনিলেন কিনা বুঝা যাইল না।

বড় ভাল লাগিল। গীতার শ্লোকটি মনে পড়িল ঃ

"নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥"
(গীতা, ১৫।৫)

—সংসারের মান মোহ যখন কাটিয়া যায়, দুষ্ট বিষয়াসক্তি যখন নিস্তেজ হয়, মন যখন সকলপ্রকার কামনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া হৃদয়স্থিত চৈতন্যসত্তা আত্মাতে অবস্থান করে তখন জীব সুখদুঃখাদি সকল দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া অজ্ঞানের পারে শ্রীভগবানের সেই চিরন্তন পদ প্রাপ্ত হয়।

মঠে ফিরিবার পরের দিন খবর আসিল ভবতোষবাবু দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে যেভাবে দেখিয়া আসিয়াছিলাম তাহাতে বিশ্বাস হইল তিনি ঠাকুরের উত্তম ভক্ত শাশ্বতগতি লাভ করিয়াছেন। সংসারে তাঁহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না। দেহের মৃত্যু ঘটিয়াছে, কিন্তু ভবতোষবাবু অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

সংসারে আমরা যখন অত্যন্ত মত্ত থাকি, ভগবানকে নিত্য একটু ডাকিবার সময় পাই না, ডাকিবার প্রয়োজনও বোধ করি না, তখন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'বদ্ধজীব'। শাস্ত্র ও সাধুসন্তগণ মানুষের এই বদ্ধাবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট পান। এই বদ্ধাবস্থা বা অজ্ঞান জন্মজন্মান্তর ধরিয়া চলে। অজ্ঞান দূর হইতে পারে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইলে। শাস্ত্র ও সাধু মহাত্মারা জন্মমৃত্যুর প্রবাহ হইতে পরিত্রাণের উপদেশ দিয়া যান মানুষকে। কেহ কেহ শোনে, অধিকাংশই গ্রাহ্য করে না। তাহারা ভাবে বেশ তো আছি। আধি-ব্যাধি দুঃখ-কষ্ট মাঝে মাঝে আসিবে, তা আসিলই বা। সংসারে নানাপ্রকার সুখও তো কম নাই। দেহসুখ, পারিবারিক সুখ, বিদ্যালাভের সুখ, নানাপ্রকার সম্পত্তিলাভের সুখ, দেশভ্রমণের সুখ, মান-সম্মানের সুখ। সংসারে যখন আসিয়াছি, তখন সংসারকে ষোল আনা ভোগ করিবার চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই দৃষ্টিভঙ্গি যাঁহাদের তাঁহারা কঠোপনিষদের ভাষায় প্রেয়ঃকামী। ইহার বিপরীত যাঁহারা তাঁহারা শ্রেয়ঃকামী। তাঁহারা সংসারে একান্তই সংখ্যালঘু। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন ঃ "সা চাতুরী চাতুরী।" ভগবৎ পথে যাঁহারা চলেন সংখ্যালঘু হইলেও তাঁহারাই চতুর। তাঁহারা মায়ার অসংখ্য আকর্ষণে মুগ্ধ হন না, প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেন ভগবানই সার, সংসার অসার। ঠাকুর বলিতেন, সংসার মানে সৎ-ই যাহার সার।

সন্ত তুলসীদাসজী বলিয়াছেন, "জহাঁ কাম তহাঁ নহী রাম, জহাঁ রাম তহাঁ নহী কাম।"—রাম যেখানে প্রত্যক্ষ সেখানে কাম অর্থাৎ বিষয়-বাসনা থাকিতে পারে না, আর কাম যেখানে অতিশয় প্রকট রামের প্রকাশ সেখানে বন্ধ। তুলসীদাসজীর উক্তি কঠোপনিষদের শ্রেয় ও প্রেয়েরই ব্যাখ্যান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলিয়াছেন ঃ ভগবানকে লাভ করাই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। যাহা কিছু তাহার প্রতিবন্ধী তাহা হইতে সাবধান।

মৃত্যুর সামনে দাঁড়াইয়া মৃত্যুকে গ্রাহ্য না করা একদিনে ঘটে না। শাস্ত্র, সাধু মহাপুরুষদের উপদেশ মনে রাখিয়া দিনের পর দিন যথাসাধ্য অনুসরণ করিলে তবেই উহা সম্ভবপর হয়। ভবতোষবাবু যে অন্তিম সময়ে সংসারের সকল বিষয় হইতে মন গুটাইয়া সারা মন দিয়া গুরু-ইষ্টের চিন্তায় তন্ময় রহিলেন এই পরম সাহসিকতা কি তিনি একদিনে পাইয়াছিলেন? শ্রেয় ও প্রেয়ের বিচার নিশ্চয়ই তিনি আবাল্য বা আযৌবন অভ্যাস করিয়াছিলেন। ফলে দিনে দিনে তাঁহার চরিত্রে বৈরাগ্য, ভক্তি, বিশ্বাস তত্ত্বদৃষ্টি সঞ্চিত হইয়াছিল। ইহাদিগকে গীতা দৈবী সম্পদ বলিয়াছেন। "দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।" (গীতা ১৬।৫) —দৈবী সম্পদ দিয়া মুক্তিলাভ করা যায় আসুরী সম্পদে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার প্রভৃতি) নিজেকে আচ্ছন্ন করিলে তাহার পরিণাম নিবন্ধ অর্থাৎ মৃত্যু—বারবার সংসারে যাতায়াত। ইহাতে

যে কত দুঃখ তাহা বিচারশীল মহাজনরা বুঝিতে পারেন। সেজন্য তাঁহাদের প্রাণ সংসারাবদ্ধ অভাগাদের জন্য কাঁদে। কিন্তু অভাগারা কি শোনে? তাহারা উলটিয়া লাঠি লইয়া তাড়া করে। কিছু কিছু লোক শোনে। তাহারা ভাগ্যবান। তাহারাই মৃত্যুঞ্জয়।

জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি চলিয়াছে। আমরা জীবনকেই ভালবাসি, মৃত্যুর কথা ভাবিতে চাহি না। বাড়ির পাশ দিয়া 'রাম নাম সচ্ হ্যায়' অথবা 'বলো হরি হরি বোল' ধ্বনি তুলিয়া শবদেহ শ্মশানে লইয়া চলিয়াছে, আমরা জানালা দিয়া একটু কৌতূহলে তাকাই। ভাবি—যাহার মরিবার সে মরিয়াছে, আমি তো বাঁচিয়া আছি। অতএব হৃদয় কাঁপে না।

দক্ষিণেশ্বরে একটি সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। ভক্তেরা ঠাকুরকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। মণি মল্লিক ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং একধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মণি মল্লিক প্রাচীন ব্রাহ্মভক্ত। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর কুশল প্রশ্ন করিলে ভক্তটি বলিলেন তিনি শ্মশান হইতে মৃত পুত্রের সংকার করিয়া সিধা দক্ষিণেশ্বর আসিয়াছেন। কঠিন শোকসংবাদ। কিন্তু ঠাকুর কোনও কথা বলিলেন না, কোনও সান্ত্বনা প্রকাশ করিলেন না। অপর সকলে ঠাকুরের এই ব্যবহারে বিস্মিত। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর ঠাকুর হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ভাবস্থ হইয়া গান ধরিলেন—

জীব সাজো সমরে,
রণবেশে—কাল প্রবেশে তোর ঘরে। ইত্যাদি।

—হে জীব কাল অর্থাৎ মৃত্যু যুদ্ধবেশে তোমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। ভয় পাইও না, বসিয়া থাকিয়ো না। তুমিও মৃত্যুর সহিত লড়াই কর। মা ব্রহ্মময়ীর শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তুমি অবশ্যই মরণজয়ী হইবে। তোমারও তো অস্ত্রশস্ত্র কম নাই।

"ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞানতূণ,
রসনা-ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।"

ভাবাবেশে ঠাকুর অনেকক্ষণ দাশরথি রায়ের এই গানটি গাহিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। এই গানের ভাব সকলের হৃদয় স্পর্শ করিল। মণি মল্লিক মহাশয় পুত্রশোক ভুলিয়া গেলেন।

গীতা বলিয়াছেন:

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"
(৭।৩)

—হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ক্বচিৎ একজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। সিদ্ধির জন্য যত্নশীল বহুর মধ্যে ক্বচিৎ একজন কেহ আমাকে (ভগবানকে) ঠিক ঠিক জানিতে পারে। ঠিক ঠিক জানার নাম ভগবানকে লাভ করা—জন্ম-মরণ হইতে মুক্তি—মৃত্যুজয়। পৃথিবীতে নানা সময়ে বহু মানুষ স্ত্রী হউন, পুরুষ হউন, গৃহী হউন, ত্যাগী হউন, শ্রেয়ের পথ অবলম্বন করিয়া মৃত্যুকে যে জয় করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবতোষবাবু একটিমাত্র উদাহরণ। মৃত্যুজয় যদি একটি কথার কথা মাত্র হইত তাহা হইলে উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র এমন জোর দিয়া ভগবানলাভের কথা বলিতেন না। কঠোপনিষদের নির্ভীক নিঃসন্দিগ্ধ উৎসাহ-বাণী: "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"—উঠ, (মোহনিদ্রা হইতে) জাগো, তত্ত্বদ্রষ্টাগণের সঙ্গ কর, জ্ঞানলাভ করিয়া মানবজন্ম ধন্য কর।"

বেদান্ত জ্ঞানপথ এবং ভক্তিপথ উভয়পথেই মৃত্যুজয়ের কথা বলিয়াছেন। জ্ঞানপথের মুক্তি জীব ও ব্রহ্ম যে আলাদা নন, এই উপলব্ধি। ভক্তিপথের মৃত্যুজয় ভগবানের চিরন্তন সেবক ও ভক্ত হইয়া থাকা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—চিনি হইয়া যাওয়া নহে, চিনি খাওয়া। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, সর্বশেষে চরম জ্ঞান ও পরমা ভক্তি এক হইয়া যায়। যাহা জ্ঞান, তাহাই ভক্তি, তাহাই সবসীমা সর্ববন্ধন হইতে পরিত্রাণ—অমৃতত্ব।

প্রবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম

শিশির কর

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব পরোক্ষ হলেও অপরিসীম। অন্তঃসলিলা নদীর মতোই তা নিয়ত প্রবহমান ছিল। মুক্তি-সংগ্রামীরা তাঁর সৃষ্ট পরিমণ্ডল থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, অনুপ্রাণিত হয়েছেন তাঁর জীবন ও বাণী থেকে। এই অনাড়ম্বর পরম বিনয়ী মানুষটিকে ঘিরে এমন এক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল যে, অনেকেই মহৎ জীবনের ডাক শুনেছিলেন তাঁর কাছ থেকে—স্বামীজীর মতো প্রত্যক্ষভাবে না হলেও। তাই তো জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে দেশজননীর শৃঙ্খলমোচনে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সামনে ছিল তাঁর মহান অনুপ্রেরণাময় জীবন। মানুষের মুক্তির কথা, মানব-কল্যাণের পথের কথা, মানব-জীবনের লক্ষ্য ও সার্থকতার কথা অতি সহজ ও সরল ভাষায় তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, "যত মত তত পথ।" প্রয়োজন নেই ধর্মে ধর্মে সংঘাতের, প্রয়োজন নেই ভিন্ন ভিন্ন মতের মানুষের মধ্যে তর্কাতর্কি, বিবাদ-বিসংবাদের। সব মতই সত্যে পৌঁছানোর, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের এক-একটি সোপান। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে একাগ্র সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মানিকতলায় অরবিন্দ-বারীন্দ্রের স্বদেশী বোমা-তৈরির আখড়ায় রাখা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর পবিত্র মৃত্তিকা। বিপ্লবীরা মনকে সতেজ ও পবিত্র রাখার জন্য পড়তেন তাঁর 'কথামৃত' ও জীবনী। আর তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে তো প্রত্যক্ষ প্রেরণাই পেয়েছিলেন মুক্তি-সংগ্রামীরা। মানবমুক্তির দিশারী প্রচার-বিমুখ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণেরই আবিষ্কার স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দেরও আবিষ্কার শ্রীরামকৃষ্ণ।

এ-দেশের মুক্তি-সংগ্রামীদের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের বিপুল প্রভাবের কথা আছে রোমাঁ রোলাঁর লেখায়: "এই 'মহত্তর ভারত', এই নূতনতর ভারত—যাহার বিকাশের কথা রাজনীতিকরা ও পণ্ডিতরা উটপাখির মতো আমাদের নিকট এতদিন লুকাইয়া আসিয়াছেন এবং যাহার বিস্ময়কর প্রভাব এখন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—রামকৃষ্ণের আত্মায় তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে। পরমহংসের এবং যে বীর পরমহংসের চিন্তাকে কর্মে পরিণত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যুগল নক্ষত্র বর্তমানে ভারতকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করিতেছে। তাঁহাদের উষ্ণ জ্যোতি ভারতের মৃত্তিকার মধ্যে ময়দানের মতো কাজ করিয়া তাহাকে উর্বর করিতেছে। ভারতের বর্তমান নেতারা—মনীষীদের রাজা, কবিদের রাজা এবং মহাত্মা—অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী—এই রাজহংস ও ঈগলের যুগ্ম নক্ষত্রের আলোকে বিকশিত, কুসুমিত ও ফলভারাক্রান্ত হইয়াছেন। অরবিন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ্যে একথা স্বীকারও করিয়াছেন।"[১]

আমাদের মুক্তি সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতে আমাদের জাতীয়তা বিকাশের স্থায়ী ভিত্তি শ্রীরামকৃষ্ণই গড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়, "এইসময় শ্রীরামকৃষ্ণও আবির্ভূত হইয়া সর্বকালের জন্য সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, সকল ধর্মই একই সর্ব-শক্তিমান বিধাতার চরণতলে সম্মিলিত হয়। সার্বজনীন পরমতসহিষ্ণুতা এবং প্রেমের ভিত্তিতে ভারতের সকল ধর্মের সমন্বয়—ভারতীয় জাতীয়তাবোধ বিকাশের স্থায়ী ভিত্তিমূল গড়িয়া তুলিবে।"[২]

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেছেন: "শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সহিত একযোগে না দেখিলে স্বামীজীকে যথার্থভাবে বিচার করা যাইবে না। স্বামীজীর বাণীর মধ্য দিয়াই বর্তমানের মুক্তি-আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন হইতে হয়, তবে তাহাকে হিন্দুধর্ম বা ইসলামের বিশেষ আবাসভূমি হইলে চলিবে না—তাহাকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত

১ The Life of Vivekananda and the Universal Gospel, 1979, p. 288 (অনুবাদ : ঋষি দাস)

২ সুভাষচন্দ্র বসু : সমগ্র রচনাবলী, সম্পাদক—শিশিরকুমার বসু, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩০

বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের একত্র বাসভূমি হইতে হইবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যে বাণী—ধর্ম সমন্বয়—তাহা ভারতবাসীকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হইবে।"[৩] শ্রীঅরবিন্দ বলেছেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিন থেকে নবযুগের সূত্রপাত।'[৪] শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেছেন, "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি ও তাঁহার সম্বন্ধে যে-সমস্ত পুস্তক রচিত হইয়াছে তৎপাঠে জানা যায় যে, তিনি দেশে যে-নূতন ভাব গঠিত হইয়াছে, যে-ভাবরাশি সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে, যে-ভাবতরঙ্গে মত্ত হইয়া কত যুবক সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আত্মাহুতি প্রদান করিতেছে, সে-ভাবের কথা তিনি কিছুই বলেন নাই। [কিন্তু] সর্বভূতান্তর্যামী ভগবান তাহা দেখেন নাই—একথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? যাঁহার পাদস্পর্শে পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার স্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যাঁহার আবির্ভাবে বহুযুগ-সঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত, যে-শক্তির সামান্য মাত্র উন্মেষে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম প্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরূপ, তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই—একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস—যাহা তিনি মুখে বলেন নাই, তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতকে, ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে, আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলিয়া কিছু দাবি করেন নাই। লোকগুরু তাঁহাকে যেভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা। তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিচার ছিল না। তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণ বীরসাধকভাবে গঠন করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেনঃ 'তুই যে বীর রে।' তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতরে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন, কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্যকবজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাব সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকেও বেপরোয়া হইয়া দেশের কার্য করিতে হইবে, এবং অহরহ এই ভবিষ্য-দ্বাণী স্মরণপথে রাখিতে হইবে, 'তুই যে বীর রে'।"[৫]

আমাদের দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ অহিংস সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধী অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের ইংরেজী জীবনীর ভূমিকায় লিখেছেনঃ "রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন—ধর্মকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাহিনী। তাঁর জীবন আমাদের ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করার সামর্থ্য দিয়েছে। তাঁর জীবন-চরিত পড়লে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, অন্য সকলই অনিত্য। রামকৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বরের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁর উক্তিসমূহ নিছক পণ্ডিতের উক্তি নয়, সেগুলি জীবন-গ্রন্থের পৃষ্ঠা, সেগুলি তার নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উদ্ঘাটন। তাই সেগুলি পাঠকের মনে ছাপ রেখে যায়, তাই থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। এই সংশয়ের যুগে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—যা সহস্র সহস্র নরনারীর জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করেছে। তাঁর দৃষ্টান্ত ভিন্ন এই সকল নরনারী আধ্যাত্মিকতার আলোক লাভ করতে পারত না। রামকৃষ্ণের জীবনে আছে অহিংসার পরম শিক্ষা।"

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুই মহানায়ক মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী থেকে চরিত্র গঠনের রসদ সংগ্রহের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা এবং তাঁদের বহু অনুগামী এবং আরও অসংখ্য মুক্তি-সংগ্রামী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও রামকৃষ্ণের বাণী ও উপদেশকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। মুক্তি-সংগ্রামীদের লেখা থেকে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'

৩ উদ্বোধন, ৩৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৩৭, পৃঃ ৭০

৪ Sri Aurobindo (Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Pondicherry), Vol. I, p. 799

৫ Ibid, Vol. IV, p. 259

স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করেছিল, তৈরি করেছিল তাঁদের মনকে দেশের মুক্তির জন্যে জীবন উৎসর্গে।

বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের, বিশেষ করে সশস্ত্র বিপ্লবীদের চরিত্রালোচনা যাঁরা করেছেন, তাঁরাই বিশেষ জোর দিয়ে এঁদের ওপর ধর্মের বিপুল প্রভাবের কথা বলেছেন। সে-ধর্ম আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়, দেহমনকে পবিত্র রাখার ধর্ম। এ ব্যাপারে গীতা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শক্তি সাধনায় সিদ্ধ। সেজন্য বিপ্লবীরা আগ্রহী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে। তাঁরা কিভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকে গ্রহণ করতেন, তার একটা দৃষ্টান্ত এই গোয়েন্দা-রিপোর্ট থেকে আমরা পাই: "অনুশীলন সমিতির কর্মপদ্ধতিতে সদস্য-ভুক্তির জন্য বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ্য-পুস্তকরূপে বিবেচিত হতো। বিপ্লবীদের বাড়িতে বিবেকানন্দের নামে পাঠাগারও দেখা যেত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং বিবেকানন্দের কর্মযোগ ছিল বিপ্লবীদের কাছে জনপ্রিয় গ্রন্থ।"৬ বস্তুতঃ বিপ্লবীদের যেসব গোপন পাঠাগার ছিল, সেখানে যেসব বইপত্র রাখা হতো, তাতে 'কথামৃত' থাকতই। মানসিক শক্তি অর্জন ও চিত্তের শুদ্ধির জন্য সেযুগে মুক্তি-যোদ্ধাদের কাছে 'কথামৃত' ছিল অবশ্যপাঠ্য বইগুলির অন্যতম।

কথামৃত, গীতার মতো ধর্মীয় গ্রন্থ কেন বিপ্লবীরা পড়তেন, তাঁদের লাইব্রেরীতে রাখতেন, দক্ষ পদস্থ ব্রিটিশ প্রশাসকরা, ঝানু গোয়েন্দারা সে-সম্পর্কে লিখেছেন। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ও নব-জাগরণের মূল প্রেরণা তো শ্রীরামকৃষ্ণই—একথা বলেছেন দুর্ধর্ষ বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স-এর মহানায়ক মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ। এই বিপ্লবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ লিখেছেন তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ—মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে' শীর্ষক গ্রন্থে। হেমচন্দ্র বলেছেন: "বৃটিশের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার ইঙ্গিত স্বামীজী নিশ্চয়ই ঠাকুরের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। কারণ, স্বামীজীর নিজের মুখে শুনেছি ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—'মনে রাখিস, ইংরেজই এদেশের সর্বনাশ করছে'।

"দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে সেই মহাসাধক ভবতারিণীর মৃন্ময়ী মূর্তির মধ্যে দেশমাতৃকার চিন্ময়ী সত্তাকে আবাহন করেছিলেন, পাথরের প্রতিমার মধ্যে সর্বৈশ্বর্যময়ী জগন্মাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর জাগ্রত করেছিলেন লেভিয়া-থানের মতো বিরাট, হাজার বছর ধরে নিদ্রিত এই জাতটার কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে। তাঁর সেই শক্তি-সাধনার হোমাগ্নি থেকেই যজ্ঞপুরুষ বিবেকানন্দ আবির্ভূত হয়ে ভারতবর্ষকে উত্তোলন করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের শক্তিই স্বামীজীর ভিতর দিয়ে কাজ করেছে। তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষায় এই অপূর্ব পুরুষের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। ভারতবর্ষের নবজাগরণের ক্ষেত্রে মূলপুরুষ তাই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। সারা পৃথিবীর জাগরণের ক্ষেত্রেও তাই। বিবেকানন্দ সেই জাগরণের প্রক্রিয়ায় দিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় গতিবেগ, প্রাণশক্তি, লক্ষ্যমুখীনতা, এবং পথনির্দেশ। এই দুই মহাপুরুষ যে কি ছিলেন এবং তাঁরা যে ভারতবর্ষকে এবং জগৎকে কি দিয়ে গিয়েছেন তা উপলব্ধি করতে আমরা এখনও কেউ পারিনি—এখনও বহু যুগ লাগবে।"৭

'কথামৃত' যে বিপ্লবীদের, দেশের সর্বশ্রেণীর স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রিয় গ্রন্থ ছিল তা সরকারি নথিভুক্ত গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ওপর, বিপ্লবীদের ওপর রামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শের প্রভাবের কথা সরকারি গোপন ফাইলে বারবার বলা হয়েছে।

শুধু গোয়েন্দা রিপোর্টই নয়, প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রশাসকদের গ্রন্থেও এ-তথ্য আছে। জেমস ক্যামবেল কারও (James Campbell Ker) বিপ্লবীদের ওপর ধর্মীয় গ্রন্থাদির প্রভাবের কথা লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থে আছে ঢাকা অনুশীলন সমিতির পাঠাগারে গীতাই ছিল ১৭টি। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ওপর ধর্মগ্রন্থাদি ও অন্যান্য বইপত্রের বিপুল প্রভাবের কথা তিনি লিখেছেন, তাঁর 'Political Troubles in India (1907—1917)' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। তিনি

৬ West Bengal State Archives, Freedom Fighters' Papers, No. 45

৭ স্বামী বিবেকানন্দ: মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, পৃঃ ৭৮—৭৯

লিখেছেন ঃ "এই পরিচ্ছেদে যেসব বইয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার সবগুলিই বাংলার তরুণরা আগ্রহের সঙ্গে পড়ত। মাঝে মাঝে বিভিন্ন তল্লাসিতে এই প্রতিটি বইয়ের অনেকগুলি কপি পাওয়া গেছে। বিশেষ করে ঢাকায় অনুশীলন সমিতির কয়েকশো বই আছে এবং সেখানে পাওয়া বই ইস্যুর এক তালিকা থেকে এইসব বইয়ের জনপ্রিয়তার সুস্পষ্ট আভাস মেলে।…

"…সহজেই দেখা যায়, এইসব পুস্তকপাঠে কিভাবে একজন যুবককে সহজে ও সরাসরি ধর্ম ও দর্শনের ধর্মীয়গ্রন্থ পাঠ থেকে রিভলভার ও বোমা ব্যবহারে নিয়ে যেত।"[৮] আর্ল অব রোনাল্ডসে তাঁর 'দি হার্ট অব আর্যাবর্ত' গ্রন্থেও তরুণ বিপ্লবীদের উপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।[৯]

ধুরন্ধর গোয়েন্দাকর্তা চার্লস অগাস্টাস টেগার্ট বিপ্লবী ও অন্যান্য স্বাধীনতা-সংগ্রামীর উপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাব সম্পর্কে এক গোপন রিপোর্ট দেন (২৪.৪.১৯১৪)। তাতে বিপ্লবীদের দলে তরুণদের আকৃষ্ট করার জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ভূমিকার উল্লেখ আছে ঃ

"নিহত হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বরের একটি রিপোর্টে বসন্ত জানিয়েছিলেন যে, ঢাকায় ফরাসগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে জ্ঞানরঞ্জন নিয়মিতভাবে আসতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং বিবেকানন্দের কর্মযোগ থেকে পাঠ করে কিভাবে সদস্য সংগ্রহ করা হতো সেসব ব্যাপারেও তিনি বলেন।

"ষড়যন্ত্র (পরিকল্পনার) অন্যতম নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের বরিশালের বাড়িতে একটি বিবেকানন্দ পাঠাগার ছিল। এখানে ছিল এক সেট বিবেকানন্দের রচনাবলী, পাঠাগারের নিয়মাবলীর একটি অনুলিপি এবং পাঠাগারের বইয়ের একটি তালিকা। এইসব বইয়ের মধ্যে ছিল পূর্বে-উল্লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং বইগুলি স্পষ্টতই বরিশাল দলের সদস্যগণের মধ্যে বিতরণ করা হতো।"[১০]

টেগার্টের রিপোর্টে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ এবং তাঁদের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারের জন্য গঠিত রামকৃষ্ণ মিশন শুধু বাংলার বিপ্লবীদেরই প্রভাবিত করেননি, বাংলার বাইরে দেশের অন্যত্র এবং বিদেশেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। টেগার্ট সেকথা লিখেছেন, তাঁর 'গোপনীয়' নোটে ঃ

"হিন্দুসন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীকে তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তা সম্প্রতি ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে (বৃটিশ) কর্তৃপক্ষের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এই কারণে করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত যে বিপ্লব-প্রয়াস বাংলাদেশের যুব-সম্প্রদায়কে আলোড়িত করেছে এবং যার বিষময় প্রভাব পাঞ্জাব এবং ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলিতেও বিপজ্জনকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলির সঙ্গে মিশন ও তার অনুগামীদের যোগাযোগ আবিষ্কৃত হয়েছে।"[১১]

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের জন্য দেশের যত্রতত্র, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে অজস্র 'রামকৃষ্ণ মিশন' গড়ে ওঠে। এর অধিকাংশই বেলুড় মঠের অননুমোদিত হলেও এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হতেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর আদর্শ সামনে রেখেই তরুণরা দেশজননীর শৃঙ্খলমোচনের শপথ নিত। গোয়েন্দাদের অভিযোগ, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করে বিপ্লবীরা এখানে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি চালাতেন। গোয়েন্দারা সরকারের নজরে তা আনেন এবং ভাইসরয় পর্যন্ত তা গড়ায়। টেগার্টের গোয়েন্দা-রিপোর্টে এসব তথ্য আমরা পাই ঃ

"সাধারণভাবে জানা ছিল যে, রামকৃষ্ণ মিশন ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করছে এবং রাজনীতি এবং অবাঞ্ছনীয় রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গেও তা সম্পূর্ণভাবে সংস্রবমুক্ত নয়। কিন্তু ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে বরিশাল

৮ Political Troubles in India (1907—1917), p. 44 ৯ The Heart of Aryavarta, p. 85

১০ দ্রঃ—বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৮৯ এবং পুলিস রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন—জাজ্জ্বল্যমোহন রায়চৌধুরী, পৃঃ ৮০ ১১ ঐ, পৃঃ ২৫৭—২৫৮ এবং ঐ, পৃঃ ৪০

ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধান শুরু না হওয়া পর্যন্ত এটা পরিষ্কার জানা যায়নি যে, এইসব অননুমোদিত বা ভূয়া গ্রামীণ আশ্রমগুলি পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে কি পরিমাণে গজিয়ে উঠেছিল। পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী দলের ৩৬জন সদস্যকে শেষ পর্যন্ত এই মামলায় বিচারের জন্য হাজির করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে যে ১২জন অপরাধ স্বীকার করেছিলেন তাঁরা সকলেই দীপান্তর ও বিভিন্ন মেয়াদের কারাবাসদণ্ড লাভ করেন।

"এদের অধিকাংশই ছিলেন ঢাকার নিষিদ্ধ অনুশীলন সমিতির সদস্য।..."[১২]

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'রামকৃষ্ণ' নাম যুক্ত করে তখনকার 'সন্ত্রাসবাদী' দলগুলিতে সদস্য সংগৃহীত হতো। ঝানু ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখে তা ধরাও পড়ে। টেগার্টের রিপোর্টেও তার উল্লেখ আছে। তাতে আরও বলা হয়েছে, বিপ্লবী দলে গোপনে সভা সংগ্রহের জন্য বাংলার নানাস্থানে 'ভুয়া' রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে ওঠে।[১৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বিপ্লবীদের সম্পর্ক এক সময় এত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে, সরকার এক সময় রামকৃষ্ণ মিশনকে বেআইনি ঘোষণা ও বেলুড়ে মিশনের সদর দফতর বন্ধ করে দেবার কথাও ভেবেছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তা লিখেছেন: "একদিন এইরূপ একটি গোপনীয় ফাইলের উপর দেখিলাম লেখা আছে, 'রামকৃষ্ণ মিশন'। আমি একটু আশ্চর্য বোধ করিয়া ফাইলটি আমার বসিবার ঘরে নিয়া পড়িতে লাগিলাম। ফাইলের সর্বনিম্ন তলে একটি পুলিস রিপোর্ট আছে—তাহাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণ মিশনের ৮।১০ জন সাধু পূর্ব-জীবনে বিপ্লবী ও গুপ্তসমিতির সভ্য ছিলেন, কেহ কেহ ডাকাতি করিয়াছেন এবং নানাভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করিতেন।

"তাঁহাদের পূর্বেকার ও বর্তমান সাধু অবস্থার নামও দেওয়া আছে। ইহার অনেক প্রমাণও ঐ ফাইলে ছিল। এই বিবরণের পর কয়েকজন পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী এবিষয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাও পর পর পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। সর্বশেষে সেক্রেটারী এইসব মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া বড়লাটের কাছে পাঠাইবার সময় প্রস্তাব করিলেন যে, বেলুড় মঠকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

"এইসব মন্তব্য পড়িয়া বড়লাট ফাইলে লিখিয়াছেন: পুলিসের রিপোর্ট এবং সেক্রেটারীর মন্তব্য খুব সম্ভব বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ জানিতে পারিয়াছেন। কারণ মাত্র কয়েকদিন পূর্বে একজন আমেরিকান মহিলা [মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড] আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, যদি বেলুড় মঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমেরিকায় ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হইবে। এসময় (খুব সম্ভব বিশ্বযুদ্ধে যখন বিপন্ন ইংরেজ আমেরিকার সাহায্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন) কোন রকমে আমেরিকার বিরুদ্ধভাজন হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং বেলুড় মঠ বন্ধ না করিয়া সাদা পোশাকে কয়েকজন পুলিস কর্মচারীকে সদা-সর্বদা বেলুড় মঠে নিযুক্ত করা হউক। যে-সমুদয় বিপ্লবীর নাম পূর্বোক্ত বিবরণীতে আছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা মঠে আছে, তাহাদের গতিবিধির উপর যেন কড়া নজর রাখা হয়।"[১৪]

সাদা পোশাকের পুলিস যে বেলুড় মঠে মোতায়েন থাকতেন, তা শুধু জনশ্রুতিই নয় গোয়েন্দা রিপোর্টে, ঐতিহাসিকদের সংগৃহীত তথ্যেও তা স্বীকৃত।

বিপ্লবীদের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের প্রভাব প্রসঙ্গে সিডিসন কমিটির রিপোর্টেও উল্লেখ পাই। এই কমিটির অন্যতম সদস্য বিচারপতি মুখার্জীর মন্তব্য: "ঈশ্বরেচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ধর্মীয় নীতিসমূহের মতো নীতিগুলিকে মতলববাজ ও দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিরা দুর্বলচিত্ত লোকেদের প্রভাবিত করার শক্তি-শালী উপায় হিসাবে প্রয়োগ করত।"

এই ব্যাখ্যা বিকৃত হলেও বিপ্লবীদের, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে রামকৃষ্ণ-ভাবধারার এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাবের কথা স্বীকার করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। বর্তমান লেখকের ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই-এ এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

১২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৮৬—২৮৭ এবং পুলিস রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন, পৃঃ ৮০
১৩ ঐ, পৃঃ ২৮৭ এবং ঐ, পৃঃ ৮১
১৪ উদ্ধৃত: স্বামী বিবেকানন্দ: মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে, পৃঃ ৯১—৯২

বাঙালীর দুর্গোৎসব

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রুতি বলিতেছেন, "রসো বৈ সঃ।" অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ। অনুভূতিগ্রাহ্য যাহা, তাহাই রস, হৃদ্‌গত আসক্তির দ্বারা যাহা অনুভবযোগ্য হয়, তাহাই রস। ভগবান রসস্বরূপ, অর্থাৎ তিনি মানুষের অনুভূতিগম্য, আসক্তিগ্রাহ্য। বৈষ্ণব আচার্যগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, রস চতুঃষষ্টী রকমের আছে এবং মানুষের হৃদয়ে একাদশ প্রকারের আসক্তি আছে। স্নেহ-রসের মধ্যে মাতৃভাবাসক্তি ও পুত্রস্নেহ অতি প্রবল। এই মাতৃভাবাসক্তি ও পুত্র-স্নেহের সমবায়ে ভগবানের জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী রূপের উপকল্পনা হইয়াছে। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় যে, ভগবান ভাবের ঠাকুর, অর্থাৎ তিনি ভাবগ্রাহ্য। সেই ভাবজন্য তিনি কখনো বা বনমালী শ্যাম নটবর, কখনো বা মুণ্ডমালাধারিণী ভীমা ভৈরবী শ্যামা। তিনি যাহা, তাহা আছেনই, চিরদিনই থাকিবেন। তবে সাধকের পরিতৃপ্তির জন্য তিনি মনোময় রাজ্যে নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন। সাধক যে ভাব অবলম্বনে সাধনা করিয়া থাকেন, সেই ভাবঘন অবস্থায় ইষ্টদেবতা ভাবানুকূল রূপে সাধকের হৃদয়-মধ্যে যেন ফুটিয়া উঠেন। ইহা ধ্যানগম্য ও জপসিদ্ধ রূপ। সাধক পরে এই রূপ লোকসমাজে প্রচারিত করিয়া দেন; মৃন্ময় রূপ গড়িয়া তাহার পূজা করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে বাংলায় দুর্গোৎসবের প্রবর্তনা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পূজার প্রচলন।

ভারতের কোনও প্রদেশে বাংলার পদ্ধতিক্রমে দুর্গোৎসব হয় না। তবে নবরাত্রের উৎসব ভারতের সর্বত্র প্রচলিত আছে। প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত এই নয় দিনের নয়টা নিশায় মহালক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে। এই পূজায় মার্কণ্ডেয় চণ্ডীপাঠ ও মহালক্ষ্মীর যন্ত্রে মহাবীজের সাহায্যে মাতৃশক্তির আবাহন হইয়া থাকে। একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। কি বৈদিক কর্মকাণ্ডে, কি তন্ত্রের জপতপে, পূর্বে আমাদের দেশে মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল না। বৈদিক কর্মকাণ্ড যজ্ঞ ও হোমে পরিসমাপ্ত হইত; তন্ত্রোক্ত কর্মে মন্ত্রপূজা ও হোম হইত। ভারতের প্রায় সকল তীর্থস্থানে যত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সকলেরই গোড়ায় একটি করিয়া সিদ্ধ যন্ত্র আছেই। বৌদ্ধ প্রভাবের পরই এদেশে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। বৌদ্ধ-তন্ত্রে মূর্তিপূজার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যখন পারস্যে, তাতারে, আরবে ও তুর্কীর দেশে মুসলমানধর্মের প্রথম প্রচলন হয়, তখন এই সকল দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল, মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল। তাই পারস্য ভাষায় মূর্তিপূজাকে "বোধ্‌পরস্ত্‌" বলা হয়। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ইহাই সিদ্ধান্ত। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য অতি প্রবল ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, বাংলা দেশেই মৃন্ময়ী মূর্তি গড়িয়া দেবপূজার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। ভারতের অন্যসকল প্রদেশে এই পদ্ধতি এখন সাধারণভাবে প্রচলিত নাই। বাস্তবপক্ষে পুরাতন সকল তন্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তন্ত্র মূর্তিপূজার জন্য তত ব্যস্ত নহে, যত যন্ত্রে ভাবারাধনা, হোম ও জপের জন্য ব্যস্ত। যাহা হউক, এই যন্ত্রোদ্ভূত ভাবকে শরীরী করিয়া দুর্গোৎসবের প্রবর্তনা এদেশে হইয়াছে, বলিতে হইবে। দুর্গার মূর্তি ভাবময়ী মূর্তি, দুর্গার পূজাও ভাবের পূজা।

এখন বুঝিতে হইবে ভাব কি, জপই বা কেমন, মন্ত্রের শক্তিই বা কতটুকু। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, গৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেবতা, উদ্বোধিত দেবতা—যে কোনও দেবতার নিত্য বা নৈমিত্তিক হিসাবে পূজা হইয়া থাকে—সকল দেবতাই গৃহস্থের জাতি, বর্ণ, গোত্র, প্রবর, সকলই গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবতাকে আত্মজের তুল্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তোমার বাড়িতে দুর্গোৎসব হইলে, তোমার বাটীর দুর্গা তোমার জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর সকলই গ্রহণ করিবেন। তোমার অশৌচ হইলে দেবতার অশৌচ হইবে। তাই ব্রাহ্মণ কায়স্থের বা শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম করেন না। আমরা খ্রীস্টানী ধর্মশাস্ত্রসকল পাঠ করিয়াছি; ইংরেজীশিক্ষিত

আমাদিগের অনেকের মনে এই ধারণা হইয়া আছে যে, ভগবান আমাদের ছাড়া আকাশের কোনখানে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ঘটে পটে আনিতে হয়। সে দেবতা ব্রাহ্মণ-শূদ্রে সকলেরই দেবতা। তাই কোনও ব্রাহ্মণ শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম না করিলে ইংরেজীনবীশ মহাশয়গণ ব্রাহ্মণকে ঠাট্টা তামাসা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেবারাধনার ইহা মূলতত্ত্ব নহে। আমাদের দেবী ভবানী জগন্ময়ী—জগদম্বিকা, আব্রহ্মতৃণস্তম্ব পর্যন্ত তিনি সর্বস্ব ও সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে, দুগ্ধে নবনীতের তুল্য নিত্য বিরাজিত। আমি জীব, আমিও যাহা, তিনি শিব, তিনিও তাহাই। তবে জীব আমি, অহঙ্কারাদি অবিদ্যাঘোরে জলবুদ্বুদের ন্যায় জলে থাকিলেও স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানে সদা প্রমত্ত। এই 'অহং-মমেতি'-ভাবের জন্য জীব শিব হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। এই পার্থক্য বা স্বতন্ত্রভাবের জন্য জীবের মনে চ্যুতির বা বিরহের ভাব পরিস্ফুট হয়। যে বিরহকাতর নহে, তাহার ভাগ্যে ভগবৎ-আরাধনা ঘটে না। জন্মে জন্মে নানা আঘাত খাইতে খাইতে তবে এই চ্যুতির জন্য কাতরতার ভাব মনে মনে জাগিয়া উঠে। এই বিরহের ভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যেই আরাধনা ও উপাসনার প্রবর্তনা; জীব-শিবে সমন্বয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই সাধনা। এই সাধনা প্রবৃত্তিমূলো ও নিবৃত্তিমূলো। সাধনার তিনটি অঙ্গ আছে, প্রথম কর্মযোগ, দ্বিতীয় ভক্তিযোগ, তৃতীয় জ্ঞানযোগ। বিষয়ী গৃহস্থের পক্ষে, নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রবৃত্তিমূলো সকাম সাধনাই প্রশস্ত। নিবৃত্তির আধার সন্ন্যাস-সংযম, সর্বত্যাগে ও বৈরাগ্যে বিন্যস্ত। প্রবৃত্তির আধার সর্বস্ব ইষ্টে বা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণে বিন্যস্ত। নিবৃত্তিমার্গে ভোগ নাই; প্রবৃত্তিমার্গে ভোগ আছে বটে, কিন্তু নিজের সামগ্রী বলিয়া, নিজের উপার্জিত বিত্ত বলিয়া উপভোগ নহে। আমার যাহা কিছু, সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের। পুত্র, বিত্ত, ঐশ্বর্য, গৃহস্থালী সবস্ব শ্রীকৃষ্ণেরই, আমি তাঁহার দাসানুদাস, আশ্রিত, প্রতিপাল্য; আমি তাঁহার প্রসাদ উপভোগ করিয়া তাঁহার কর্মচারীর ন্যায় সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছি। প্রবৃত্তিধর্মের মূলে এই সর্বসমর্পণের ভাব নিত্য বিরাজ করিতেছে।

আরও একটু রহস্য আছে। তিনি রহস্যময়—ভাবময়—গুণময়। আমি তাঁহার ভাবসাগরের বুদ্বুদমাত্র; আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তাঁহাতে মিশিতে হইলে, আমার হৃদ্গত রসের বা আসক্তির একটি ধারা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া, তদ্ভাবভাবুক হইয়া, তন্ময়তা লাভ করিতে হইবে। তবে আমার জীবন্মুক্তি ঘটিবে। তাই ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছিলেন ঃ

"এবার শ্যামা তোমায় খাব ;
তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটোর একটা করে যাব।"

অর্থাৎ, হয় আমি মাতৃভাবে ডুবিয়া মা-ময় হইয়া যাইব, নয় মা আমাকে তাঁহাতে মিলাইয়া লইবেন। ভক্তিসূত্রকার বলিয়াছেন, "ঈশ্বরতুষ্টেঃ একোঽপি বলী।"---ঈশ্বরতুষ্টির জন্য একটা আসক্তিকে প্রবলভাবে ধরিলেই কার্যসিদ্ধি হইতে পারে। দুঃখনিবৃত্তি ও সুখোপলব্ধির উদ্দেশ্যেই সাধনা। অহঙ্কারের জন্যই দুঃখ। কেননা, আমার আমিত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিলেই পদে পদে বাধা পাইতে হয়। "বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি।" বাধাই দুঃখ। অতএব বাধা দূর করিতে পারিলেই দুঃখ দূর হয়। বাধা যখন আমিত্বে, তখন এই আমিত্বের নাশ করিতে পারিলেই সুখ। রসময়, ভাবময়, আনন্দময় শিবে আমিত্বকে ডুবাইতে হইবে। আসক্তিকে ধরিয়া এই নিমজ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। আমার আসক্তি, আমার আত্মজ। আসক্তি-জন্যই ইষ্টের রূপ ও আবির্ভাব। তাই আমার ইষ্ট আমার আত্মজ, আমার গোত্র-প্রবরধারী। তিনি আমার ভাবের সন্তান—রসের বিতান। তাঁহাকে পিতা বলি, গুরু বলি, সখা বলি, মাতা বলি, পুত্র বলি—এসকল সম্বন্ধই তো আমার ভাবজ। আমি ডাকি বলিয়াই তো তিনি আমার মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, গুরু, কর্তা, প্রভু, পরিত্রাতা। ইহ-সংসারে আমি যাঁহাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র বলিয়া ডাকি, তাঁহারা যেমন আমার গোত্র-প্রবর-জাতি-বর্ণ-ধারী, তেমনই আমার দেবতা আমার সম্বন্ধে ভাবসংবন্ধ হইলে, তিনি আমারই হইয়া থাকেন। আমার ভাবের সন্তান বলিয়া পরিচিত হন। বিগ্রহপূজার গোড়ায় এই মাধুরীটুকু আছে। আমরা এ-মাধুরীর আস্বাদ গ্রহণ করিতে ভুলিয়াছি বলিয়া, বাংলায় দেবতার

পূজায় আর তেমন ভাবের ফোয়ারা ছুটে না।

দুর্গোৎসবে মা কন্যারূপে বাঙালীর গৃহে আসিয়া থাকেন। ভক্তের মা-ই সর্বস্ব, মাকে লইয়াই তাহার ঘর, গৃহস্থালি। কন্যারূপিণী জগন্মাতার তাই শ্বশুরবাড়ি আছে, স্বামী আছেন, বৎসরে বৎসরে এই সময়ে তাঁহাকে বাপের বাড়িতে আসিতে হয়। মায়ের আমার সাংসারিক সুখ-দুঃখ আছে, অভাব-অভিযোগ আছে, জ্বালা-যন্ত্রণা আছে; তাই তিনি জ্বালা জুড়াইতে বাপের বাড়ি আসেন। কাজেই ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছেন:

"এবার আমার উমা এলে,
আর আমি পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ,
কারো কথা শুনব না।
আমি শুনেছি নারদের মুখে—
উমা আমার থাকে দুখে,
শিব শ্মশানে-মশানে ঘোরে,
ঘরের ভাবনা ভাবে না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়,
উমা নেবার কথা কয়,
তবে মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই বলে মানবো না॥"

এমন ভাবঘন স্নেহের অভিব্যঞ্জনা বাঙালী ভক্ত ছাড়া আর কেহ করিতে পারে না। জগদম্বা কন্যা; যখন কন্যা, তখন ঠিক বাঙালীর মেয়ে হইয়া তাঁহাকে আমার কাছে আসিতেই হইবে। আমার দুলি, পুটি, বুড়ি যেমন আমার মেয়ে, উমা, গৌরী, পার্বতীও আমার তেমনই মেয়ে। যখন ভাব ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি, তখন ঠিক ভাবের মতো রূপেই তাঁহাকে ধরিতে হইবে। ভাবের পূজার মহিমাই এইটুকু।

ভগবানকে ভাবময়রূপে পূজা করিতে হইলে, সেই ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহার সর্বৈশ্বর্যের স্ফুরণ হইয়াই থাকে। এইটুকু জপে বুঝা যায়। যে-ভাবের যে-বীজ লইয়া যথোপচার জপ করিতে আরম্ভ কর না, সেই জপের ফলে প্রথমে বিভীষিকা, পরে প্রলোভন, শেষে সামীপ্য ঘটিবেই ঘটিবে। শব-সাধনার আদিতে যে বিভীষিকা দেখা যায়, সে-সকলই মানস, প্রকৃত নহে। ইংরেজীতে তাকে hallucination বল, আর যাহাই বল না কেন, জপের ফলে, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, ডাকিনী, যোগিনী, প্রমথগণের দ্বারা নানা বিভীষিকা দেখিতে পাওয়া যায়। মুমূর্ষু ব্যক্তিও এমনই বিভীষিকা দেখে। বিভীষিকা সামলাইতে পারিলে, পরে প্রলোভনের উদ্ভব হয়; অপ্সরী কিন্নরী কত আসে, কত নাচে, স্তূপে স্তূপে কত মণিমুক্তা দেখিতে পাওয়া যায়, কত ধন-দৌলত পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়ে। ভয় ও ত্রাসের উপর বিভীষিকার অভাব, কাম, ও লোভের উপর প্রলোভনের বিস্তার। এসকল কাটাইয়া উঠিতে পারিলে, তবে ঐশ্বর্যানুভূতি ঘটে। কি জানি কেন, কোন্ শক্তির অভাবে ঘটে, তাহা জানি না, কিন্তু শেষে দেখিতে পাই, ওতিপ্রোত যন্ত্রমন্ত্রধারিণী, সর্বশক্তিময়ী, সর্বভাবময়ী, বরাভয়দায়িনী জগন্ময়ী অপূর্বরূপে হৃদয় আকাশে স্থিরদামিনীর ন্যায় কোটি সূর্যের দ্যুতিতে ফুটিয়া উঠেন। যে যথারীতি জপ করিতে পারিয়াছে, জপে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার ভাগ্যেই এমন অপূর্ব দর্শন ঘটে। এই ঐশ্বর্যদর্শন হইতেই দুর্গোৎসবের দশভুজা মূর্তির পূজা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, গোরক্ষনাথ সর্বপ্রথমে এই রূপ দর্শন করেন। তাঁহার শিষ্য বিরূপাক্ষ এ সমাচার পান। বিরূপাক্ষের শিষ্য সদানন্দ স্বামী সর্বপ্রথমে দুর্গোৎসব করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময়েও বাংলায় কালীপূজা প্রবল ছিল, নবরাত্রের মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ঘটেও যন্ত্রেই হইত। সদানন্দের পদানুসরণ করিয়াই আগমবাগীশই এই দশভুজা পূজার প্রবর্তন করেন।

তন্ত্র ভাবের অক্ষয় খনি। দুর্গোৎসবে ভাবের সকল ঐশ্বর্যের বিকাশ হইয়াছে। চালচিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নবপত্রিকা পর্যন্ত দশভুজা মূর্তির সর্বস্ব ভাবের দ্যোতনা আছে। সে-ভাব, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভাব। আব্রহ্মতৃণস্তম্ব পর্যন্ত যে মা জগৎ জুড়িয়া বসিয়া আছেন, প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে যে মা হ্রী, শ্রী, ধী, লজ্জা, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি, তৃষ্ণাতৃষ্ণা, নিদ্রা, মায়ারূপে বিরাজমানা, সেই মায়ের অভিব্যঞ্জনা দশভুজা। দুর্গোৎসব ভাবের অশ্বমেধ, রসের রাজসূয়। দুর্গোৎসবে মা মহালক্ষ্মী, মহামেধা, মহাঘোরা, মহামায়া। তুমি এভাবের ভাবুক হইলে, তবে তো

ইঙ্গিতে বুঝাইতে পারি, এ মা কেমন—এ মা কিসের? কিন্তু যাহা মূকাস্বাদনবৎ, যে বুঝিয়াছে, সেই মজিয়াছে, তাহা তো ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। একটা কথা বলিয়া রাখি। তন্ত্রে বা কর্মপ্রধান শাস্ত্রে খোস-খেয়ালের কথা নাই। কর্ম আছে, কর্মের ফলশ্রুতি আছে। কর্ম কর, ফল পাইবেই। যদি যথারীতি কর্ম করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে সাধনা করিয়া ফল না পাও, তবে জানিও, সে কর্ম মিথ্যা, সে গুরু জুয়াচোর। তাই তন্ত্রের ধর্ম বুঝাইবার নহে, করিবার ধর্ম—কর্মীর ধর্ম। যে কর্ম করিয়া ফল পাইয়াছে, সে উহাতে মজিয়া গিয়াছে, পাগল হইয়া গিয়াছে। তাই দশভুজার পূজারও কিছু ব্যাখ্যা করিবার নাই; ব্যাখ্যা করিতে হইলে আগাগোড়া তন্ত্রতত্ত্ব বুঝাইতে হয়। যাহা বুঝানো যায় না, তাহা করিয়া কর্মিগণ দেখাইয়া দিতে হয়। বাংলায় কর্মী লোপ পাইয়াছে, তাই কর্মও লোপ পাইতেছে। কর্মভ্রষ্ট অনেক ভণ্ড বাংলার কর্ম পণ্ড করিয়াছে। কিন্তু বাঙালী ইষ্টদেবতাকে লইয়া একটি অপূর্ব ভাবের হাটবাজার বসাইয়াছিল। কি বৈষ্ণব, কি তান্ত্রিক, সবাই সংসারটাকে ইষ্টের সংসারে পরিণত করিয়াছিল, অহঙ্কারকে ভক্তির দৈন্যে এমনই আঁকিয়া জুখিয়া মনোময় করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সংসার দাবদাহের জ্বালা বারো আনা কমিয়া গিয়াছিল। এক দিকে রামপ্রসাদ প্রমুখ ভক্ত তান্ত্রিকগণ "আমি তুয়া দাস—দাসদাসীপুত্র হই" বলিয়া মা-ময় হইয়া থাকিতেন, অন্যদিকে বৈষ্ণব ভক্তগণ সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া মধুর রসের অপূর্ব মদিরা-ধারা-পানে নিত্য বিভোর হইয়া থাকিতেন। রঙ্গরস, ছড়া-কাব্য, গান—সকলই কালী, কৃষ্ণ, শিবকে লইয়া চলিত। তখন বিদ্যাসুন্দরেও মা কালীকে আসিয়া হাজির হইতে হইয়াছে। অচ্যুত গোস্বামী ও রামপ্রসাদ, উভয়েই কালী ও কৃষ্ণ লইয়া পরিহাস করিতেন। সবাই যেন ভাবে ডগমগ করিতেন, ভাবের ঘোরে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন।

বাঙালী ভক্ত ও কবি কখনও এই ভাবের খেলায় তত্ত্ব-হারা হন নাই। তাই দাশরথি রায় গান করিয়াছেন,

> "গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,
> স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
> চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল!"

তত্ত্বজ্ঞানটা কবির মনে টনটনে রহিয়াছে। তিনি মৃন্ময়ী রূপশালিনী দেবীকে চিন্ময়ী অরূপিণী বলিয়া বেশ জানিতেন। তাই আর একজন ভক্ত গান করিয়াছেন,

> "জান না রে মন, পরম কারণ,
> শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
> সে যে মেঘেরই বরণ, করিয়ে ধারণ,
> কখনও কখনও পুরুষ হয়।"

এই একটি ক্ষুদ্র গীতে দর্শন শাস্ত্রে—উপনিষদ্‌ শাস্ত্রের—উপনিষদরাশির একটা মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। মা যে মনোময়ী ভাবময়ী, একথা বাঙালীমাত্রেই জানিত, তাই ভাবুক কবি গাহিয়াছেন "তুমি দেখ, আর আমি দেখি মন, আর যেন কেউ না দেখে।" এই দেশব্যাপী ভাবমাধুর্য এখন আর নাই বলিলেও চলে। ধর্মময়-ভাবময় জীবন ছিল আমাদের, রসপূর্ণ—ভক্তিপূর্ণ সমাজ ছিল আমাদের। আমরা আপনহারা হইয়া ইষ্টের ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম। তাই বাংলা মর্ত্যের স্বর্গ ছিল—সুখময় স্নেহময় দেশ ছিল। ভাবের মহত্ত্ব এখনও বাঙালী বুঝিতে পারিলে জীবনের অনেক দুঃখের উপশান্তি ঘটে। বাঙালীর দুর্গোৎসবের গোড়ার কয়টা স্থূল কথা বলিয়া রাখিলাম; যদি কখনও আবার ভাবের উন্মেষ ঘটে, তবে তত্ত্ব-কথা কহিব।*

* সাহিত্য, ২২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১৮

সংগ্রহ: সংহীত চৌধুরী

স্মৃতিকথা

স্মৃতিতে স্বামী অখণ্ডানন্দ

উষারানী সান্যাল

স্বামী অখণ্ডানন্দ বা গঙ্গাধর মহারাজ বা স্থানীয় পরিচয়ে 'দণ্ডীবাবা' কিভাবে, কখন এবং কি প্রচেষ্টায় সারগাছি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, তা অনেকেরই জানা আছে। তবে আমি ছোটবেলা থেকে দণ্ডীবাবাকে দেখেছি, সেই দেখার স্মৃতি আমার অক্ষয় সম্পদ।

আমার বাবা সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মুর্শিদাবাদ জেলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় চিকিৎসক ছিলেন। আমার বাবার কাছে দণ্ডীবাবার আহ্বান এল সারগাছি দাতব্য চিকিৎসালয়ে অবৈতনিক চিকিৎসকের কাজ করবার জন্য। বাবার কাজ ছিল সপ্তাহে একদিন ঘোড়ার গাড়িতে করে শহর থেকে সাত মাইল দূরে সারগাছি আশ্রমে দুঃস্থ বিপন্নদের চিকিৎসা করার। ১৯২৪ পর্যন্ত আমি নিয়মিত বাবার সঙ্গে সারগাছি আশ্রমে যেতাম। পেতাম দণ্ডীবাবার স্নেহ-ভালবাসা। সে ভালবাসার স্বাদ এখনও আমার সত্তায় বিরাজমান।

কি সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর! জ্যোতির্ময় মূর্তি। ধারালো নাক। ব্যক্তিত্ব যেন ফুটে বেরুচ্ছে। বড় বড় চুল। নাদুস-নুদুস চেহারা। খুব লম্বা ছিলেন না। গলায় থাকত রুদ্রাক্ষের মালা। কতদিন দেখেছি, আশ্রমের বাঁধানো ইঁদারার পাশে বসে পরম স্নেহে অনাথ ছেলেদের স্নান করিয়ে যত্ন করে গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দিচ্ছেন। আবার দেখেছি, পুরাতন বারান্দার দালানে ব্রহ্মচারী ও অনাথ বালকদের নিয়ে দণ্ডীবাবা প্রসাদ পাচ্ছেন। উনি নিজে একটা টুলে বসে, অন্য একটা টুলে প্রসাদ রেখে খেতেন। দুপাশে সার দিয়ে অনাথ বালকরা ও ব্রহ্মচারীরা খাচ্ছেন। আমার বাবার বাইরে কোথাও খাওয়া নিষেধ ছিল। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি। আমাকে বললেন, "খুকি, প্রসাদ খাও।" আমি সেই আদরের ডাকে সঙ্গে সঙ্গেই অনাথ বালকদের পাশে বসে প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি।

সেদিনের সারগাছি আর কতটুকু! পুরনো দালান ও ঠাকুরঘর। গেটের উত্তর দিকে দাতব্য চিকিৎসালয়। মনে আছে পূর্বদিকে লম্বা রাস্তার দুদিকে ছোট ছোট পেঁপে গাছ ও তাতে বড় বড় পেঁপে ধরে থাকত। বাগানে ফুলের সমারোহ ছিল। কিছু কিছু ফলের গাছ লাগানো হয়েছে মাত্র। কি এক শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। আমার ঐ বয়সেই মনপ্রাণ জুড়িয়ে যেত।

আশ্রমের অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় মহারাজকে প্রায়ই বহরমপুর শহরে আসতে হতো। তখন বহরমপুর স্টেশনে শেয়ারের ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যেত। ভেতরে বসলে পয়সা বেশি লাগবে বলে চালকের পাশে বসে বিনা সঙ্কোচে তিনি যাতায়াত করতেন। কি নির্বাভিমান এবং কি কঠোর চরিত্র।

বাল্যকালেই আমায় বিয়ে হয়। আমার শ্বশুরবাড়িতেও দণ্ডীবাবার যাতায়াত ছিল। আমার স্বামী শশাঙ্কশেখর সান্যাল ও ভাসুর নলিনাক্ষ সান্যালের সঙ্গে আগে থেকেই তাঁর পরিচয় ছিল। আমি দেখেছি, দণ্ডীবাবা হয়তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, আমার স্বামীর অনুরোধে খুশি হয়ে আমাদের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করে গৃহস্থকে কৃতার্থ করেছেন। আমার শাশুড়িমা গরদের কাপড় পরে, দেবসেবা করার মতো গঙ্গাজলে ঠাঁই করে আসন পেতে ভক্তিভরে দণ্ডীবাবাকে খাওয়াতেন। আমি তখন বালিকাবধূ। আমার কাজ ছিল, তাঁকে পাখার বাতাস করা। তখন কি জানতাম যে ইনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান যন্ত্র ও পার্ষদ।

দণ্ডীবাবা নিয়ম করে দিয়েছিলেন বহরমপুর শহরে প্রতি গৃহস্থ বাড়িতে একটি করে মাটির ভাঁড় ব্রহ্মচারীরা দিয়ে আসবেন। যখন বাড়ির মেয়েরা দৈনিক রান্নার জন্য চাল মেপে ভাঁড়ার থেকে বের করবে, আগে ঐ ভাঁড়ে এক মুষ্টি করে চাল রাখবে। সপ্তাহ শেষে ব্রহ্মচারীরা সেই চাল সংগ্রহ করে আশ্রমে নিয়ে যেতেন। তখন আশ্রমের বড়ই অর্থসংকট। দণ্ডীবাবার অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনায় আজ সারগাছি আশ্রম কত বড় হয়েছে! আজ সারগাছি মহাতীর্থ।

শিবতুল্য সেই মহাপুরুষকে আমি দেখেছি। তাঁর চরণস্পর্শ করেছি। তিনিও আমার মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করেছেন। তখন বুঝিনি কার কাছে গিয়েছি, কার সান্নিধ্য পেয়েছি। কিন্তু না বুঝলেও গিয়েছি তো, পেয়েছি তো! আগুনে হাত জেনে দিই অথবা না জেনেই দিই, আগুনের যে শক্তি তা তো কাজ করবেই! আর তা-ই আমার তৃপ্তি এবং চরিতার্থতা।

নিবন্ধ

এ যুগের উদ্বেগ

আশাপূর্ণা দেবী

এই নিখিল বিশ্বে বিধাতার বহু বিচিত্র অনন্তসৃষ্টির মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ' সৃষ্টির নিদর্শন যেমন মানুষ, তেমনি 'নিকৃষ্ঠতম'-এর নমুনাও বোধকরি এই মানুষই। মানুষ যতটা মহান মহৎ সুন্দর পবিত্র হতে পারে, ততটাই ক্রুর কুৎসিত নীচ নোংরা অসুন্দর হয়েও উঠতে পারে। মানুষের সঙ্গে অন্য জীবের তফাৎ এইখানেই। সমগ্র জীবজগৎ তার সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিকা মেনেই চলেছে আদ্যন্তকাল। তারা অন্য কিছু হয়ে উঠতে পারে না আর মানুষ তাঁর নির্দেশকে অনায়াসে উপেক্ষা করে খোদার উপর খোদকারি করে চলেছে। কীট-পতঙ্গ থেকে শুরু করে, প্রাণী মাত্রেরই মূল কাঠামো তো একই। আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষার প্রবণতা, আর বংশধারা বহন করে চলা। মানুষেরও তো তাই। তবু কে না জানে মানুষ তার ঊর্ধ্বে আরো 'কিছু'—আরো 'অনেক কিছু'। সেই অনেক কিছুর সম্বলটি নিয়েই মানুষ আজ এই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে উঠেছে। সমগ্র জীবজগৎ যেন তার সুবিধের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। তাই তাদের ওপর তার যথেচ্ছ অধিকার। আবার জলে-স্থলে, ক্রমশঃ অন্তরীক্ষেও সে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে। মানুষ তার অধীত বিজ্ঞানের শক্তিবলে আজ দ্বিতীয় বিধাতার ভূমিকায়।

তাহলে ?

বিধাতা কি তাহলে ক্রমশঃই অসহায় হয়ে পড়ছেন ? মানুষ তাঁকে ক্রমশঃই কোণঠাসা করে চলেছে ?

আজকের পৃথিবীর বোধ হয় বিধাতার মুখোমুখি হয়ে এই প্রশ্ন করবার দিন এসেছে। জিজ্ঞেস করবার দিন এসেছে, 'তোমারই সৃষ্ট জীব ঐ স্বেচ্ছাচারী মানুষ কি তোমার সৃষ্টিকে ধ্বংস করে ছাড়তে চায় ? ক্ষমতার উল্লাস কি তার হিতাহিতজ্ঞান লুপ্ত করে দিয়েছে ?'

পৃথিবীর গর্ভে লক্ষ লক্ষ বছরের সঞ্চিত সঞ্চয়, যাদের মধ্যে ছিল পৃথিবীর জীবনী-শক্তিটিকে আরো অনন্তকাল টিকিয়ে রাখবার প্রতিশ্রুতি, সেই সঞ্চিত সঞ্চয়, আজকের বিশাল বলদৃপ্ত অহঙ্কারী মানুষ দুহাতে ওড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে। যেমন জমিদারের বুদ্ধিহীন ছেলেরা হঠাৎ বাবার সম্পত্তিটা হাতে পেলে কাণ্ডজ্ঞানহীন অমিতব্যয়িতায় দুদিনে উড়িয়ে-ছড়িয়ে সব শেষ করে বসে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে তুলে রাখার চিন্তা তো দূরস্থান, নিজেই নিঃস্ব হয়ে বসে। আজকের পৃথিবীরও যেন সেই অবস্থা এসে যাচ্ছে।

কিন্তু আজকের মানুষ কি শুধুমাত্র এই জীবধাত্রী পৃথিবীর সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ ধ্বংস করে করেই তাকে নিঃস্ব করে চলেছে ? নিজেও কি নিঃস্ব হতে চলছে না 'হৃদয় ঐশ্বর্য'কে ধ্বংস করে করে ? ক্রমশঃই যে হিংস্রতার প্রতি-যোগিতায় প্রথম হয়ে ওঠাটাই মানুষের বাহাদুরির পরাকাষ্ঠা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একদা কবিকণ্ঠে সমগ্র মানবসমাজের কণ্ঠ ধ্বনিত হতে শোনা গেছে—

'পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান
তার বেশি করে না সে দান,
আমারে দিয়েছ সুর, আমি তারও বেশি
করি দান,
আমি গাই গান।'

আর আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে, মাঝে মাঝে মনে হয়, আজকের ধ্বংসদশাগ্রস্ত মানুষ বুঝি নিজেই উল্লসিত চিৎকারে বলে উঠতে চায়—

'পশুরে দিয়েছ নখ দাঁত,
হিংস্রতায় করে রক্ত পান
আমারে দাওনি তাহা, তবু আমি
পশু হিংস্রতায় করি রক্ত পান।'

আজকের সমাজের দিকে দিকে যেন এই ধ্বনিরই আভাস। অকারণ হিংস্রতায় মানুষ প্রায় রক্তপায়ী জীবতুল্যই হয়ে উঠতে চাইছে। তবে এটাও ভাববার কথা মানুষের সমস্ত হিংস্রতা, ক্রূরতা, নির্লজ্জতা, ইতরতার তুলনা দিতে 'পশু' শব্দটাই বা ব্যবহার করা হয় কেন? কেন মানুষের জঘন্য, কুশ্রী সব আচরণকে বলা হয় 'পাশবিক'? এটা কি পশুসমাজের প্রতি অবিচার নয়? সৃষ্টিকর্তা পশুকে যেভাবে গড়েছেন, সে সেইভাবেই চলে আসছে। তার বাইরে সে কি কিছু করতে যায়? পশু কি সমাজবিরোধী হয়? ব্যাভিচারী হয়? পশু তাদের স্ত্রীজাতির ওপর নির্লজ্জ নৃশংস অত্যাচার করে? পশু কি কখনো তার প্রকৃতিদত্ত সীমারেখা লঙ্ঘন করে? সৃষ্টিকর্তার নিয়মকে অস্বীকার করে? পশুর আচরণে কি কখনো 'নির্লজ্জতা'র পরিচয় মেলে? সৃষ্টিকাল থেকেই তার জন্য যে আচরণবিধি রচিত হয়েছে, আজও সেই বিধিই সে বহন করে চলেছে।

আর মানুষ?

মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত নিয়ম আজও সেই বিধিই সে বহন করে চলেছে।

তাহলে? তাহলে মানুষের সমস্ত নির্লজ্জ নারকীয় আচরণের নমুনাকে 'পাশবিক' বলে অভিহিত করা কি সঙ্গত? সেটা যেন পশু-সমাজের প্রতিই অবমাননা। তথাকথিত এই 'মানুষের' মনুষ্যত্বহীন আচরণকে বরং বলা উচিৎ 'পৈশাচিক'। আজকের সমাজের যত্রতত্র সেই পৈশাচিক ক্ষমতার মদে মত্ততার দৃষ্টান্ত। এই অশুভ ক্ষমতা সমাজকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে সেটাই ভাববার। অথচ এই মানুষের মধ্যেই আছে 'দেবত্বে' উত্তরণের ক্ষমতা। এই মানুষই মহৎ হতে পারে, সুন্দর হতে পারে, পবিত্র হতে পারে।

কিন্তু হয় কই? তেমন দৃষ্টান্ত তো ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে। মানুষই মানুষকে নষ্ট করে। কিছু নষ্ট-ভ্রষ্ট মানুষ আপন নীচ স্বার্থে আরো কিছু মানুষকে টেনে নিয়ে যায় অন্ধকারের অতল পথে। তাদের দিয়ে যা খুশি অন্যায় করায়, অত্যাচার করায়, লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে কিনে নেয় তাদের ভিতরকার বিবেক বুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব। নিষ্কাসিত করে ফেলে তাদের মধ্যেকার সমস্ত শুভবোধকে।

মানুষই মানুষের উত্তরণের অন্তরায়।

একথা অবশ্য বলা যায় না যে, এযাবৎকালের পৃথিবীতে এতাবৎকাল তাবৎ মানুষই মহদাশয় ছিল। শুধু আজকের যুগই মন্দ। তা অবশ্য নয়, চিরকালই—সবযুগেই কিছু নষ্ট-ভ্রষ্ট মানুষ ক্ষমতার মত্ততায় অহঙ্কারের উগ্রতায় অনাচার করে, যথেচ্ছাচার করে, 'সত্য'কে মলিন করে, সভ্যতাকে ধ্বংস করে, শুভকে গ্রাস করে।

বলবানরা চিরকালই দুর্বলের ওপর প্রভুত্ব করে, তাদের শোষণ করে, বঞ্চনা করে, তাদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখে আপন আরাম আয়েসের বাসনা চরিতার্থ করে। আপন খেয়ালে নিরীহ শান্তিপ্রিয় দেশের ওপর যুদ্ধ চাপায়। অসহায় জনগণকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে যুদ্ধে পাঠায়। যখনই রাজশক্তি অশুভশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে, তখনই পৃথিবীতে নেমে আসে চরম দুর্দিন। এ দুর্দিন পৃথিবীতে বারেবারেই এসেছে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এমন কোন যুগ ছিল না, যে যুগে সব মানুষই মহৎ ছিল।

চিরকালীন পৃথিবীতে ভূমি, স্বর্ণ আর নারী এই তিন বস্তু ইতর আর লোভী মানুষের লোভের বস্তু। চিরকালই অসৎ অন্যায়কারী তার লোভের হাতকে বাড়িয়ে দিয়েছে, যেনতেনভাবে তার কাম্য বস্তুটিকে আহরণ করতে। এবং আজও তার ব্যতিক্রম নেই। এসবের কোন কিছুই বোধ হয় নতুন নয়।

তাহলে? তাহলে আজকের পৃথিবীর কেন বিশেষ করে এই যুগের জন্য উদ্বেগ?

প্রশ্নটি এইখানেই।

চিরকালের পৃথিবীতে সমাজে ঐ সবই চলে এসেছে। রাজশক্তির সঙ্গে অশুভশক্তির যোগাযোগ ঘটায় সমাজে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। তবু এও ঠিক, তার মধ্যে থেকেই সাধারণ মানুষেরা, বৃত্তিজীবী নিরীহ মানুষেরা, খেটে-খাওয়া মানুষেরা, দীনদরিদ্র মানুষেরা, আদিবাসী

উপজাতি তথাকথিত অনুন্নত গোষ্ঠী সব মিলিয়ে বিশাল এক মানবসমাজ, তাদের উত্থান-পতনহীন নিস্তরঙ্গ নিরুত্তাপ জীবনের মধ্য দিয়েই 'মনুষ্যত্বে'র চিরন্তন ধারাটি বহন করে চলে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে এসেছে।... তাদের সহজাত সততা, সত্যবোধ, সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস আর সে-সম্পর্কে মূল্যবোধ তাদেরকে একটি কেন্দ্রভূমিতে স্থিরভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে। আজকের যুগের হিসাবে অবশ্যই এরা নির্বোধ, অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাই তারা চিরকাল অদৃশ্য একটি 'পাপপুণ্যের দাঁড়ি-পাল্লায় আপন কর্মভারকে চাপিয়েছে আর ইহকাল-পরকালের প্রাপ্তির ওজন কষে কষে, জীবনকে সহনীয় সীমায় রেখে বহন করে এসেছে। সেই সব অজ্ঞ নিরক্ষর অতিসাধারণ মানুষেরাও কখনো কখনো জীবন-দর্শনের গভীর তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়েছে। অসংখ্য উত্থান-পতনের মধ্যে, তাদের যেমন উত্থান ঘটেনি, তেমনি পতনও ঘটেনি। এই সাধারণেরাই সমাজজীবনের পায়ের তলার মাটি, মাথার উপরকার ছাদ। এরাই সমাজের মেরুদণ্ড।

আজকের যুগের ধারা এসেছে সেই সাধারণ মানুষদের মধ্যে থেকে। ওরা যেন তাদের কেন্দ্রভূমি থেকে স্খলিত হয়ে পড়ছে, বিচ্যুত হয়ে পড়েছে তার চিরকালের পরিচিত জগৎ থেকে। কারণ ক্ষমতাবানদের হঠাৎ নজরে পড়ে গিয়েছিল—এরা একটা মস্ত হাতিয়ার। এই হাতিয়ার দিয়ে তাদের ক্ষমতার আসন শক্ত রাখতে হবে। অতএব সেইসব সাধারণদের টেনে নিয়ে এসেছে তাদের চিরন্তন বিশ্বাসের জগৎ থেকে, সততার জগৎ থেকে, নিজস্ব ধর্মবোধের (এযুগে অবশ্য যা অর্থহীন অলীক) জগৎ থেকে। বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসছে আপন কুটিল প্রয়োজন সাধনের জটিল পথে। আজ তাই সেই চিরকালের 'সাধারণ-জন' যারা এযাবৎকাল আপন সত্তাটিকে অটুট রেখে টিকে থেকেছে, তারা আজ সেই সত্তা বিসর্জন দিয়ে হয়ে পড়েছে অপরের হাতের ক্রীড়নক। আজ তারা পর্যন্ত এক লোভের শিকার।

লোভের হাতছানিতে তারা তাদের আলোর জগৎ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমশঃই এক অন্ধকার পথের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই অন্ধকারের জীবেরা আজ হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর অচেনা। এরা আমাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর অসহায়তার জনক। আজ সেই চিরকালের সরল সাধারণেরাই যেন হয়ে উঠেছে সবথেকে প্যাঁচালো। আজ আর আমাদের 'বিশ্বাস' রাখবার কোন ঠাঁই নেই।

হ্যাঁ, এটাই আজকের যুগের পরম সমস্যা। আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। কেউ কাউকে আপন ভাবতে পারি না, কেউ কাউকে ভালবাসতে পারি না। বলদৃপ্ত ক্ষমতা-বানেরা চিরদিনই অসহায়-জনকে তাদের অসহায়-তার সুযোগ নিয়ে বঞ্চিত করেছে, শোষণ করেছে, ভাঙিয়ে খেয়েছে। কিন্তু আজকের যুগ তাদের 'ভেঙ্গে চুরমার' করে ফেলেছে। তাদের বিবেককে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাদের আত্মাকে চিনে ফেলছে। এর থেকে বড় শোষণ আর কি আছে? এর থেকে নিঃস্ব করে ফেলবার পদ্ধতি আর কি আছে? অথচ আজকের সমাজে প্রতিনিয়তই এই শোষণের দৃষ্টান্ত দেখে চলতে হচ্ছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মানবসমাজে অনেক ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনে। তবু কোন এক সময় সে ক্ষয়ক্ষতির পূরণ হবার আশা থাকে। কিন্তু সমাজের মানুষ নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে পড়লে, সে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপই বা কোথায়? পূরণেরই বা আশা কোথায়? অথচ এই ক্ষয় বোধহয় আর রোধ করা যাচ্ছে না। কারণ ক্ষমতায় নেশাগ্রস্ত অন্ধজনেরা আপাতটুকুই দেখতে পাচ্ছে। আপাতের ওপারটা দেখতে পাচ্ছে না। অথবা দেখেও দেখছে না। আজকের বিজ্ঞানে বলদৃপ্ত মানুষ যেমন পৃথিবীর বুকের সঞ্চিত সম্পদকে ধ্বংস করে ফেলতে দ্বিধা করছে না, তেমনি বিবেকের দংশনও অনুভব করছে না। এই অজ্ঞান-দৃপ্ত মানুষেরাও নির্বিকারত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

এখন আমাদের সমাজজীবনের অবস্থা এই—সমস্ত মানুষই সাহস হারিয়ে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হতে বসেছে। আজকের মানুষের আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস নেই, সত্য বলবার সাহস নেই। চোখের সামনে খুন হতে দেখলে

বাধা দিতে যাবার সাহস নেই, চোখের সামনে নারীর লাঞ্ছনা দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিকারের চেষ্টায় সাহস নেই। আজকের সমাজ যেকোন অন্যায় অনাচার দেখেও বলতে বাধ্য হয়—'দেখিনি', শুনেও বলতে বাধ্য হয়—'শুনিনি', বুঝেও বলতে বাধ্য হয়—'বুঝিনি'।

কারণ সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। অথচ এই সেদিনও এমন অবস্থা ছিল না। পরশাসিত ভারতবর্ষেও অত্যাচারী শাসকের আসনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে সামান্য অসহায় মানুষটিও। 'ভয়' নামক ভয়ঙ্কর প্রাণীটা তাদেরকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে গ্রাস করতে পারেনি। কিন্তু আজকের স্বাধীন দেশের মানুষেরা কী অদ্ভুত এক ভয়ের শিকার হয়ে বসে আছে! অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে আজ দেশবাসী যেন জড়পদার্থে পরিণত। স্বাধীনতা কি তাদের এই মহার্ঘ বস্তুটি উপহার দিল? কেড়ে নিলো তাদের বিবেক-বিশ্বাসের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ন্যায়-অন্যায় বোধের পরিমাপের স্বাধীনতা?

দৈহিক অর্থে 'ক্রীতদাস' প্রথার বিরুদ্ধে কত সংগ্রাম, কত সাধনা হয়েছে। সেই অমানবিক প্রথার অবসানও ঘটেছে। কিন্তু অন্য রাস্তা ঘুরে আর এক ক্রীতদাস-প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। লোভের জাল ফেলে ফেলে সেই সব সৎ সরল সাধারণ মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলা হচ্ছে।

তাদের বিচার-বিবেচনা, মানবিকতা-বোধ আর সর্বোপরি তাদের মনুষ্যত্বটুকুও কিনে নেওয়া হচ্ছে, আপাত কিছুর বিনিময়ে।

আজকের চিন্তা-ভাবনা এই নিয়েই।

কে এই অধঃপতিত যুগে আবার মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনতে পারবে? কোথায় সেই পরিত্রাতা?

মনুষ্যত্ব হারানো মানুষ, ভালবাসবার ক্ষমতা হারানো মানুষ, বিশ্বাস হারানো মানুষকে নিয়ে যুগের জয়যাত্রা কতদিন অব্যাহত থাকবে?

এ প্রশ্ন কি সৃষ্টিকর্তার কাছেই করার নয়?

অবশ্য এ পৃথিবীতে অনেক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে। সেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলেছে রাজ্য নিয়ে হানাহানি, কাড়াকাড়ি। তবু বলব, আজকের দুর্দিন আরও বেশি ভাবনার।

কারণ আজ সেই মানুষেরা ধ্বংস হতে বসেছে—চিরকাল যারা সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে এসেছে। যারা সমাজের পায়ের তলার মাটি, মাথার উপরকার আকাশ, যারা সমাজের মেরুদণ্ড।

আর এক ভাবনা—আজকের নারীসমাজকে নিয়ে, হ্যাঁ, সেও এক পরম সমস্যা। কারণ দীর্ঘদিনের অন্ধকারের অবরোধ ভেঙে আজ নারীসমাজ বাইরের জগতে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্যই তার বন্ধনদশাগ্রস্ত অবস্থা ঘুচেছে। আপাত দৃষ্টিতে সে যে মুক্ত-জীবনের স্বাদই বহন করছে বলে মনে হয়। তবু সেই নারীসমাজ—মুক্তি আন্দোলনে সোচ্চার নারীসমাজও যেন আজ পথভ্রান্ত দিশেহারা। আজও সে বুঝে উঠতে পারছে না নিজে ঠিক কোনখানে উপস্থিত হবে? কোন পথটি তার শ্রেয়?

সে কি পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেই চলবে? না কি নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার সাধনা করবে? সে কি আজকের আধুনিক জীবনের নিরঙ্কুশ স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে, নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলবে? নাকি শ্রেয়ের সন্ধানে অতীতের দিকে ফিরে তাকাবে?

বহুটানের মধ্যে আজকের নারীসমাজ (অর্থাৎ সচেতন নারীসমাজ, যার অধিকাংশই আজও যে তিমিরে সেই তিমিরেই।) যেন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়িয়ে। একটি স্থির লক্ষ্যের পথ ধরে এগিয়ে যাবার প্রেরণা তারা পাচ্ছে না।

বলতে গেলে সে অনেক কথা। তবে আজকের নারীসমাজকে দেখলে, এবং তাঁদের অভিমত-সমূহ দেখলেই বোঝা যায়, তাঁরা এখনো দিশাহারা। আজকের সমাজ এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়ে আছে।

এই সঙ্কট—অবক্ষয় থেকে নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই কি? আজকের সমাজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে বিবর্তনের মাধ্যমে কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই অপেক্ষা করে আছি বিবেকানন্দের মতো যুগপুরুষের আবির্ভাবের।

'বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার : ১৯৯০' প্রদান উপলক্ষে 'উদ্বোধন'-কে প্রদত্ত মানপত্রটি নিচে পাঠকদের সুবিধার্থে পাঠোদ্ধার করে দেওয়া হলো।

ইণ্ডিয়ান এপিক কালচার সেণ্টার

১৬৭/২২ সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫০

বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার : ১৯৯০

॥ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মাসিক মুখপত্র 'উদ্বোধন'-কে অর্পিত বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥



ভারতীয় জাগরণের প্রেরণাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের শঙ্খধ্বনি—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। ওঠো, জাগো"! সেই বাণীর উদাত্ত ঘোষণার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন 'উদ্বোধন' পত্রিকা। জাতীয় জাগরণের বার্তাবহ 'উদ্বোধন'-কে নমস্কার করি।

'উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনায় স্বামীজী বলেছিলেন—দ্বার খুলে দাও। বিশ্বের সকল দিক থেকে আলোক আসুক। আর বলেছিলেন—তুলে ধরো আমাদের পিতৃধন—ভারতের যুগ-যুগ-সঞ্চিত জ্ঞানরাশিকে। 'উদ্বোধন' স্বামীজীর অমোঘ ইচ্ছায় এনেছে আত্মবোধের বাণী, আত্মবিস্তারের বাণী এবং সর্বাঙ্গীণ মুক্তির বাণী। মুক্তিদূত 'উদ্বোধন'-কে নমস্কার করি।

বাঙলাভাষা ও সাহিত্যে নতুন গতিবেগ সঞ্চারকারী স্বামী বিবেকানন্দের বাঙলা রচনার আধার—'উদ্বোধন' পত্রিকা। 'বিলাত-যাত্রীর পত্র' বা 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি স্বামীজীর বাঙলা রচনাগুলি 'উদ্বোধন'-এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ জীবনী ও তাঁর ভাষ্য স্বামী সারদানন্দ-কৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' 'উদ্বোধন'-এই প্রকাশিত হয়েছে। 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যরূপে স্বীকৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' নামক অমর গ্রন্থের অনেকখানি অংশ; নিখিল মাতৃত্বের বিগ্রহ শ্রীমা সারদাদেবীর কথা ও জীবন কথা; সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যগণের জীবনী ও স্মৃতিকথা। 'উদ্বোধন'-এ লিখেছেন—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, যদুনাথ সরকার, এস. ওয়াজেদ আলি, দিলীপকুমার রায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সেকাল ও একালের স্বনামধন্য মনীষিবৃন্দ। মহাজীবনের রত্নাগার 'উদ্বোধন'-কে নমস্কার করি।

শুধু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচারেই 'উদ্বোধন' সীমাবদ্ধ থাকেনি। তার প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, শিল্প, সাহিত্য সহ মানবজীবনের নানা প্রকাশকে 'উদ্বোধন' ধারণ করেছে এবং বিগত একানব্বই বছর ধরে বাঙালীর জ্ঞানভাণ্ডারকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মুখপত্র হয়েও 'উদ্বোধন' তার প্রবর্তকের ইচ্ছানুসারেই নিছক ধর্মীয় পত্রিকা হয়ে উঠেনি কখনও। তবে 'উদ্বোধন' অবশ্যই প্রকাশ করেছে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুগভীর দিকগুলিকে এবং চিরন্তন ভারতবর্ষকে যুক্ত করেছে একালের ভারতবর্ষের সঙ্গে। 'উদ্বোধন' প্রাচীন ও নবীন ভারতবর্ষের সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে। জীবন-সত্যের উন্মোচক 'উদ্বোধন'-কে নমস্কার করি।

কঠিন বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে 'উদ্বোধন'-এর সূচনা। তার প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। অতঃপর তাকে লালন করেছেন স্বামী সারদানন্দ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ। এঁদের সাধনায় 'উদ্বোধন' উত্তরোত্তর উন্নতিমুখী। অব্যাহতভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাময়িক পত্রিকা 'উদ্বোধন'। 'উদ্বোধন'-এর অতীত ও বর্তমানের সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও পরিচালকবর্গকে নমস্কার করি।

'উদ্বোধন' পত্রিকামাত্র নয়—তা বিবেকচৈতন্য-যজ্ঞে অরণিকাষ্ঠ। বিবেক-যজ্ঞ চিরন্তন। 'উদ্বোধন'-ও চিরন্তনের নিত্য উচ্চারণ। 'উদ্বোধন' রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির বাণীশরীর। রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ এবং ভারতবর্ষ চিরন্তনেরই নামভেদ। 'উদ্বোধন'-ও সেই অর্থে চিরন্তনের সঙ্গে সংযুক্ত। সুতরাং 'উদ্বোধন'-এর ললাটে বহু শতাব্দীর আয়ুষ্কাল। চিরন্তনের অপর নাম 'উদ্বোধন'-কে নমস্কার করি।

কলকাতার ত্রিশত-বার্ষিকী পূর্তির প্রাক্-লগ্নে আদি কলকাতার অন্যতম অঙ্গে স্থাপিত 'উদ্বোধন' এবং তার প্রতিষ্ঠাতা আদি-কলকাতার অপর এক অঙ্গের জাতক কলকাতার "সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান" স্বামী বিবেকানন্দ-কে নমস্কার করি।

ইণ্ডিয়ান এপিক কালচার সেণ্টার-এর পক্ষে 'উদ্বোধন'-কে অর্পিত এই 'বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার ঃ ১৯৯০' বস্তুতপক্ষে বিবেকানন্দ নামক নিত্য-সত্যকে আমাদের ভক্তিনত হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন। আমরা ধন্য। জয়তু 'উদ্বোধন'। জয়তু স্বামী বিবেকানন্দ।

৪ঠা জুলাই ১৯৯০

বিশ্বনাথ দত্ত

প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক

ইণ্ডিয়ান এপিক কালচার সেণ্টার

প্রবন্ধ

হরিলীলায় যেন ভেলকি লেগে যায়

স্বামী প্রভানন্দ

আকর্ষণ-বিকর্ষণ নিয়ে বিশ্ববৈরাজের খেলা। জড় পদার্থের মধ্যে একটি ভর অপর একটি ভরকে আকর্ষণ করছে। আবার চেতন মানুষ একে অপরকে আকর্ষণ করছে। পার্থক্য এইটুকু যে, মানুষের পরস্পরের আকর্ষণের পিছনে রয়েছে একটা প্রিয়ত্ব-বোধ, উপাদেয়ত্বের ধারণা। উপনিষদের ঋষি এর রহস্যভেদ করে বলেছেন ঃ "আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।" অর্থাৎ সবকিছুর অস্তিত্ব যার ওপর নির্ভর করে সেই আত্মার জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় বলে বোধ হয়। প্রিয়ত্ববোধ ও তজ্জনিত আকর্ষণ তীব্র-রূপে দেখা দেয় যখন সচ্চিদানন্দ ভগবান মানুষের বেশে মানুষের মাঝে অবতীর্ণ হন। বাউলের দলের মতো পরিকরদের নিয়ে তিনি হাজির হন, নাচগান করে মাতিয়ে নাচিয়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যান। ভক্তিশাস্ত্র বলেন, এ হচ্ছে ভগবানের লীলা-বিলাস। যোগমায়ার সাহায্যে এ-লীলাবিলাস। মায়া ও যোগমায়া উভয়েরই অচিন্ত্য আকর্ষণী মোহিনীশক্তি আছে। ভগবদ্বহির্মুখদের মুগ্ধ করে মায়া, ভগবদুন্মুখদের মুগ্ধ করে যোগমায়া। বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলা হয়েছে ঃ "যোগমায়া পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তিঃ।"[১] যোগমায়া চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি। এর দ্বারা মানুষ ঈশ্বরাভিমুখী হয়। ভগবানের কোনপ্রকার নিজ প্রয়োজন না থাকলেও তিনি কেবলমাত্র আনন্দোচ্ছ্বাসবশতই বিবিধ লীলা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে স্বরূপানন্দ বিতরণই তাঁর আনন্দাস্বাদন।

ইদানীং রামকৃষ্ণবপু আশ্রয় করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বর। সময় বেছে নিয়েছিলেন ভারতে ইংরেজ-শাসনের মধ্যাহ্নকাল। স্থান—ব্রিটিশ ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে উত্তরপশ্চিমে ১০০ কিলোমিটার দূরের একটি গ্রাম। পশ্চিম বাংলার চারটি জেলা—হুগলি, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের প্রায় মিলনবিন্দুতে এই গ্রাম। শৈশব কৈশোর ঐ গ্রামে অতিবাহিত করে তাঁর জীবনের প্রায় দুইতৃতীয়াংশ অতিবাহিত করেছিলেন কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে। প্রস্ফুটিত পদ্মের রূপ গন্ধ যেমন ছোট বড় সকল মধুপকে আকর্ষণ করে, তেমনি অবতার-পুরুষের দিব্য লীলাবিলাস সকল শ্রেণীর মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। মাধুর্যমণ্ডিত সে-আকর্ষণ।

অবতার-পুরুষের লীলাবিলাসের তাৎপর্য অবধারণ করতে হলে যে পরিপ্রেক্ষিতে তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। শক-হুন-পাঠান-মোগলের উৎপীড়নের পর ভারতবর্ষ সে-সময়ে ইংরেজের দখলে। লোভী বিদেশী শক্তির নিয়ত শোষণে দেশের সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যে, মহামারিতে, অশিক্ষায় পর্যুদস্ত। পাশ্চাত্য ভাবের প্লাবনে দেশের নতুন-শিক্ষিতদের মধ্যে সনাতন মূল্যবোধগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। দেখা গেল, জনমানস থেকে ধর্মবিশ্বাস উপড়ে ফেলতে একদল সচেষ্ট, অপর একদল সংস্কারপন্থী নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করতে আগ্রহী। অবশ্য এ-ধরনের বৈপ্লবিক ভাবোচ্ছ্বাস গ্রাম-ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। পশ্চিমবাংলার যে গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবিলাসের সাক্ষ্য বহন করছে, সেখানকার লোকসংখ্যার বিরাট এক অংশ আদিম উপজাতি ও হিন্দু সমাজভুক্ত তপসিলী সম্প্রদায়। সে-অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রাণধারা শুকিয়ে গিয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে। পাল রাজ-বংশ আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করলেও তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে দেশব্যাপী ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান এ-অঞ্চলকেও প্রভাবিত করেছিল। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভবের পূর্বে প্রাচীন হিন্দুগণ শিব, শক্তি ও বিষ্ণুর (বাসুদেব) আরাধনা করত। এ-সময়ের মধ্যে সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে তন্ত্রাচারের বিকাশ ঘটেছিল রাঢ়ের সর্বত্র। এর প্রসারে সাহায্য করেছিল লৌকিক ধর্ম। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে অনড়-প্রায় ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হলো। শ্রীচৈতন্যের সমকালীন নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, উধারণ দত্ত, কমলাকর পিপলাই প্রমুখদের ভূমিকা

১ ভাগবতের ১০।২৯।১ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা।

গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু আলোচ্য অঞ্চলে নতুন ভক্তিধর্মের বিজয়কেতন উড়িয়েছিলেন শ্রীনিবাস ও নরোত্তম। শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষিত হয়ে বিষ্ণুপুরের অত্যাচারী রাজা বীর হাম্বিরের বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। এ-পরিবর্তনের সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর রচিত একটি গানের শেষাংশ, "এ-বীর হাম্বির হিয়া/ব্রজপুর সদা ধাঁয়া/যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে।"[২] এই রাজপরিবারের আনুকূল্যে ধর্মে সাহিত্যে শিল্পে স্থাপত্যে নবজাগরণ উপস্থিত হয়েছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে বিবিধ বিবর্তন ঘটেছিল। সেই বিবর্তনের অন্যতম হলো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বাসুদেবের পরিবর্তন—মোহন বাঁশরী হাতে কালোসোনা, ননী-চোরা, শ্যাম রায় ইত্যাদি রূপে। তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন হ্লাদিনী শক্তির মূর্তিমতী প্রকাশ রাধিকা। কৃষ্ণ ও রাধার একাত্ম-মূর্তি শ্রীচৈতন্য প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন। এই প্রেম সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন: "কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে প্রেম অভিধান।"[৩] গোবাঙ্গলীলাবিলাসে ভক্তি মৈত্রী প্রেমের ছড়াছড়ি।

একথা অনস্বীকার্য যে, আর্য ও অনার্য এই দুই বিপরীতধর্মী কৃষ্টির সংঘাত ও সমন্বয় কালের সোপান বেয়ে নেমে এসে এ-অঞ্চলের মানুষের জীবনে এনেছিল বহুবিধ পরিবর্তন। ধর্মঠাকুর, মনসা, পশুপতি (শিব), শীতলা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অপরপক্ষে আদিম উপজাতিগণ হিন্দুধর্মের প্রধান ভাবগুলি বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।[৪] এ-সকল বিবর্তন ছাড়াও সাধারণের দৃষ্টির প্রায় অগোচরে জনজীবনের অন্তরালে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছিল মরমিয়া সাধনার ধারা। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিব্যা এই ধারার প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল আলোচ গ্রামাঞ্চলেও। এ-ধারা সম্বন্ধে ডঃ শশিভূষণ দাশ গুপ্তের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন: "Side by side with the commonly known theological speculation and religious practices there has beei flowing in India an important religiou undercurrent of esoteric yogic practices ·· when associated with the speculation of Bengal Vaisnavism the same esoteri practices have been responsible for the growth of the esoteric Vaisnavite cult known as the Vaisnava Sahajiya movement."[৫] শ্রীচৈতন্যোত্তর জাগরণের জোয়ার জনমানসে দৃঢ় শিকড়বদ্ধ মত ও বিশ্বাসকে প্রতিহত বা অবদমিত করতে পারেনি। উপরন্তু শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত মত-পথের সঙ্গে এ-ধারার মিথষ্ক্রিয়াতে (interaction) উদ্ভূত হয়েছিল আউল, বাউল,[৬] নেড়া, কর্তাভজা, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায়। অক্ষয়কুমার দত্ত শ্রীচৈতন্য-সূত্রে সম্পর্কিত এ-ধরনের ত্রিশটি শাখা সম্প্রদায়ের বিবরণ দিয়েছেন।[৭] এ-সকল সম্প্রদায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেই গ্রামাঞ্চলে যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাবিলাস করেছিলেন। এদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিবিড় পরিচয়ের প্রমাণ কথামৃতের পাতায় পাতায়। শুধুমাত্র পরিচয় ছাড়াও তিনি এজাতীয় মতপথ নিজের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও উদার ভাবের আলোকে বিচার করেছেন এবং প্রয়োজন মতো সে-সকল মতানুসারী লোকদের কল্যাণের পথে পরিচালিত করেছেন।

২ ভক্তিরত্নাকর—নরহরি চক্রবর্তী, ৭।৬১

৩ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মধ্যলীলা, ২৩ অধ্যায়

৪ "The new life breathed into Bengal Hinduism by Chaitanya's creed, burst forth in another direction. The Vaishnava Gosains set themselves to converting the aboriginal tribes and thus brought a new light into their lives after ages of neglect, contumerly and superstition." (History of Bengal—Jadunath Sarkar, Vol. II, 1948, p. 221-222)

৫ Obscure Religious Cult—Sashibhusan Dasgupta, 1969, Indroduction, pp. 33-34

৬ এক মতানুসারে বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীচৈতন্য। ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী তাঁর 'বাংলার বাউল' গ্রন্থে (১৯৫৪, পৃঃ ৪৮) লিখেছেন, মহাপ্রভুর বহু পূর্বেই বাউলিয়া মত ও বাউলদের নাম পাওয়া যায়।

৭ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত, পাঠভবন সং, ১৩৭৬, পৃঃ ১১০—১৪৯

এদের সাধনপথে তিনটি পর্যায় দেখা যায়ঃ প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধ। এই পর্যায় তিনটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পাঁচটি আশ্রয়, যথা নাম, মন্ত্র, ভাব, প্রেম ও রস। নাম ও মন্ত্র প্রবর্তক পর্যায়, ভাব সাধক পর্যায়, এবং প্রেম ও রস সিদ্ধ পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত।[৮] শ্রীরামকৃষ্ণ দেখতে পেয়েছিলেন এক থাকের লোক যারা 'সহজ' 'সহজ' বলে চিৎকার করে। সহজাবস্থার দুটি লক্ষণ। প্রথম 'কৃষ্ণগন্ধ' গায়ে থাকবে না অর্থাৎ ঈশ্বরের সমস্ত ভাব অন্তরে, বাইরে কোন চিহ্ন থাকবে না; হরিনাম পর্যন্ত মুখে থাকবে না। দ্বিতীয় লক্ষণ, পদ্মের ওপর অলি বসবে, কিন্তু মধু পান করবে না। অর্থাৎ নারীসঙ্গ হবে, কিন্তু নারীতে আসক্তি থাকবে না, জিতেন্দ্রিয় হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "ওরা ঠাকুরপুজো, প্রতিমা-পুজো—এসব like করে না, জীবন্ত মানুষ চায়। তাইতো ওদের এক থাকের লোককে বলে কর্তাভজা, অর্থাৎ কর্তাকে গুরুকে ঈশ্বরবোধে ভজনা করে—পুজো করে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেছেন ঃ "ওরা অনেকে রাধাতন্ত্রের মতে চলে। পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধন করে —পৃথিবীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশ-তত্ত্ব—মল, মূত্র, রজ, বীজ—এই সব তত্ত্ব। এসব সাধন বড় নোংরা সাধন; যেমন পায়খানার ভিতর দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকা।"

এ-সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন অনাচার ও কদাচার। এরূপ একটি চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে কথামৃতে। ঠাকুর তখন শিহড়ে হৃদয়ের বাড়িতে। সেখানে ছিলেন প্রতাপ হাজরা। একদিন উপস্থিত হয় এক বৈষ্ণব। সে বসতেই ঠাকুর তার দিকে পিছন ফিরে বসলেন। ঠাকুরের এরূপ আচরণ দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়। অনুসন্ধানে জানা গেল বৈষ্ণবটি নষ্ট চরিত্রের। তার মাসির সঙ্গে ছিল তার অনৈতিক সম্পর্ক।

আবার এ-সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নত সাধক-সাধিকাও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এরূপ দুজনের উল্লেখ পাই কথামৃতে। একজন সদয় বাবাজী, ভাল সঙ্কীর্তন করতেন। দ্বিতীয় সরী বা সরস্বতী পাথর। ইনি সম্ভবতঃ শিহড়ে বাস করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিচয়ন করে বলেছেন ঃ "এ মতের লোক পরস্পরের বাড়িতে খায়। কিন্তু অন্য মতের লোকের বাড়িতে খাবে না। মল্লিকরা সরী পাথরের বাড়িতে গিয়ে খেলে তবু হৃদের বাড়িতে খেলে না। বলে, ওরা জীব। আমি একদিন তার বাড়িতে হৃদের সঙ্গে বেড়াতে গিছলাম। বেশ তুলসী বন করেছে। কড়াই মুড়ি দিলে, দুটি খেলুম। হৃদে অনেক খেয়ে ফেললে—তারপর অসুখ।"

উপরি উক্ত পরিমণ্ডলে শুভ বসন্তের এক ব্রাহ্ম-মুহূর্তে শিশু রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছিল। কৈশোরে ভাবাবস্থায় তিনি দর্শনলাভ করেছিলেন দেবী বিশালাক্ষীর। তাঁর মুখের কথা ঃ "সেইদিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলাম।" তাঁর দৃষ্টি অন্তর্মুখীন হয়ে উঠেছিল। মন মাঝে মাঝেই তলিয়ে যেত ভাবের গভীরে। দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে তাঁর অন্তরাত্মা অনুরাগের আবেগে উন্মত্তের মতো ধাবিত হয়েছিল। দেখা দিয়েছিল অভূতপূর্ব প্রেমোন্মাদনা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আনন্দময়ী জগন্মাতা চৈতন্যস্বরূপা। অতঃপর তিনি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসরণ করে সাধন করেন। পুরাণমতে, তন্ত্রমতে, বেদমতে সাধন করেন। বহির্দেশীয় ইসলাম-মতে সাধন করেন। খ্রীস্টমতেও করেন। প্রত্যেকটি মতপথ অনুসরণ করে সেই-সেই পথের শীর্ষ-বিন্দুতে আরোহণ করেন। সাধন-শোধনাদির শেষে তিনি ভাবমুখের শিখরে উত্তীর্ণ হন। এই অগ্রগতি পর্যন্ত বলা যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি নরলীলা করেছিলেন। আনন্দোচ্ছ্বাসের বেগে স্বরূপানন্দ বিতরণ করেছিলেন ভক্তগণের মধ্যে। ভক্তগণের অনুরক্তি প্রেমানন্দ-রসা-স্বাদনে। তিনি নিজমুখে বলেন ঃ "মনুষ্যলীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়, এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন।" এই পর্যায়ে তিনি হাসেন, কাঁদেন, নাচেন, গান করেন, হরিকথা বলেন, অপরের জন্য ভাবেন, তাদের দুঃখে কাঁদেন। পাপী-তাপীদের তারণ করেন। সর্বোপরি তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শুধু প্রেম বিতরণ করেন। শ্রীচৈতন্যরসসিক্ত বঙ্গদেশে স্বভাবতই তাঁকে দেখে

৮ Obscure Religious Cult—Sashibhusan Dasgupta, p. 141

মনে হয়েছিল শ্রীগৌরাঙ্গের পুনরাবির্ভাব। ভক্তগণের মনে পড়েছিল শ্রীচৈতন্যভাগবতে উদ্ধৃত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিশ্রুতি: "পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।/ কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার।" এ-পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে তাঁর মধ্যে দেখা গেছে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবাবেশ। মনে হয়েছে তিনি যেন শ্রীগৌরাঙ্গের সম্প্রসারিত রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নবগৌরাঙ্গ। তাঁকে কেন্দ্র করে উত্থিত হয়েছিল হরিরস ভাবতরঙ্গ। হরিনামের উদ্দাম উন্মত্ততা। রসিক মাত্রেই অনুভব করেছেন হরিলীলার তীব্র আকর্ষণ।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে করভাজনের মুখে শুনতে পাই সঙ্কীর্তনরূপ যজ্ঞ[৯] সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী। তারই বাস্তবায়ন ঘটেছিল শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্তিত সংকীর্তনের মধ্যে। পূর্বে কেউ জানত না সঙ্কীর্তন কিরূপ। চৈতন্যভাগবত বলেছেন: "শিষ্যগণ বলেন 'কেমন সঙ্কীর্তন'।/আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥" তিনি চালু করেন তরঙ্গতুফান-ময় সঙ্কীর্তন। হাজার হাজার মানুষ একভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এক গানের এক তানে সৃষ্টি করে ভগবৎ ভজনতরঙ্গ। তরঙ্গশীর্ষে প্রেমদ্রুতচিত্ত গদগদ-ভাষী শ্রীগৌরাঙ্গ কাঁদেন, হাসেন, কখনো বা কীর্তন করেন বা নৃত্য করেন। প্রেমভক্তির আকর্ষণে জনসমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে, জনতা যেন ভাবের ঘোরে ভেসে চলে। এই সঙ্কীর্তনলীলার পুনরাভিনয় করলেন নবগৌরাঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ। করলেন দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে, কলকাতার হরিসভায়, পেনেটির শ্রীপাটে; মাহেশের রথের সম্মুখে, বাঁকুড়া-হুগলির প্রত্যন্ত কয়েকটি গ্রামে। প্রত্যক্ষদর্শী রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন: "পরমহংসদেবের নৃত্য ও সঙ্কীর্তনের ভাব এক চৈতন্যদেব ব্যতীত আর কাহারও সহিত তুলিত হইতে পারে না।"[১০] রথযাত্রা উপলক্ষে বলরাম ভবনে সঙ্কীর্তনে মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের মনে হয়েছে: "সাক্ষাৎ নারায়ণ বুঝি দেহ-ধারণ করিয়া ভক্তের জন্য আসিয়াছেন।"[১১] মাহেশে রথের সম্মুখে ভাবে প্রমত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে অক্ষয়-কুমার সেনের মনে হয়েছে: "আপনে আপন হারা জগৎ গোঁসাই।"[১২] নৃত্যরত ঠাকুরকে দেখে গিরিশ-চন্দ্র ঘোষের মনে হয়েছে "ভাব-প্রভাবে পৃথিবী টলটলায়মানা! কেবল নদে টলমল করিতেছে না, সমস্তই টলটলায়মানা। যে সে-নাচ দেখিয়াছে, তৎসময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।"[১৩] বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী হরিলীলায় রত শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাবমূর্তিটি অঙ্কিত করেছেন তা ভাববৈচিত্র্যে আকর্ষণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঁকুড়া ও হুগলির সীমান্তে কয়েকটি গ্রামে তিনি তাঁর যে সম্মোহিনী রূপটি উন্মোচিত করেছিলেন তা অতুলনীয়। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ হরিলীলার যে প্রচণ্ড আকর্ষণী ও সম্মোহিনী শক্তি তার public demonstration দিয়েছিলেন।

ঈশ্বরাবতারের নরলীলা ছায়াতপে ঘেরা। যোগমায়া আশ্রয় করে যে ভগবানের নরলীলা সে-যোগমায়ার মধ্যে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ উন্মুখমোহন, বিমুখমোহন এবং আত্মমোহন ত্রিবিধ কার্য লক্ষ্য করেছেন।[১৪] এই আত্মমোহনের দ্বারা অবতার-পুরুষ নিজে মোহিত হয়ে লীলা সম্পাদন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে।" সে-কারণে নরলীলা অনেকাংশে দুর্বোধ্য, রহস্যঘন ও আকর্ষণীয়। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ভাইপো অক্ষয়ের মৃত্যু ঠাকুরের হৃদয়ে তীব্র আঘাত হেনেছিল। তাঁর প্রাণের ভিতরটা গামছা নিংড়ানোর মতো নিংড়াতে থাকে। অবতার মানুষদেহে শোকতাপদগ্ধ মানুষের মতো ব্যবহার করেন তার শরীর-মনকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্য ভক্ত মথুরমোহন তাঁকে বর্তমান বাংলা-দেশের তালা ও সোনাবেড়ে গ্রামে এবং চূর্ণী নদীর তীরে কলাইঘাটাতে নিয়ে যান। কিছুকাল পরেই ঘটে 'অঘটনঘটন-পটিয়সী' যোগমায়ার একটি খেলা। সাধক বৈষ্ণবচরণের আমন্ত্রণে শ্রীরামকৃষ্ণ গেছিলেন কলুটোলার হরিসভায়। বৈষ্ণবচরণের ভাগবত-পাঠ

৯ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।/ যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ। (ভাগবত, ১১।৫।৩২)

১০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, ৭ম সং, পৃঃ ৬৯

১১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৯৭৯

১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, ১০ম সং, পৃঃ ৫৭৭

১৩ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ১৩৮৯, পৃঃ ১০৯

১৪ শ্রীমদ্ভাগবত—কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত, ৩য় খণ্ড, ১০ম স্কন্ধ, পৃঃ ১৭০৭

শুনতে শুনতে তাঁর ভাবাবেশ হয়। আত্মহারা ঠাকুর ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন 'চৈতন্যাসনের' উপর। শ্রীচৈতন্যের জন্য সংরক্ষিত আসন। শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর সমাধিস্থ নিশ্চল দেহ। শ্রীচৈতন্যের মতো উর্ধ্বোত্তোলিত হস্তে অঙ্গুলিনির্দেশ। মুখে 'দিব্যামৃতবর্ষী হাসি'। ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত উপস্থিত সকলে হরিধ্বনি করে ওঠে, মেতে উঠে নাম-সঙ্কীর্তনে। ক্রমে ঠাকুর নেমে আসেন অর্ধবাহ্য-দশায়, কীর্তনীয়াদের সঙ্গে তিনি উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন। আবার ভাবের আধিক্যে সমাধিতে ডুব দেন। অন্তর্দশায় চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। লীলাসঙ্কীর্তনে মুগ্ধ বৈষ্ণবগণ সুখস্মৃতি নিয়ে ফিরে যান নিজ নিজ ঘরে। কিছুদিনের মধ্যেই ঠাকুরের 'চৈতন্যাসন' অধিকারের যৌক্তিকতা নিয়ে বৈষ্ণবসমাজে তর্ক-বিতর্ক হয়। শীর্ষস্থানীয় নেতা কালনার ভগবানদাস বাবাজী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কটূকাটব্য করেন। ঘটনাক্রমে অনতিকাল পরেই ঠাকুর উপস্থিত হন কালনায় বাবাজীর নামব্রহ্ম আশ্রমে। সাধনভজনে প্রাগ্রসর বাবাজী ঠাকুরের সমাধিস্থ দেহে মহাভাবের স্ফুরণ লক্ষ্য করে বিস্মিত হন। ঠাকুরের তেজপূর্ণ বাণীতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তিনি পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ-যাত্রাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ নবদ্বীপে নদীগর্ভে অধুনালুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলাস্থলে নিতাই ও গৌরের দিব্যমূর্তির দর্শনলাভ করেছিলেন। এ-ধরনের লীলাবিলাসের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মনের গহনের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর একটি উক্তিতে। তিনি বলেছিলেনঃ "আবার কখনও কখনও গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম, দুই ভাবের মিলন —পুরুষ ও প্রকৃতিভাবের মিলন। এ-অবস্থায় সর্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হতো।" শ্রীগৌরাঙ্গের ছিল 'অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃরাধা', পুরুষ ও প্রকৃতিভাব একসঙ্গে গ্রথিত। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে ভাবিত ঠাকুরের এসকল লীলাবিলাসের কাল ১৮৭০-১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ। এ-জাতীয় ছোটখাটো ঘটনা আরও ঘটতে থাকে। অবশেষে প্রায় এক দশক পরে ঠাকুরের দেহমন আশ্রয় করে উপস্থাপিত হয়েছিল হরিলীলার অনুপম এক প্রদর্শন। প্রেম-ভক্তির ঐশ্বর্যে ভরপুর এক প্রদর্শন।

ইতোমধ্যে ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণকে উপস্থাপিত করেছিলেন রাজধানী কলকাতার মানুষের কাছে। তাঁর প্রবর্তিত 'ধর্মতত্ত্ব' (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬) ঘোষণা করেছিলঃ "আমরা নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই জীবন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।" কিছুদিন পরে আবার ঘোষণা করেছিলঃ "শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণে উল্লিখিত হইয়াছে, 'ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্য-লৌকিকাঃ, / নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি-তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।' .. পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এই সকল লক্ষণ সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়।"[১৫] ব্রাহ্মনেতাদের অনেকের মূল্যায়নে তিনি ছিলেন নাইটিন্থ সেঞ্চুরির শ্রীগৌরাঙ্গ। ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। এদিকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশুদ্ধ মনে একটি বাসনার ফুট উঠেছিল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের 'সবজন মোহকর নগরকীর্তন' দেখবেন। একদিন তাঁর ঘরের উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। অকস্মাৎ তাঁর চোখের সামনে যেন একটি পর্দা উঠে গেল। অদ্ভুত এক দৃশ্য! ভাবচোখে নয় সাদাচোখে দেখেন সে-দৃশ্য। দেখেন পঞ্চবটীর দিক থেকে এক মহাসঙ্কীর্তনতরঙ্গ বকুলতলায় বাঁক নিয়ে কালীবাড়ির ফটকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জনসমুদ্র বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এগিয়ে চলেছে। চৈতন্য ভাগবতকারের ভাষায় "কোটি কোটি হরিধ্বনি মহা কোলাহল।/ স্বর্গ মর্তপাতালাদি পূরিল সকল।"[১৬] কিলবিল করছে মানুষ। হাজার হাজার মানুষ। মধ্যখানে গোরাঙ্গ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও অদ্বৈত মহাপ্রভু। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা মহাপ্রভুর ভাবোল্লাসে চতুর্দিক আপ্লাবিত—কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ হরিধ্বনি করছে, কেউ বা উন্মত্তভাবে নৃত্য করছে। ভক্তিপ্রেমের ভাবতরঙ্গে ডুবে-ভেসে-সাঁতরিয়ে এগিয়ে চলেছেন ভক্তগণ। গৌরভাবে বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণ হরিরস সম্ভোগ করেন, হরিলীলার আনন্দাস্বাদন করেন, হরিসঙ্কীর্তনের সম্মোহিনী শক্তি লক্ষ্য করে নিজেই মুগ্ধ হন।

নিজে সুমিষ্ট আম খেয়ে মুখ পুঁছে ফেলার

১৫ ধর্মতত্ত্ব, ১ অক্টোবর, ১৮৭৯

১৬ শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঠ, ২।২৩।৩৮০

ভূমিকা অবতার পুরুষের নয়। তিনি অপরকে আনন্দাস্বাদন করিয়ে দেবার জন্য, সকল মানুষকে চৈতন্যঘন আনন্দস্বরূপ ভগবানের পাদপদ্ম-অভিমুখীন করবার জন্য সদাই ব্যগ্র। খানদানি ভক্তের বিশ্বাস, ভক্তদের ভক্তিপ্রেমের রসাস্বাদন করিয়ে দেবার জন্যই তো শ্রীভগবানের মনুষ্যদেহধারণ। প্রকৃতপক্ষে তিনি যেখানেই যান সেখানেই আনন্দোৎসার ঘটে। হরিলীলার উচ্ছ্বাসে সকলেই অননুভূত আনন্দ আস্বাদন করে, হরিলীলার আকর্ষণ অল্পাবিস্তর অনুভব করে। কিন্তু হরিলীলাবিলাসের থাক থাক রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত হরিলীলাবিলাসের পরম বিস্ফুরণ ঘটেছিল বাঁকুড়া হুগলির প্রত্যন্ত গ্রাম ফুলুই-শ্যামবাজারে। এবং এটি সংঘটনের পূর্বে লীলাকর বেশ কিছু প্রস্তুতি করেছিলেন।

বর্ষাকালে দক্ষিণেশ্বরে পানীয় জল প্রায় অপেয় হয়ে উঠত, কখনো বা প্রাঙ্গণে গঙ্গার জল উঠে ঠাকুরের ঘরটিকে স্যাঁতসেঁতে করে তুলত। সে-সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় বছরই কামারপুকুরে চলে যেতেন। এবং শিহড়ে হৃদয়ের বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে আসতেন। কোতলপুর থানার দক্ষিণদিকে শিহড় একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম। ঠাকুরের পিসতুতো বোন হেমাঙ্গিনীর তৃতীয় পুত্র হৃদয়রাম। বয়সে ঠাকুর অপেক্ষা চার বছরের ছোট। দুজনে একইসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে চাকরিতে যোগদান করেছিলেন। হৃদয়ের বাড়িতে নিত্য 'শ্রীধর' শিলায় পুজো হতো। বাড়ির সামনে ছিল চণ্ডীমণ্ডপ। ঠাকুরের নির্দেশে এই চণ্ডীমণ্ডপে হরিসঙ্কীর্তনের আসর বসত। কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় তখন ছোট ছেলে। হৃদয়ের বাড়ির উত্তরদিকে তাঁর বাড়ি। পরবর্তী কালে তিনি এ-সকল কীর্তনের কাহিনী বলে বেড়াতেন।

শিহড়কে কেন্দ্র করে গৌরাঙ্গভাবে ভাবিত শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু প্রাসঙ্গিক কাহিনী স্মরণ-যোগ্য। তাঁর দক্ষিণেশ্বরে সাধনার প্রথম চার বছরের শেষভাগে তিনি কামারপুকুর গ্রামে এসে বাস করেছিলেন। একদিন পালকিতে চেপে যাচ্ছিলেন শিহড়ে। নীল আকাশ। দুপাশে সবুজ ধানের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। অকস্মাৎ দুটি কিশোর ঠাকুরের দেহ থেকে বেরিয়ে আশেপাশে ছোটাছুটি করতে থাকে, কখনো বা পালকির কাছে এসে হাস্যপরিহাসে মেতে ওঠে। বেশ কিছুক্ষণ আনন্দে বিহার করে তারা ঠাকুরের সত্তায় মিলিয়ে যায়। দেড় বছর পর এ-ঘটনাটি শুনে ভৈরবী ব্রাহ্মণী মন্তব্য করেছিলেন: "বাবা, তুমি ঠিক দেখেছ। এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।"[১৭]

শুধু শিহড়ের পথে কেন কলকাতায় বসে শ্রীরামকৃষ্ণের এ-ধরনের ভাবদর্শনের কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। একদিন শ্যামপুকুরে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ অতি চমৎকার একটি দৃশ্য দেখেন। পরে তিনি বলেন: "এতক্ষণ ভাবাবস্থায় কি দেখছিলাম শোন।—তিন-চার ক্রোশব্যাপী শিওড়ে যাবার রাস্তার মাঠ। সেই মাঠে আমি একাকী।...চতুর্দিকে আনন্দের কুয়াসা!—তারই ভিতর থেকে ১৩।১৪ বছরের একটি ছেলে উঠলো—মুখটি দেখা যাচ্ছে! পূর্ণের রূপ। দুজনেই দিগম্বর। তারপর আনন্দে মাঠে দুইজনে দৌড়াদৌড়ি আর খেলা।"[১৮]

একবার শিহড়ে থাকাকালীন ঠাকুর রাখাল বালকদের খাওয়ান। সে-ঘটনাটি তিনি নিজমুখে বলেছিলেন: "শিওড়ে রাখাল ভোজন করালুম। তাদের হাতে হাতে সব জলপান দিলুম। দেখলুম, সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। তাদের জলপান থেকে আবার খেতে লাগলুম।"[১৯] এই সকল ঘটনাতেই গৌরাঙ্গ-ভাবের প্রচ্ছায়া সুস্পষ্ট।

শিহড়ের দক্ষিণপাড়াতে নফর বাড়ুজ্যের বাড়ি ছিল। নফর ভক্তিমান। "প্রভুতে আছিল তাঁর ইষ্টদেবজ্ঞান।" তাঁর দুই ছেলে দিগম্বর ও হৃদয়। দিগম্বরের সময়ে এই পরিবারের আর্থিক অবস্থার বিপুল উন্নতি হয়। বর্তমান বসতবাটির অট্টালিকা নির্মিত হয়। সাত-আট মহলের জমিদারি থেকে প্রচুর আয় হতো। কুলদেবতা 'শ্রীধর' শিলার নিত্য পুজো এখনো অনুষ্ঠিত হয় একটি ছোট সুন্দর দালানে। নফরের সময়ে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালের চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের ঝড়ে তা পড়ে যায়। সামনেই আটচালার নাটমন্দির। ছাদ ছিল

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৬১—১৬২

১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১০৪৭

১৯ ঐ, পৃঃ ২৩০

খড়ের। ১৩৪৯ সালের ঝড়ের পর টিনের চারচালা তৈরি হয়। চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গাপূজো ও কালীপুজো হতো। নফরের উৎসাহে নাটমন্দিরে অনুষ্ঠিত হতো হরিসংকীর্তন। নফর নিজে একজন দক্ষ কীর্তনীয়া[২০] ছিলেন। এখানকার সংকীর্তনের সমাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ যোগদান করেছেন কয়েকবার।[২১] তার সুখস্মৃতি এই পরিবারের গর্বিত সম্পদ।

ব্রাহ্মণ-প্রধান শিহড়ের মানুষ জানত শ্রীরামকৃষ্ণ নিরক্ষর। পণ্ডিতম্মন্যদের অনেকে তাঁকে সামান্য জ্ঞান করতেন। যেন তাঁদের দৃষ্টি খুলে দেওয়ার জন্যই একটি ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিবৃতির মুখবন্ধ করে পুঁথিকার মন্তব্য করেছেন: "না দেখিলে মানুষেতে ঐশ্বর্য ব্যাপার। / কখনো না হয় হৃদে বিশ্বাস সঞ্চার॥" খানাকুলের কয়েকজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কোন কার্যোপলক্ষে শিহড়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। একদিন তাঁরা ঠাকুরের কাছে এসে শাস্ত্রীয় বিষয় নিয়ে তর্ক জুড়ে দেন। ঠাকুরের ভূমিকা বর্ণনা-প্রসঙ্গে পুঁথিকার লিখেছেন:

"শ্রীপ্রভুর প্রতিবাদ সিংহের বিক্রমে॥
সুগূঢ় যে তত্ত্ব নাহি আইসে ব্যাখ্যায়।
বুঝান শ্রীপ্রভু হেন সরল ভাষায়॥
শত শত সরল উপমা সহকারে।
সুমূর্খ যে শুনে সেও বুঝিবারে পাবে॥"

দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা হার স্বীকার করেন। ঠাকুরের কথা তাঁদের হৃদয়ে গেঁথে যায়। এ-সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমেই ঠাকুরের পূতসঙ্গলাভের জন্য লোকের ভিড় হতে থাকে। পুঁথিকার লিখেছেন: "শিকলে শিকলে যেন পরস্পর টানে। / সেইমত আসে কত প্রভু দরশনে।" কখনো বা হৃদয় উৎসবের আয়োজন করতেন। আমন্ত্রণ করে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদিকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাতেন। হৃদয় আবার সুবিধা মতো আশপাশের গ্রামে হরিকীর্তন সমাবেশে তাঁর মামাকে নিয়ে যেতেন।

পুঁথিকারের তথ্যানুযায়ী মথুরমোহনের জীবিতকালেই ঠাকুর একবার শ্যামবাজারের নটবর গোস্বামীর বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন। মথুরমোহন মারা যান ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জুলাই। প্রকৃত-পক্ষে নটবর বেলটে গ্রামের অধিবাসী। গোস্বামী-প্রবর "প্রভুদেবে পূজিতেন গুরুর মতন।" শিহড়ের দক্ষিণদিকে শ্যামবাজার। শ্যামবাজার থেকে পূর্বদিকের রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়ে বেলটে গ্রামে ঢুকবার আগেই বাম দিকে একটি গলি। গলি ধরে কিছুটা গেলেই ডানদিকে পড়ত নটবর গোস্বামীর বাড়ি।[২২] পাশে ছিল একটি ডোবা। প্রাঙ্গণে ছিল একটি আমগাছ। পশ্চিমে ছিল বসতবাটি। উত্তরে ছিল খামার। পূবে ঠাকুরঘর। সেখানে বিষ্ণুশিলা, বালগোপাল ও শীতলার নিত্য পূজো হতো। প্রতি ভাদ্র ও চৈত্র মাসে দশদিন করে পাণ্ডুগ্রামের শ্যামসুন্দর এ বাড়িতে এসে পূজো ও সেবা গ্রহণ করতেন। কোন এক সময়ে নটবরের বংশধরগণ কসাপাট গ্রামে চলে যান। সেখানে নটবরের প্রপৌত্র অনিল গোস্বামী বর্তমানে নটবর-পূজিত অষ্টধাতুর শ্যামসুন্দরের পূজো-সেবা করে থাকেন। খুব সম্ভবতঃ নটবর ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর শ্যামসুন্দরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নটবরের বাড়ির উত্তরে ও দক্ষিণে যথাক্রমে বাস করতেন শ্যামসুন্দর গোস্বামী ও লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী। লক্ষ্মীনারায়ণ ভাল খোল বাজাতেন।

বেলটে গ্রামের পশ্চিমাংশে ছিল গোস্বামীদের বসবাস। গোস্বামী পাড়ার পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ছিল অনেক তাঁতির ঘর। অনেকেই ছিল বৈষ্ণবমতাবলম্বী। খুব সম্ভবতঃ এই তাঁতিদের সম্বন্ধেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে-ছিলেন। বলেছিলেন: "ওদেশে, শ্যামবাজার এই সব জায়গায়, তাঁতিরা আছে। অনেকে বৈষ্ণব, তাদের লম্বা লম্বা কথা। বলে, 'ইনি কোন বিষ্ণু মানেন? পাতা বিষ্ণু! (অর্থাৎ যিনি পালন করেন!)—ও আমরা ছুঁই না।'...কেউ বলছে, 'তোমরা বুঝিয়ে দেও না, কোন হরি মান।' তাতে কেউ বলছে—

২০ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "উন্মাদ অবস্থা...শ্বশুরবাড়ি গেলুম। সেখানে খুব সংকীর্তন। নফর—দিগম্বর বাড়ুজ্জের বাপ এরা এল। খুব সংকীর্তন।"—কথামৃত, পৃঃ ২০০

২১ নফর বাড়ুজ্জে সম্পর্কিত এ-তথ্যাদি পাওয়া গেছে তাঁর প্রপৌত্র পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

২২ এ বাড়ির তথ্যাদি প্রবোধ চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। বর্তমানে তাঁর দখলেই রয়েছে নটবর গোস্বামীর জমি। আরও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পাওয়া গেছে প্রবীণ জীবন কোলের নিকট।

'না, আমরা আর কেন, ঐখান থেকেই হোক।'..."[২৩]

নটবর যেমন ভক্তিমান, তেমন তাঁর স্ত্রী ছিলেন "যেন সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী।"[২৪] তাঁরা দুজনে ঠাকুরকে পরম ভক্তিশ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করেন। পুঁথিকার লিখেছেন ঃ

ভক্তিভরে দারাসহ সেবা কৈল তার।
বড় মিষ্ট রাষ্ট্র কথা পটল ভাজার॥
পটলের ভাজি এত লেগেছিল মিঠে।
মহাভক্ত মথুরের কানে ক্রমে উঠে॥
মথুরে বলিয়াছিলা আপনি গোঁসাই।
মথুর এমন ভাজি কোথাও না খাই॥
কি দিয়া রাঁধিয়াছিল বামনের মেয়ে।
তুষ্ট প্রভু রামকৃষ্ণ সে ভাজি খাইয়ে॥
অপুত্রক আছিলেন গোস্বামীপ্রবর।
পুত্রভিক্ষা করিলেন প্রভুর গোচর॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভুদেব ভগবান।
কৃপা করি দিলা বর হইবে সন্তান॥
যথাকথা প্রভুবাক্য নহে টলিবার।
অচিরে পাইল এক সুন্দর কুমার॥[২৫]

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহড়ে এসেছেন জানতে পেরেই নটবর তাঁর কাছে ছুটে গেছেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন কৃষ্ণভক্ত তাঁতিদের একটি কীর্তনের দল। "দেখিয়া প্রভুর মূর্তি লুটে পড়ে পায়।" সঙ্কীর্তন সহকারে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে যান নিজ আলয়ে। ইতোমধ্যে ঠাকুরের মহিমার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। শত শত লোকের ভিড় জমে যায়। কীর্তন সাঙ্গ করে সকলে মহাপ্রসাদ ধারণ করে। মনে হয় এ-যাত্রায় ঠাকুর নটবরের বাড়িতে একাধিক দিন বাস করেছিলেন। পুঁথিকার লিখেছেন ঃ "প্রভুর বৈঠক হয় গোস্বামীর ঘরে।/ভাণ্ডারা যোগায় দিন পিরীতের ভরে॥ / শ্রীপ্রভুর হয় ভিক্ষা গ্রামে স্থানে স্থানে। / কত শত শত ভক্ত সেই ঠাঁই জমে॥" এভাবে প্রচুর আনন্দ অকাতরে বিতরণ করে ঠাকুর ফিরে যান হৃদয়ের বাড়িতে।

শুধুমাত্র শিহড় গ্রামে নয়, আশপাশের কয়েকটি গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে ধন্য। জনশ্রুতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকথা। এরকম একটি গ্রাম কয়াপাট। গোঘাট থানার অন্তর্গত। এ গ্রামের পরেই দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলা। কয়াপাটের হাটতলায় যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দির ও তার সম্মুখেই নাটমন্দির। সম্ভবতঃ শিহড় থেকে ঠাকুর সাড়ে তিন মাইল পথ পালকিতে চেপে এখানে এসেছিলেন এবং নাটমন্দিরে সংকীর্তনে যোগদান করেছিলেন।[২৬] কয়াপাট বাসস্ট্যান্ডের পশ্চিমে থানার উল্টোদিকে ভুবনেশ্বর শিবের আটচালা। সেখানে পিলে দাগা হতো। এখানেই শ্রীমায়ের পিলে দাগানো হয়েছিল। [স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রমুখ কয়েকজনের মতে যজ্ঞেশ্বর শিবের নাটমন্দিরে শ্রীমায়ের পিলে দাগানো হয়েছিল।] কয়াপাটের দক্ষিণে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রাম। সেখানে বাস করতেন বিখ্যাত খোলবাদক বাইচরণ দাস।[২৭] লীলাপ্রসঙ্গকার মন্তব্য করেছেন যে, বাইচরণের খোলের বাজনা শুনলেই ঠাকুরের ভাব হতো। কয়াপাট ও কৃষ্ণগঞ্জের পাশেই বদনগঞ্জ। তার পর ধানক্ষেত। তারপর শ্যামবাজার। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্তা আউলিয়া মনোহর দাস বদনগঞ্জ গ্রামে বাস করতেন। এখানেই তার সমাধি আছে।[২৮] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এ-গ্রামে পদার্পণ করেছিলেন কি? একমতে তিনি এ-গ্রামেও পরিক্রমা করেছিলেন।

মেমানপুর বা মেহেরবানপুর গোঘাট থানার অন্তর্ভুক্ত। শিহড় থেকে দক্ষিণে তিন মাইল দূরে। পাশের গ্রাম মড়াগেড়ে। প্রতাপ হাজরার বাড়ি। মেমানপুরের শ্যামসুন্দরের পঞ্চরত্ন মন্দির অতি সুন্দর। কথিত আছে আউলচাঁদ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দির সংস্কার করা হয়েছিল ১৮৯২

২৩ কথামৃত, পৃঃ ৫৯২-৫৯৩

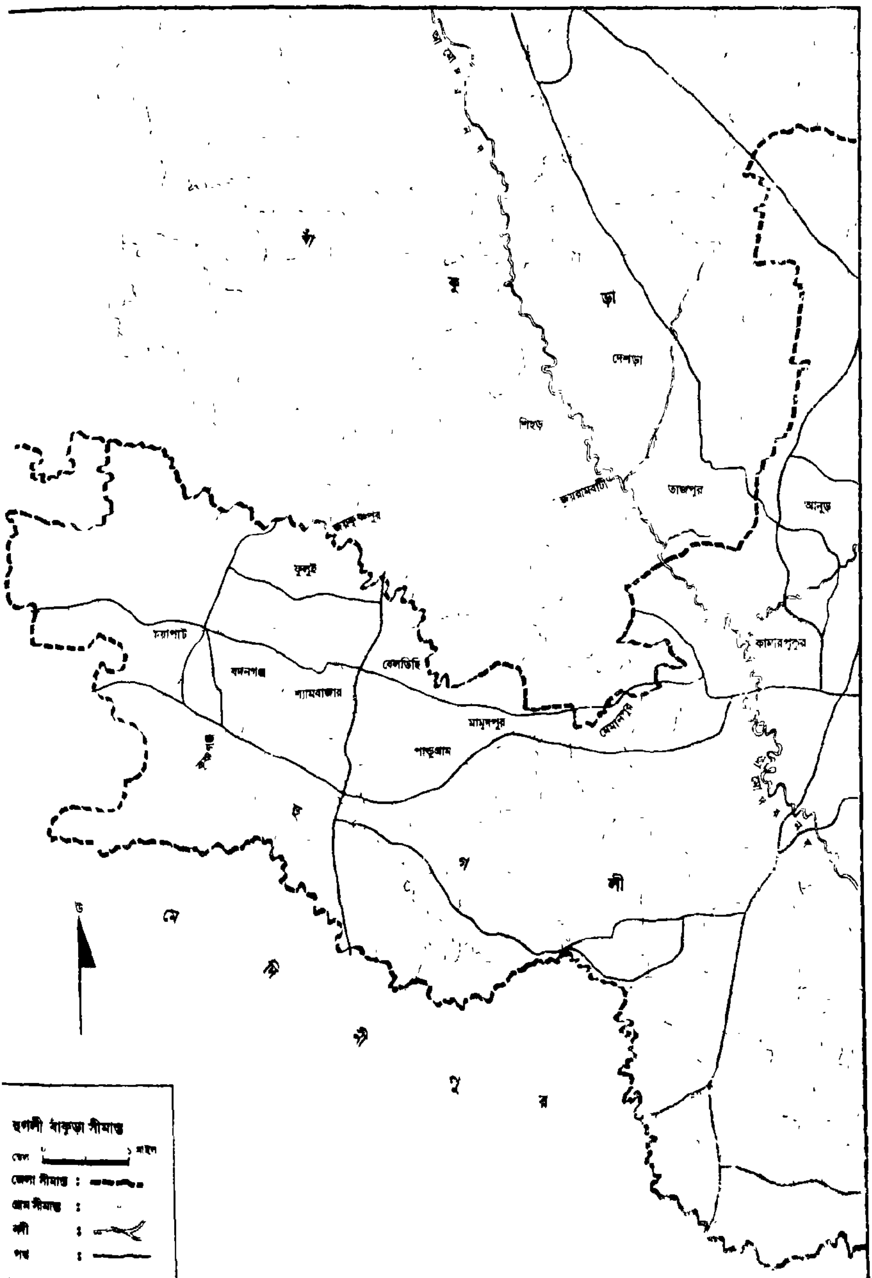
২৪ শ্রীরামকৃষ্ণচরিত—গুরুদাস বর্মন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪

২৫ নটবরের পুত্রের নাম রাধাগোবিন্দ। রাধাগোবিন্দের দুই পুত্র শ্রীপতি ও পশুপতি। শৈশবে শ্রীপতি জলে ডুবে মারা যান।

২৬ কথামৃতকার কথামৃতের ৪৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখেছেন যে, ঠাকুর কয়াপাটে সংকীর্তন করেছেন। বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক মন্মথনাথ কোঙার ছাত্রদের এস্থানটি দেখাতেন। স্বামী গৌরীশ্বরানন্দও (রামময় মহারাজ) এস্থানটি সম্বন্ধে বলতেন। বলা বাহুল্য, উভয়েরই উৎস ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধানশিক্ষক প্রবোধ চক্রবর্তী।

২৭ পূর্বোক্ত প্রধানশিক্ষক মন্মথনাথ কোঙার তাঁর ছাত্রদের নিয়ে বাইচরণের ভিটে দেখিয়েছিলেন।

২৮ পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা—সম্পাদনা ঃ অশোক মিত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৯


বাঁ
কু
ড়া
দেশড়া
শিহড়
জয়রামবাটি
তাজপুর
আনুড়
কামারপুকুর
ফুলুই
বেলডিহি
শ্যামবাজার
বদনগঞ্জ
মামুদপুর
পাণ্ডুগ্রাম
হু
গ
লী
মে
দি
নী
পু
র
উ
হুগলী বাঁকুড়া সীমান্ত
স্কেল ০ ১ মাইল
জেলা সীমান্ত :
গ্রাম সীমান্ত :
নদী :
পথ :

খ্রীস্টাব্দে। অগ্নিকোণে মনোরম একটি রাসমঞ্চ। আউলচাঁদের তিরোভাব ঘটেছিল অনন্তচতুর্দশীতে। প্রতিবছর সেদিন থেকে বারো দিন এখানে 'দ্বাদশ উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন কালে উৎসবের একটি আকর্ষণ ছিল প্রসিদ্ধ গোপালের কীর্তন। "দেশ জুড়ে ব্যাপ্ত নাম সুধামাখা স্বর।/এদেশে বসতি নয় উত্তরেতে ঘর॥" বর্তমানে সঙ্কীর্তন হয় শেষ চারদিন। এ-অঞ্চলের জনশ্রুতি, অন্যগ্রামে যাওয়ার পথে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন এবং মন্দিরের চাতালে বসে কথা বলেছিলেন।[২৯] ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে কথামৃতকার এই গ্রামে এলে সেখানকার গুরুদাস গোস্বামী তাঁর মারফৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার জানিয়েছিলেন।[৩০] সম্ভবতঃ এ-গ্রামেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

শ্যামবাজারের পূর্বে পান্ডুগ্রাম। এখানকার পাথরের তৈরি শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির খুবই সুন্দর। মন্দিরে রাধারানী ও শ্যামসুন্দর নিত্য-পূজিত। আউলচাঁদ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। এ-মন্দিরের পশ্চিমে শ্রীধর জীউর মন্দির। প্রতি বছর অনন্তচতুর্দশী থেকে বারো দিনের উৎসব হয়। শ্যামসুন্দর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দোলবাগানে দোলমঞ্চ। দোলোৎসবে অহোরাত্র কীর্তন প্রসিদ্ধ ছিল। মন্দিরের কিছুটা দূরে ভগ্নপ্রায় বর্গী-দালানে বর্গীহাঙ্গামার সময় আশ্রয় নিত গ্রামের শিশু, নারী ও বৃদ্ধগণ। এ-গ্রামের সম্পন্ন গোস্বামিগণ এই দালান তৈরি করেছিলেন। এ-গ্রামও শ্রীরামকৃষ্ণের চরণচিহ্নের স্মৃতি বহন করছে।[৩১]

শিহড় গ্রামকে কেন্দ্র করে শ্রীরামকৃষ্ণ এসকল গ্রামে লীলাবিলাস করেছিলেন। আনন্দ ভুড়ভুড়ি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য মাধুর্যের শ্রেষ্ঠ স্ফুরণ ঘটেছিল ফুলুই-শ্যামবাজারে। লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে এই ঘটনার কাল কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাতের অব্যবহিত পূর্বে। অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের পর কোন এক সময়ে ঘটেছিল। শশিভূষণ ঘোষের মতে ১২৮৬ সালে অর্থাৎ ১৮৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দে এ-ঘটনা ঘটেছিল। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য বলেন এই ঘটনার কাল ১৮৭৬ থেকে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়। অপরপক্ষে কথামৃতকার দুটি স্থানে (পৃঃ ৪৪ ও পৃঃ ৫৯২) বলেছেন যে, ঠাকুর শেষবারের মতো কামারপুকুরে এসেছিলেন ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে এবং ৩ মার্চ ১৮৮০ থেকে ১০ অক্টোবর ১৮৮০ পর্যন্ত এই অঞ্চলে বাস করেছিলেন। আলোচ্য ঘটনা এই আটমাসের শেষের দিককার। কাল নিরূপণের একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য, অনন্তচতুর্দশী তিথি পড়েছিল ১৯ আগস্ট ১৮৮০ (৪ ভাদ্র ১২৮৭)। তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে, অনুমান করা যায় ঠাকুর ১৯ আগস্টের কিছু পূর্বে শিহড়ে এসেছিলেন এবং সেখান থেকে কামারপুকুরে ফিরেছিলেন অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে। আমাদের সিদ্ধান্ত ঠাকুর সে-বছর শিহড় অঞ্চলে প্রায় দেড় মাস বসবাস করেছিলেন। পুঁথিকারের দাবি শ্রীরামকৃষ্ণ বালি-দেওয়ানগঞ্জ থেকে সিধাপথে শিহড় গিয়েছিলেন। কিন্তু কথামৃতকার ও লীলাপ্রসঙ্গকারের ইঙ্গিত—তিনি শিহড়ে গিয়েছিলেন কামারপুকুর থেকেই। আমরা শেষোক্ত অভিমত গ্রহণ করেছি।

এবার শিহড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন শেষবারের মতো। গ্রামে ঢুকবার মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে দেখতে পেলেন শ্রীগৌরাঙ্গকে। তাঁর নবনটবরবেশ, পরিধানে কালপেড়ে ধুতি। এ-যাত্রায় শ্রীরামকৃষ্ণ শিহড় অঞ্চলে বিশুদ্ধ গৌরাঙ্গভাব প্রচারের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হলেন। এখনো শিহড় গ্রামের লোকসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত। অবশিষ্ট নিম্নবর্ণের হিন্দু। গ্রামে অনেক ঘর গোঁড়া ব্রাহ্মণের বাস। তাঁদের অধিকাংশই বাসুদেব-বিষ্ণুর উপাসক। এঁরা শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত রাধাকৃষ্ণ উপাসনা, হরি সংকীর্তনাদি সুনজরে দেখতেন না। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এই মতাদর্শের প্রচার এবং কর্তাভজা বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের নৈতিক মানের অধঃপতন গোঁড়া বৈষ্ণবদের মনোভাব কঠোর করে

২৯ এ-গ্রাম সংক্রান্ত সংবাদ দিয়েছেন পঞ্চরত্ন মন্দিরের স্বত্বাধিকারী ও পূজারী সচ্চিদানন্দ গোস্বামী।

৩০ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৩৯

৩১ এ-গ্রামের তথ্য দিয়েছেন গুরুদাস গোস্বামী। এঁর পিতা হরিহর গোস্বামী (নারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী) শ্রীশ্রীমায়ের কাছে কয়েকবার গিয়েছিলেন।

তুলেছিল। এর ফলে

দেখিলে চৈতন্যভক্ত উচ্চ উপহাস।
ধরিত সকলে তাড়া হাতে লাঠি বাঁশ॥
গোউর নিতাই বলি যেথা সংকীর্তন।
কেড়ে ভেঙ্গে দিত খোল গ্রামবাসিগণ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পারেন গোঁড়াদের অধিকাংশই প্রকৃত হরিলীলারস আস্বাদন করেনি। লক্ষ্য করেন, শ্রীচৈতন্যোত্তর বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোক ধর্মের আড়ালে অনাচারে ব্যভিচারে লিপ্ত। এসকল সমস্যার সমাধানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকটি আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গ্রামের অনুকূল স্থানগুলিতে হরিকীর্তনের আয়োজন করেন। পুঁথিকার লিখেছেনঃ "সংকীর্তনে সবে মত্ত তবে এইবার।/ মহাভক্ত শ্রীনফর দলের সর্দার॥" মাঝে মাঝে পথ-সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে যোগ দেন। ক্রমে ক্রমে শিহড়বাসিগণের শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে আগ্রহ উদ্রিক্ত হয়, বিরোধী আবহাওয়া পালটিয়ে যায়।

গ্রামবাসীদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ শান্তিনাথের মন্দির। পূর্বমুখী শিখর দেউলটি প্রায় ৩০ ফুট উঁচু। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১১ ফুট ৮ ইঞ্চি। নিত্যপূজিত দেবতা স্বয়ম্ভুলিঙ্গ শিব। নাম শান্তিনাথ। শিহড়ের তদানীন্তন জমিদার বর্ধমানের মহারাজ এবং মন্দিরের সেবাইত চক্রবর্তীদের পূর্বপুরুষ একই সময়ে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন মন্দির নির্মাণের জন্য। নিকটবর্তী জঙ্গলে এক সাধু সাধনভজন করতেন। তিনি মারা যান। স্বপ্ননির্দেশে তাঁর ঝুলিতে পাওয়া যায় তিনটি সোনার ইট। তা দিয়ে মন্দির তৈরি হয়। বর্ধমানের মহারাজ সেবাপূজার জন্য জমির ব্যবস্থা করে দেন। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের (শাণ্ডিল্য গোত্র) পরিবারের ওপর সেবা-পূজার ভার এবং তাদের চক্রবর্তী উপাধি দেওয়া হয়।[৩২]

মন্দিরের জগমোহনের উচ্চতা ১৫ ফুট ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১৮ ফুট ৮ ইঞ্চি। দেউলটি ও জগমোহন—উভয়েরই ছাদ ধাপযুক্ত চারচালা পদ্ধতিতে নির্মিত। স্থাপত্যশৈলীর বিচারে দেবালয়টি খ্রীস্টীয় সতের শতকে নির্মিত।[৩৩] জগমোহনের সম্মুখে নাটমন্দির। ইটের তৈরি থামের ওপর টালির ছাদ ছিল। ১৩৪৯ সালের ঝড়ে ভেঙ্গে পড়লে সমান মাপের বর্তমান নাটমন্দিরটি তৈরি করা হয়। সিমেন্ট-লোহার তৈরি থামের ওপর টিনের চারচালার নাটমন্দির। চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে গাজনের মেলা বসে ২২ চৈত্র থেকে ১ বৈশাখ পর্যন্ত। এখানকার 'মনুই' ভোগ প্রসিদ্ধ।

একদিন শান্তিনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ সংকীর্তনের আসর জমিয়ে তোলেন। পুঁথিকারের বর্ণনাঃ

একদিন ভক্তগণ হয়ে মত্তচিত।
সংকীর্তনে ধরে নিম্নলিখিত সঙ্গীত॥
"সংকীর্তনে আমার গোরা নাচে।
দেখরে বাপ নরহরি, থেকো গৌরের কাছে;
সোনার বরণ গৌর আমার ধুলোয় পড়ে পাছে॥"
শুনিয়া শ্রীপ্রভু এই সংকীর্তন গান।
মহাভাবে হৈলা মহাবলের আধান॥
সুবর্ণ বরণ কান্তি অঙ্গ ফেটে পড়ে।
মহালম্ফে সংকীর্তন প্রাঙ্গণ-উপরে॥
বারে বারে এক ধুয়া যত ভক্ত গায়।
তাহাতে হইলা প্রভু উন্মত্তের প্রায়॥
নাহি আর বাহ্যজ্ঞান কিভাবে কে জানে।
লুটোপুটি যান গোটা মন্দির প্রাঙ্গণে॥
পাষাণে প্রাঙ্গণ বাঁধা সুকর্কশ তায়।
সুকোমল অঙ্গ প্রভু কত ছোড়ে যায়॥

ঠাকুরের ভাবোন্মত্ততা কিছুতেই ভাঙে না। হৃদয় বারংবার ঠাকুরের কানে একটি বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন। অবশেষে তাঁর বাহ্যজ্ঞানের স্ফূর্তি হয়। "স্বদেশের লোক দেখে অদ্ভুত ব্যাপার।/ সে হতে সেখানে নহে সংকীর্তন আর॥" ঠাকুরের শরীরের অবস্থা বিবেচনা করেই হৃদয় ঐস্থানে ঠাকুরের সংকীর্তন বন্ধ করেছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গভাব-সংবাহক শ্রীরামকৃষ্ণ এবার আরও এক ধাপ অগ্রসর হন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন উচ্চ ব্রাহ্মণবংশীয়গণের "অদ্যাপিও তুলসী কেহ না পরে গলায়।" হৃদয়ের সাহায্যে তিনি কুড়িটি তুলসীর মালা সংগ্রহ করেন। একদিন তিনি সমবেত ভক্তগণকে 'বিস্তর বিস্তর' তুলসীর মহিমা বলেন।

৩২ সংবাদদাতা বর্তমান সেবাইত ও জয়রামবাটী মিশন স্কুলের প্রধানশিক্ষক সাতুগোপাল চক্রবর্তী।

৩৩ বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১, পৃঃ ১২২-১২৩

শ্রোতাগণ তুলসীকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানান। যাদের বাড়িতে নারায়ণ-শিলার পুজো ছিল ঠাকুর তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে মালা দেন এবং বলেন: "পরাশি তুলসীমালা শিলার চরণে। / উচ্চারিয়া মহামন্ত্র গুরুদত্ত ধন। / পশ্চাতে করিবে সবে গলায় ধারণ॥" মালা নিয়ে একে একে সকলে বাড়ি ফিরে যান, বসে থাকেন শুধু নফর বাড়ুজ্জে। ঠাকুরের শ্রীপদে তাঁর অচলা ভক্তি। ঠাকুরের অঙ্গে দেখতে তিনি পান শ্রীধরের প্রতিমূর্তি। তিনি "প্রভুর চরণে মালা দিল জড়াইয়া।" ঠাকুর গভীর ভাবস্থ হয়ে পড়েন। *আনন্দিত নফর গলায় ধারণ করেন সেই তুলসী মালা।*

শিহড়ের অনেকেই এভাবে হরিসুধা আস্বাদন করে অধিকতর আস্বাদনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। এদিকে মেমানপুরে পান্ডুগ্রামে অনন্ত-চতুর্দশী থেকে শুরু হয়েছিল দ্বাদশ উৎসব। *অনন্তচতুর্দশী পড়েছিল ১৯ আগস্ট ১৮৮০।* মেমান-পুরের আকর্ষণ প্রসিদ্ধ গোপালের সঙ্কীর্তন। তাঁর সুধামাখা স্বর, আর দেশজুড়ে নাম। শিহড়ের ভক্তদের আকাঙ্ক্ষা তারা ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গোপালের কীর্তনানন্দ উপভোগ করবে। তিনি যেতে অসম্মত হন। হৃদয়কে পাঠান মেমানপুরে। সন্ধ্যা সমাগত। গোপাল সেদিনকার মতো কীর্তন *মাত্র সমাপ্ত করেছেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কথা* শুনে গোপাল সদলবলে শিহড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আধক্রোশ দূরে থেকে কীর্তনীয়াগণ খোল ও রণশিঙ্গা বাজান। ঠাকুর শুনতে পান, অপরে পায় না। কিছু সময়ের মধ্যে গোপাল হৃদয়ের বাড়িতে উপস্থিত হন। দেখেন ঠাকুর গভীর ভাবস্থ। তাঁর শ্রীপদে গোপাল প্রণাম করেন। গোপালের আগমন জানতে পেরে গ্রামবাসিগণ ছুটে আসে। ঠাকুরের বাহ্যস্ফূর্তি হলে গোপাল কীর্তন আরম্ভ করেন: "ভুবনসুন্দর গৌউর নদে কে আনিল রে।" ইতোমধ্যে গ্রামবাসিগণ ছুটে এসেছে। কীর্তন কিছুটা এগুতেই সমঝদার ঠাকুর আখর দেন: *"গোপাল রে, তুই কি বললি রে। গোরারূপ বিধির* গড়া নয়। / স্বয়ং স্বপ্রকাশ রূপ বিধির গড়া নয়।" ইত্যাদি। ঠাকুরের উপস্থাপিত গোরা রায়ের ভাব-মূর্তিখানি কীর্তনীয়াদের হৃদয়ে ঝলমল করে ওঠে। কীর্তনীয়া গোপাল ঠাকুরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। হৃদয় আয়োজিত ভোজন সমাপ্ত হলে আনন্দোৎসব সেদিনকার মতো শেষ হয়। তখন অনেক রাত।

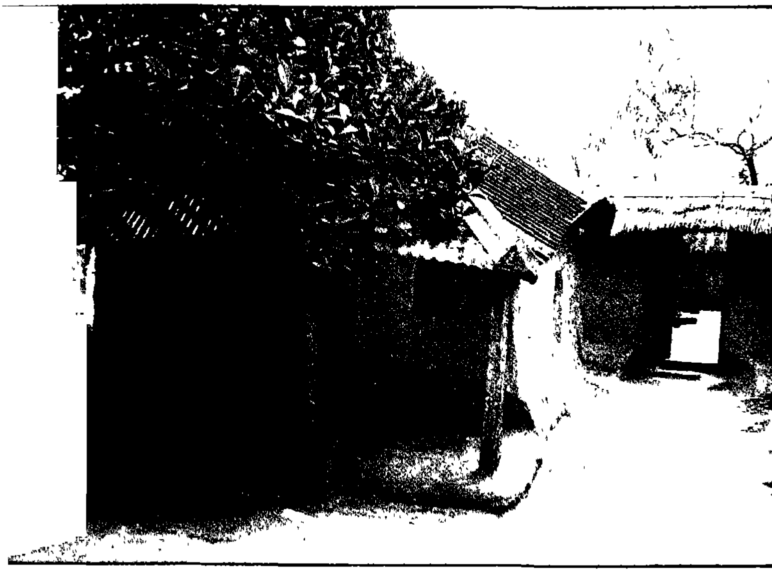
শ্যামবাজার ও বেলডিহা (বেলটে) পাশাপাশি গ্রাম। বেলটের পশ্চিমে শ্যামবাজার। গোঘাট থানার অন্তর্গত। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে শ্যামবাজারে পরীক্ষা-মূলক ভাবে মিউনিসিপ্যালিটি ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। কিন্তু কাজ সুবিধামতো না হওয়াতে ১৮৮৫ *খ্রীস্টাব্দে তা উঠে যায়। এখানকার তসর ও তাঁতের* কাপড় এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। গ্রামে গঙ্গাধর জীউ নামক শিবের মন্দির প্রাচীন। দাসপাড়াতে নয়টি কুঞ্জ সাজিয়ে বিভিন্ন দলের সঙ্কীর্তন এবং তিনদিন ব্যাপী মহোৎসবটি জনপ্রিয়। গ্রামের মধ্যভাগে সদর রাস্তার উত্তরপাশে দেখা যায় দুটি ভগ্নপ্রায় মন্দির। একটি রঘুবীরের মন্দির, অপরটি শিবের। পশ্চিমের মন্দিরটি ১৭৪৪ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত, তার পাশেই রয়েছে রামেশ্বর মন্দির। রাস্তার দক্ষিণে দেখা যায় দুর্গামন্ডপের ধ্বংসাবশেষ। এখানে শিবদুর্গা-মূর্তির পুজো হতো। সামনের মাঠে ছিল মল্লিকদের পাঠশালা। উপরোক্ত মন্দির দুটির মধ্য দিয়ে দেখা *যেত জমিদার মল্লিকদের দক্ষিণমুখী দোতলা কোঠা-*বাড়ি। জমিদার ঈশান মল্লিক ও শ্রীনাথ মল্লিকের বাড়ির মাঝে ছিল একটি গলি।[৩৪] শ্রীনাথ সম্ভবতঃ ঈশানের ছোট ভাই।

ঈশান মল্লিকের বাড়ির দক্ষিণে ঈশান চৌধুরীর বাড়ি ছিল দু-মিনিটের পথ। ঈশান ছিলেন ভক্তিমান ব্রাহ্মণ। তাছাড়াও একটি গুই পরিবার[৩৫] ছিল শ্রীরামকৃষ্ণলীলার সঙ্গে সম্পর্কিত। আর বেলটে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 'ধর্মমঙ্গল' রচয়িতা মানিক গাঙ্গুলি। তিনি বেলটের বাঁকুড়া রায় ও শ্যামবাজারের দলু রায় প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার বন্দনা করেছেন।

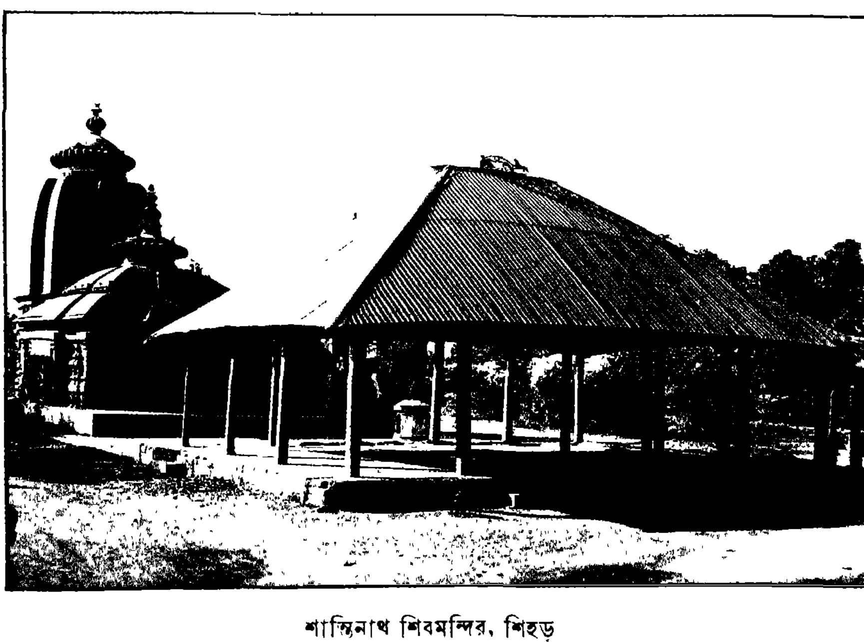
শ্রীরামকৃষ্ণ বেলটের নটবর গোস্বামীর বাড়িতে সাতদিন বাস করেছিলেন। *লীলাপ্রসঙ্গকারের মতানু-*সারে শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ বাড়িতে "সাতদিন অবস্থানপূর্বক

৩৪ তথ্যাদি মুখ্যতঃ প্রাক্তন শ্যামবাজার-নিবাসী শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট থেকে সংগৃহীত। কিছু তথ্য দিয়েছেন স্থানীয় লোক।

৩৫ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে কথামৃতকার এই গ্রামে গুই-পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

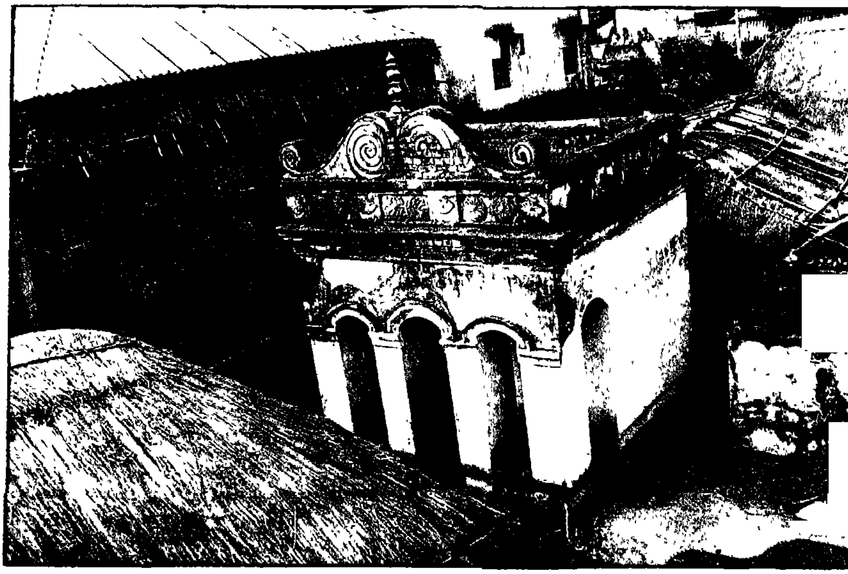


হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের চণ্ডীমণ্ডপ, শিহড়



শান্তিনাথ শিবমন্দির, শিহড়

আলোকচিত্র : পার্থসারথি নিয়োগী

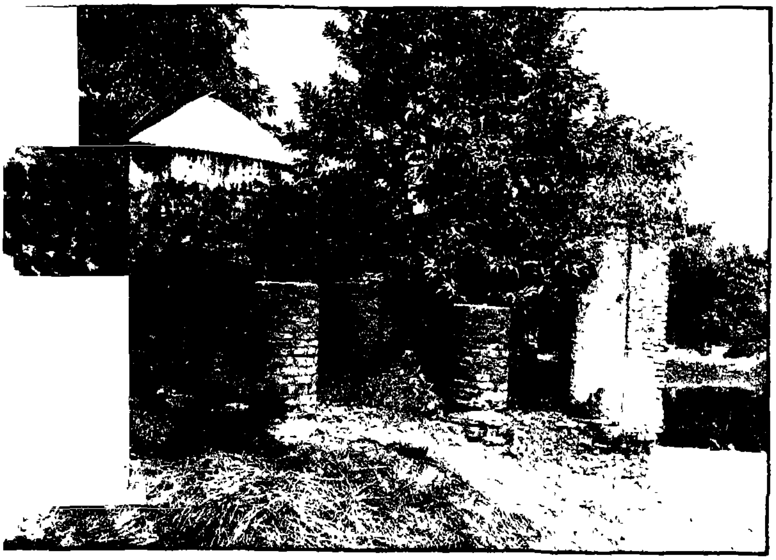


নফর বাঁড়ুজ্জেদের শ্রীধর মন্দির, শিহড়



রামেশ্বর ও রঘুবীরের মন্দির, শ্যামবাজার

আলোকচিত্র : পার্থসারথি নিয়োগী



মল্লিকদের দুর্গামণ্ডপের
ধ্বংসাবশেষ, শ্যামবাজার

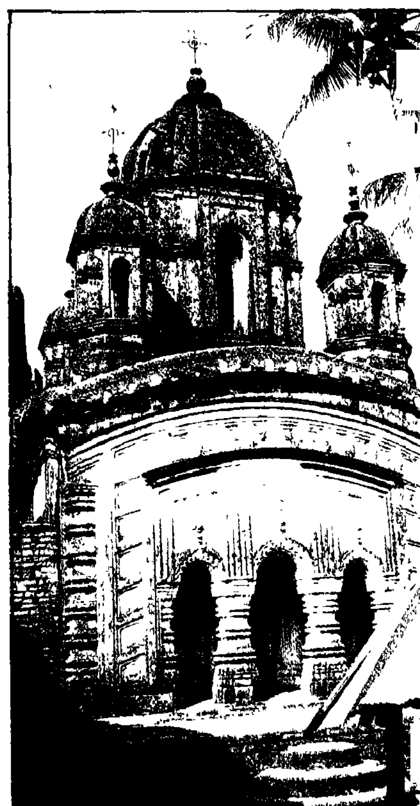


যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দির, কয়াপাট

আলোকচিত্র : পার্থসারথি নিয়োগী



শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির, মেহেরবানপুর



শ্রীধর জীউর মন্দির, পাণ্ডুগ্রাম

আলোকচিত্র ঃ পার্থসারথি নিয়োগী

শ্যামবাজারের বৈষ্ণবসকলের কীর্তনানন্দ দর্শন করিয়াছিলেন।" এবং ঈশানচন্দ্র মল্লিক "তাঁহাকে নিজ বাটিতে কীর্তনানন্দে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন।" গুরুদাস বর্মনের মতানুসারে শ্যামবাজারে চব্বিশ প্রহরী হরিসংকীর্তন দেখতে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এদিকে পুঁথিকারের মতে নটবর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাল কীর্তন শোনাবার জন্য রামজীবনপুরের কীর্তনীয়া ধনঞ্জয় দে ও কৃষ্ণগঞ্জের খোলবাদক রাইচরণ দাসকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর বাড়িতে। এসকল তথ্যের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নেই। নটবরের বাড়িতেই কীর্তনের আসর বসেছিল। ধনঞ্জয়ের মিষ্ট কণ্ঠ ও রাইচরণের সুনিপুণ হাতে সংকীর্তনের মায়াজাল সৃষ্টি করেছিল। ঠাকুর ভাবসাগরে ভাসেন ডোবেন। আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। অনুমান, এইদিনের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেই ঠাকুর পরবর্তী কালে বলেছিলেনঃ "ওদেশে নটবর গোস্বামীর বাড়িতে কীর্তন হচ্ছিল—শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ দর্শন করে সমাধিস্থ হলাম! বোধ হলো আমার লিঙ্গ শরীর শ্রীকৃষ্ণের পায় পায় বেড়াচ্ছে।"[৩৬]

কীর্তনের আসর জমজমাট. সেসময়ে গৃহকর্তা নটবর এক অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হলেন। আসরে ঠাকুরের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল 'স্বতন্ত্র সর্বোচ্চ' আসন। অপর সকলের জন্য নিচের আসন। আমন্ত্রিত পাণ্ডুগ্রামের গোস্বামিগণ এই বৈষম্য দেখে ক্ষেপে ওঠেন, প্রতিবাদ করে নিজ গ্রামে ফিরে যান। গৃহস্বামীর অনুরোধ ক্ষমাপ্রার্থনাদি তাদের শান্ত করতে ব্যর্থ হয়। নটবর অসহায় বোধ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতে পেরে নটবরকে নির্দেশ দেন; "কীর্তন করিয়া বন্ধ যাও শীঘ্রগতি।/ডাকিয়া আনহ যেবা দল অধিপতি॥" নটবর আজ্ঞা পালন করেন। দলপতি উপস্থিত হতেই ঠাকুর আসন থেকে নেমে এসে দলপতিকে নমস্কার করেন। দলপতির মাথা লজ্জায় নিচু হয়ে যায়। মনে হয় সেসময়ে ঠাকুরের নির্দেশে কীর্তন বন্ধ হয়ে গেছিল! দলপতির লজ্জা ভাঙবার জন্য ঠাকুর তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতে থাকেন। পুঁথিকার মন্তব্য করেছেনঃ "একমনে গোঁসাই ব্রাহ্মণ কথা শুনে।/বুঝে কিবা ভাবে এবে ঝুরে দুনয়নে॥" দলপতিসহ গোস্বামিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের পদাবনত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এই পটভূমিকাতে শ্রীরামকৃষ্ণ নতুন এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। স্থান—শ্যামবাজারে মল্লিকদের মন্দির প্রাঙ্গণ। পরদিন থেকে তিনি এক মহা-সংকীর্তনে মেতে উঠলেন। "যতেক ব্রাহ্মণে প্রভু লয়ে পরদিনে।/তুলিলা অতুলানন্দ হরি-সংকীর্তনে॥" অতুলানন্দের সাথে ভাবভক্তি প্রেমের উচ্ছ্বাস সকলকে মাতিয়ে তুলল। শ্রীচৈতন্য বলেছিলেনঃ "এক কৃষ্ণনামে করে সব পাপক্ষয়।/ নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হইতে হয়॥"[৩৭] হরিনামের আকর্ষণ, কৃষ্ণপ্রেম-সঞ্চারণ, নববিধ ভক্তির পরিপূর্ণ বিস্ফুরণ ইত্যাদি জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য নবগৌরাঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রস্তুতি। যোগমায়ার সাহায্যে হরিলীলা। সেকারণে যেন ভেলকি লেগে গিয়েছিল। বাজিকরের ক্ষমতা দেখে সকলে মোহিত হয়ে পড়েছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিকার বর্ণনা করেছেনঃ

* সাতদিন সাতরাত্রি হয় সংকীর্তন।
অবিরাম হরিনাম বিভেদি গগন॥ ··
প্রভুর মোহন নৃত্য হয়ে মাতোয়ারা।
কভু অঙ্গে বাহ্যজ্ঞান কভু বাহ্যহারা॥
অযুত উন্মত্ত করীসম গায় বল।
শ্রীচরণ চাপে ধরা করে টলমল॥
বাহ্যহারা যবে অঙ্গ জড়ের সমান।
লোকে দেখে বুঝে যেন নাহি তার প্রাণ॥
তখনি কিঞ্চিৎ পরে করে দরশন।
বিকশিত মুখপদ্মে চাঁদের কিরণ॥
মোহন নৃত্যেন পুনঃ শতগুণে জোর।
হুঙ্কারিয়া হরিনাম আনন্দে বিভোর॥···
কহে হেন মানুষ কোথায় কে দেখেছে।
এইক্ষণে হতপ্রাণ পরক্ষণে বাঁচে॥

গুরুদাস বর্মনের বর্ণনার একটি অংশঃ "কীর্তনের প্রারম্ভ হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুহুর্মুহুঃ বাহ্য চৈতন্য হারাইতে লাগিলেন, কখন ঘোর ভাবাবস্থায় অপরূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যেন সর্বাঙ্গ অস্থিহীন—তাঁহার দেহসরসী যেন ভগবৎ-প্রেমানন্দ-মলয়ে তরঙ্গায়িত। আবার কখনও বা মহাভাবে সমাধিস্থ, নিস্পন্দ, স্থির-নেত্রে দরদরধারে প্রেমাশ্রু বহিতেছে।

৩৬ কথামৃত, পৃঃ ৩৯৮

৩৭ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, পঞ্চদশ অধ্যায়

অমনি হৃদয় আসিয়া পশ্চাৎ হইতে অঙ্গ ধরিয়া কর্ণে প্রণবোচ্চারণ করিতেছেন। আবার ক্ষণেক পরে মহানন্দে উদ্দাম নৃত্য ও মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন। গ্রাম-গ্রামান্তরের ইতরলোক বলিতে লাগিল 'শ্যামবাজারে একজন লোক এসেছে, সে কীর্তন করতে করতে দিনে সাতবার মরে যাচ্ছে আবার বেঁচে উঠছে।' ক্রমেই আনন্দের প্রবাহ দিগ্‌দিগন্ত ছাইল, সহস্র সহস্র লোক[৩৮] মিলিয়া উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন করিতে লাগিলেন। ভাবে কেহ গাহিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ বা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে।"[৩৯]

মানুষ কাতারে কাতারে জমায়েত হয়েছিল। গৃহস্থালির কাজ ছেড়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে মানুষ সমবেত হয়েছিল। লজ্জা ভয় ত্যাগ করে উপস্থিত হয়েছিল গৃহললনাগণও। লীলাকর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য লোক পাগল হয়ে উঠেছিল। পুঁথিকার লিখেছেন: "দরশনে লুব্ধ মন আসিয়াছে ছুটে।/ উপায়স্বরূপে লোকে চালে গাছে উঠে॥/ গাছে উঠে এত লোক দেখিবারে নাচ।/ গাছ গোটা বোধ হয় যেন মানুষের গাছ॥" এই আনন্দের আবহে দেখা গেল জন্মমূক হরিনাম করছে। এক-পায়ের খোঁড়া মানুষ প্রহর প্রহর নাচছে। অন্ধ দেখতে পাচ্ছে "মূর্তিমান নাম।"[৪০] অদ্ভুত ব্যাপারসকল ঘটতে থাকে। সাধক পণ্ডিত গোস্বামীদের কেউ কেউ অনুভব করেন করুণাময় ঈশ্বরের করুণার বিগ্রহ অযাচিতভাবে প্রেম করুণা বিতরণ করছেন। তাদের মনে হয়:

আনন্দঃ কিমু মূর্ত এষ পরমঃ প্রেমৈব কিং দেহবান্।
শ্রদ্ধা মূর্তিমতী দয়ৈব কিমু বা ভূমৌ স্বরূপিণ্যসৌ॥
মাধুর্যং নু শরীরি কিং নববিধা ভক্তির্গতৈকাং
তনুং।[৪১]

—আহা ইনিই কি আনন্দের প্রত্যক্ষ মূর্তি, ইনিই কি পরম প্রেমের সাক্ষাৎ বিগ্রহ, ইনিই কি মূর্তিমতী শ্রদ্ধা, অথবা ইনিই ধরাধামে উপস্থিত স্বরূপিণী দয়া, ইনিই কি মাধুর্যের প্রত্যক্ষ রূপ, নববিধা ভক্তি কি এরই তনুখানি আশ্রয় করে প্রত্যক্ষ হচ্ছে? লীলাকরের রূপের ঝলক, সঙ্গীতের গমক, ভাবের দমক উপস্থিত সকলকে সম্মোহিত করে রাখে। এর মধ্যে দুচারজনই চর্মদৃষ্টি ত্যাগ করে মর্মদৃষ্টি দিয়ে প্রকৃত লীলারস আস্বাদন করেন। চরিতামৃতকার যথার্থই লিখেছেন, "চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম।/ প্রেমনেত্রে দেখে তারে স্বরূপ প্রকাশ॥"[৪২]

অবতার-পুরুষ যোগমায়া আশ্রয় করে অপরকে আনন্দ আস্বাদন করান, তেমনি সেই মায়াতে সাময়িকভাবে মুগ্ধ হয়ে নিজেও রসামৃত আস্বাদন করেন। স্মৃতির কুঠুরিতে তা সঞ্চিত হয়ে থাকে। সে-কুঠুরীর দ্বার উন্মোচিত করে লীলাকর পরবর্তী কালে বলেছিলেন: "ওদেশে যখন হৃদের বাড়িতে ছিলাম, তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম গৌরাঙ্গভক্ত। গাঁয়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলাম গৌরাঙ্গ। এমনি আকর্ষণ—সাতদিন সাত রাত লোকের ভিড়। কেবল কীর্তন আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক! গাছে লোক!

"নটবর গোস্বামীর বাড়িতে ছিলাম। সেখানে রাতদিন ভিড়। আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতীর ঘরে[৪৩] গিয়ে বসতাম। সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েছে। সব খোল-করতাল নিয়ে গেছে।—আবার 'তাকুটি! তাকুটি' করছে। খাওয়া-দাওয়া বেলা তিনটার সময় হতো। রব উঠে গেল—সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে! পাছে আমার সর্দিগর্মি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেতো;—সেখানে আবার পিঁপড়ের সার। আবার খোল করতাল।—তাকুটি! তাকুটি! হৃদয় বকলে, আর বললে, আমরা কি কখনো কীর্তন শুনি নাই।

"সেখানকার গোঁসাইরা ঝগড়া করতে এসেছিল। মনে করেছিল, আমরা বুঝি তাদের পাওনা-গণ্ডা

৩৮ ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে শ্যামবাজার মিউনিসিপ্যালিটির লোকসংখ্যা ছিল ১৯,৬৩৫ জন। সুতরাং ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হরিলীলায় 'সহস্র সহস্র' লোক হওয়া আক্ষরিকভাবেই সম্ভব ছিল।

৩৯ শ্রীরামকৃষ্ণচরিত—গুরুদাস বর্মন, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫৪-১৫৫

৪০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, ঐ, পৃঃ ২২৩

৪১ চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্, কবিকর্ণপুর, ৯ম অঙ্ক, ৭ম শ্লোক।

৪২ চরিতামৃত, আদিলীলা, ৫ম অধ্যায়

৪৩ গ্রামের শেষ প্রান্তে পূর্ব দিকে ছিল এ-বাড়ি। 'বায়েনদের বাড়ি' নামে পরিচিত। বায়েন শব্দের আভিধানিক অর্থ দক্ষ বাদক। নাম ছিল রামধন বায়েন। ছেলে সুধীর। রামধন ভাল খোল বাজাতেন। মূল উপাধি ছিল দাস। পূর্ব ও পশ্চিম দুয়ারী দুটো কোঠাবাড়ি ছিল। বর্তমানে এর কোন চিহ্ন নেই। পিছনের ডোবাটি এখনও বর্তমান। নটবর গোস্বামীর বাড়ি এখান থেকে সামান্য পথ। প্রবল জনশ্রুতি এবাড়িতে এসে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

নিতে এসেছি। দেখলে, আমি একখানা কাপড় বা একগাছা সুতাও লই নাই। কে বলেছিল, ব্রহ্মজ্ঞানী। তাই গোঁসাইরা বিড়তে এসেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'এর মালা তিলক নাই কেন?' তারাই একজন বললে, 'নারকোলের বেল্লো আপনা-আপনি খসে গেছে।' নারকোলের বেল্লো ও-কথাটি ঐখানেই শিখেছি। জ্ঞান হলে উপাধি আপনি খসে পড়ে যায়।

"দূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হতো। তারা রাত্রে থাকত। যে-বাড়িতে ছিলাম, তার উঠানে রাত্রে মাগীরা অনেক সব শুয়ে আছে। হৃদয় প্রস্রাব করতে রাতে বাহিরে যাচ্ছিল, তা বলে 'এইখানেই (উঠানে) কর।'

"আকর্ষণ কাকে বলে, ঐখানেই বুঝলাম। হরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেলকি লেগে যায়।"

অপর একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এঘটনা-সম্পর্কে বলেছিলেন: "গৌরাঙ্গের ভাব জানতে চেয়েছিলাম। ওদেশে শ্যামবাজারে—দেখালে। গাছে পাঁচিলে লোক—রাতদিন সঙ্গে সঙ্গে লোক! সাতদিন হাগবার জো ছিল না। তখন বললাম, মা, আর কাজ নেই। তাই তখন শান্ত।"

এই মাধুর্যময় ঘটনার কিছু বাড়তি তথ্য দিয়েছেন কথামৃতকার। তিনি লিখেছেন যে, ঠাকুর নটবর গোস্বামী, ঈশান মল্লিক, সদয় বাবাজী[৪৪] প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে সংকীর্তন করেছিলেন।

এই তল্লাটে একটি জনপ্রবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। জনপ্রবাদটি হলো, "ক্ষ্যাপা এসেছে।" 'ক্ষ্যাপা'[৪৫] অর্থে বাউল। গ্রামের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে করেছিল একজন খাঁটি বাউল।

আরও একটি তথ্য জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-তথ্যানুসন্ধানী প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায় সূত্রে। অনুসন্ধান করে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, হৃদয়রাম ক্লান্ত-শ্রান্ত ঠাকুরকে বাইরে একটু ঘুরিয়ে আনবেন বলে তাঁকে বহুলোকের মেলা থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন ঈশান মল্লিক ও শ্রীনাথ মল্লিকের বাড়ির মধ্যকার পথটি দিয়ে। উত্তরদিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তাঁরা শ্যামবাজার থেকে কামারপুকুর যাবার রাস্তায় উঠেছিলেন। অতঃপর উত্তরমুখো আরও কিছুটা হেঁটে মাঝিপাড়ার (শ্যামবাজারের) মধ্য দিয়ে শিহড়ে পেঁৗছেছিলেন।

১৩০৩ সনের ২৩ বৈশাখ আলমবাজার মঠে প্রাপ্ত হৃদয়রামের একটি দীর্ঘ পত্র থেকে জানা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি স্থানীয় মানুষদের ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে ঈর্ষান্বিত গোস্বামিগণ তাঁকে হত্যা করতে পর্যন্ত চেয়েছিল। পরে গোস্বামিগণ ঠাকুরকে বিচারে পরাস্ত করতে চেষ্টা করে। বিচার্য বিষয় ছিল বৈষ্ণবমত না শাক্তমত সত্য। অনেক বিচারের পর সকলেই ঠাকুরের মত মেনে নেয় যে, দুটি মতই সত্য।

একশ দশ বছর পূর্বেকার ঘটনা। সচ্চিদানন্দ ভগবান নিত্যলীলাময়, কিন্তু তাঁর প্রকটলীলা ভক্তগণের চির-আকাঙ্ক্ষিত। প্রকটলীলার প্রবল আকর্ষণ। বিশেষ করে তিনি যখন হরিলীলার গাঢ় মাধুর্যরস নিজে আস্বাদন এবং অপরকে আস্বাদন করাবার জন্য আয়োজন করেন, সেসময়ে লীলাবিলাস হয় পরম মনোমুগ্ধকর এবং আকর্ষণ হয়ে ওঠে উন্মত্তকারী। তাঁর এই আয়োজন যোগমায়া আশ্রয় করে। যোগমায়াশক্তির প্রভাবে তিনি নিজে আত্মহারা হন, অপর সকলকে সম্মোহিত করেন। ফুলুই-শ্যামবাজারে এরূপ একটি পরিমণ্ডল রচনা করে অনন্তমাধুর্যময় শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমের বৈভব প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের মতো তাঁকেও দেখে মনে হচ্ছিল "সংকীর্তন-আনন্দ-বিহ্বল-অবতার।"[৪৬] তাঁর হৃদয়-সঞ্জাত বিশুদ্ধ ঈশপ্রেম উপচে পড়ে সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর রসাস্বাদন করেছিল, বিমুগ্ধ-চিত্তে দেখেছিল বিচিত্র কাণ্ডকারখানা। অরূপরতন বাজিকর যেন বলেছিলেন "লাগ, ভেলকি লাগ", আর হরিলীলায় ভেলকি লেগে গেছিল। সে-লীলানাটকের স্মৃতি চিরপ্রেরণাপ্রদ।

৪৪ সদয় বাবাজীর সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়নি। অনুমান, তিনি ছিলেন সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের। তদানীন্তন কালে তিনি সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। শ্যামবাজার-নিবাসী বৃদ্ধ প্রবোধকুমার চ্যাটার্জির নিকট আসতেন এক বুড়ি। মোটা চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা ছাটা চুল। পরনে খাটো থান, গলায় মালা, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি। শিবপ্রসাদবাবু (প্রবোধবাবুর ছেলে) মহিলাকে কয়েকবার সশ্রদ্ধভাবে বলতে শুনেছেন সদয় বাবাজীর কথা। সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন সদয় বাবাজীর শিষ্যা। মহিলা বাস করতেন পান্ডুগ্রামে।

৪৫ 'ইহাদের (বাউলদের) মধ্যে কেহ কেহ ক্ষ্যাপা এই উপাধি পাইয়া থাকে। ফলতঃ ক্ষ্যাপা ও বাউল উভয়েই একার্থক শব্দ। বাউল শব্দ বাতুলের প্রাকৃত বই আর কিছুই নয়।' (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, পৃঃ ১১০)

৪৬ শ্রীচৈতন্যভাগবত, ৩।৩।৪২৬

নিবন্ধ

বর্ধমানের ঈশানেশ্বর মন্দির এবং শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রণবেশ চক্রবর্তী

এই বঙ্গের কোথায় কোথায় শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি পড়েছে, তার সঠিক বিবরণ আজও অজানা রয়ে গেছে। সেদিন উত্তর চব্বিশ পরগনার আমডাঙ্গায় করুণাময়ী মন্দিরে গিয়ে শুনলাম: এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন। একি শুধুই শোনা কথা, অথবা ঘটনা? ভবিষ্যতে জানাব ইচ্ছা রইল। কিন্তু বর্ধমান শহরের ঈশানেশ্বর মন্দিরে তিনি যে এসেছিলেন, সেটাতো ইতিহাস।

শ্যামসায়রের ধারে ঈশানেশ্বর মন্দিরে শিবরাত্রির দিন বিরাট মেলা বসে। কত মানুষের ভিড়, কত মানুষের মিলন-মেলা! শিবঠাকুরকে কেন্দ্র করেই সেই মিলনের আয়োজন। প্রাচীন শহরের এ এক প্রাচীন ঐতিহ্য।

বর্ধমানের তিনটি সায়র। শৈশবে বাবার হাত ধরে কতবার ঐ তিনটি সায়র পরিক্রমা করেছি, তার হিসাব নেই। রানীসায়র এবং কৃষ্ণসায়রের কথা এখন মুলতুবি থাক, ফিরে যাই শ্যাম সায়রের তীরে। 'সায়র' মানে বড় জলাশয়।

এই শ্যামসায়রের ঈশান কোণেই দিব্য আসন পেতে আসীন আছেন স্বয়ং ঈশানেশ্বর। এ হলো শিবঠাকুরের পীঠ। ঐ মন্দিরের দিকে দেখিয়ে আমার বাবা বলতেন: 'জানিস, ঐ মন্দিরে ঠাকুর এসেছিলেন।'

'—ঠাকুর? শিবঠাকুর নিজেই তো এক ঠাকুর, সেখানে আবার অন্য ঠাকুর এলেন কোথা থেকে? আর কেই বা সেই ঠাকুর?' শৈশবের প্রদোষে আমার প্রশ্ন শুনে বাবা হেসে উঠেছিলেন সেদিন। বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তিনিও ঠাকুর, মানুষ ঠাকুর। কোন কোন মানুষ নিজের মহিমায় ঠাকুর হয়ে যান। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন।'

প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অঙ্গন। তারই মধ্যে একরত্ন শৈলীর এই মন্দিরটি স্থাপিত। মন্দিরের লাল রঙ করা চূড়াটি দেখে মনে হয় যেন টালির ওপর টালি সাজিয়ে মন্দিরের শীর্ষদেশ তৈরি করা হয়েছে। উচ্চতা কত হবে? ২০ ফুটের কম নয়। সামান্য কিছু বেশি হলেও হতে পারে। এই মন্দিরটির এমনই একটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সৌন্দর্য আছে—যা সহজেই নজর কাড়ে, মনকে টানে, আমাকেও টেনেছে বারবার। যেমন শৈশবে তেমনি আজও।

বিশেষ করে যখনই জেনেছি, এই মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, দেবাদিদেব ঈশানেশ্বরের পূজো করেছিলেন, তখন থেকেই এই মন্দিরটি আমার কাছে এক নতুন মহিমায় উদ্ভাসিত। জেনেছিলাম, অবতারবরিষ্ঠের এটিও এক লীলাক্ষেত্র।

মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গ পাওয়ার ঘটনাটিও চিত্তাকর্ষক। সেটি পরে বলছি। তার আগে বলি, বর্ধমানের কীর্তিমান রাজাদের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অপরূপ পূজার কাহিনীটি।

তখন বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেন চলতে শুরু করেছে। হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত রেলপথ তৈরি হয়েছিল ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে। তার কিছুকাল পরেই হাওড়ার সঙ্গে বর্ধমানের রেলপথে সংযোগ সাধিত হয়েছিল। সেসময় শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যেতেন বর্ধমান হয়ে। কামারপুকুর থেকে উচালন, একলক্ষী হয়ে একটা পথ ছিল বর্ধমান পর্যন্ত। ঐ পথে পায়ে হেঁটে কিংবা গরুর গাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুর থেকে বর্ধমানে আসতেন, বা বর্ধমান থেকে কামারপুকুরে যেতেন।

সেবার তিনি দেশ থেকে দক্ষিণেশ্বর ফিরছেন। সঙ্গে রয়েছেন ভাগ্নে হৃদয়। 'পুঁথি'র বর্ণনা পড়ে মনে হয় তাঁরা পথে বর্ধমানে এসে থেমেছেন। কিন্তু বিশ্রাম করবেন কোথায়? তিনি হৃদয়কে নিয়ে সোজা এসে উঠলেন এক পান্থশালায়। আমাদের মনে হয়

এই পান্থশালা হলো ঈশানেশ্বর মন্দির-সন্নিহিত অতিথিশালা। এই অতিথিশালা থেকে বর্ধমান স্টেশনও খুব দূরে নয়—এক মাইলের মতো রাস্তা। তাই এখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় যাওয়া ছিল সুবিধাজনক।

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের বর্ণনা অনুযায়ী অন্ততঃ দুবার দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ গরুর গাড়িতে চড়ে কামারপুকুরে যাচ্ছেন। কিন্তু সেবার বর্ধমানে এসেছিলেন কিভাবে? সম্ভবতঃ সেবারও তিনি গরুর গাড়িতেই বর্ধমানে এসেছিলেন এবং ভাতছালার বাঁকা নদীর সেতু পেরিয়ে শহরে গিয়েছিলেন।

অক্ষয়কুমার সেন রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির (পৃঃ ১৪০-১৪১) বর্ণনা থেকে জানতে পারি, ঈশানেশ্বর মন্দির-সন্নিহিত মাঠের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ এক কাঁটাবন দেখে খুব উল্লসিত হন। অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন:

"কি এক কণ্টক তার নাম নাহি জানি।
পূজিলে তাহায় বড় তুষ্ট শূলপাণি॥
*
তাঁহার করম কার্য বুঝা মহাদায়।
কণ্টক লইয়া মত্ত হইলা পূজায়॥
আবেশে মহেশ পদে কণ্টক প্রদান।
দেখিয়া হৃদুর হয় আকুল পরাণ॥"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে স্পষ্টভাবে বর্ধমানের ঈশানেশ্বর মন্দিরের কথা উল্লেখ করা না হলেও এটা যে এই মন্দিরেরই ঘটনা, তা ধরে নিতে পারি। প্রথমতঃ পুঁথিতে কাছাকাছি যে বড় স্টেশনের কথা বলা হয়েছে যেখান থেকে হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরেছিলেন তা নিশ্চয়ই বর্ধমান। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঈশানেশ্বর মন্দিরে এসেছিলেন তা বর্ধমানের বৃদ্ধদের কাছ থেকে জানা যায়। শোনা যায় মন্দিরে শিবপূজা করতে করতেই অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এটাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বর্ধমানের প্রাচীন মানুষদের সূত্রে জানা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশানেশ্বর শিবপূজা আরও একটি কারণে স্মরণীয়। ব্যাপারটি পুঁথির বর্ণনাতেও সমর্থিত। শিবপূজা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এতই তন্ময় হয়ে যান যে, হৃদয় বহু ডাকাডাকি করেও তাঁর সেই তন্ময়তা ভাঙাতে সমর্থ হন না। এদিকে কলকাতার ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে। পুঁথির বর্ণনা:

পূজার মরম-কথা হৃদু নাহি জানে।
বড় ডাকে মত্ত প্রভু কেবা ডাক শুনে॥
*
ইতিমধ্যে সেদিনের নিরূপিত গাড়ি।
চলে গেল যাস যেন ইস্টেশান ছাড়ি॥
যতক্ষণ পূজা সাঙ্গ না হইল তাঁর
উঠাতে না পারে হৃদু বড়ই বেজার॥
কতক্ষণ পরে প্রভু আইলা আপনি।
হৃদয় বলেন কোথা কাটাবে যামিনী॥
গাড়ি চলে গেল আজ হইবে থাকিতে।
কেবা হেথা আত্মজন কোথা রবে রেতে॥
আপনে আছেন প্রভু না দেন উত্তর।
হৃদয় আসিল ইস্টেশানের ভিতর॥
কর্মচারী জনৈকে জিজ্ঞাসে বসে চিতে।
আজ কি পাইব গাড়ি কলিকাতা যেতে॥
প্রভুর আশ্চর্য খেলা কহিতে না পারি।
নাহি অন্য গাড়ি আজ কহে কর্মচারী॥
তবে এক আলাহিদা গাড়ি স্বতন্তর।
কাশী থেকে ছাড়িয়াছে তারের খবর॥

এই বিশেষ সেলুনটিতে রেলের একজন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী কাশী থেকে কলকাতা আসছিলেন। তাতে অন্য কোন যাত্রীর যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্ধমান স্টেশনের সেই সহৃদয় রেলকর্মচারীটি শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয়কে তাতে উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

শিবচতুর্দশীর দিন এই মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসেন শিবের চরণে সেবা লাগাতে। আগের মতো বড় মেলা এখন আর হয় না। কিন্তু আজও এখানকার মেলার ঐতিহ্য সুবিদিত।

এবার আমরা ঈশানেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তটি স্মরণ করতে পারি।

আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন সময়ে ঈশানেশ্বর মন্দির স্থাপিত হয়। আগেই বলেছি সেসময় ছিল বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদের আমল। মহারাজ তেজচাঁদ তাঁর মা বিষণকুমারী দেবীর নামেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেন। বিষণকুমারী ছিলেন মহারাজ তিলকচাঁদের পত্নী। জনশ্রুতি, শ্যামসায়র যখন কাটা হয় সেসময় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে শ্যামসায়রের ঈশান কোণে এই পাথরের স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গটি পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং গোটা বর্ধমান শহরে সাড়া পড়ে যায়। লোকমুখে সেখবর একসময় রাজবাড়িতে চলে যায় এবং মহারাজা তেজচাঁদের কানেও পৌঁছায়। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। খবর পাওয়া মাত্র তিনি ঐ শিবলিঙ্গ দর্শন করতে লোকজন নিয়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হন। লিঙ্গটি দেখে মুগ্ধ হন তিনি। কয়েক দিনের ভিতরেই ওখানে 'ঈশানেশ্বর' নামে দেবতার অভিষেক ও পরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেন। দেবতার সেবার যাবতীয় খরচ তিনি রাজকোষ থেকে বহন করেন। যতদিন বর্ধমানের রাজারা রাজত্ব করেছেন ততদিন বর্ধমানের রাজপরিবারই ঐ মন্দিরের এবং দেবতার সেবা ও পূজার সমস্ত খরচ বহন করে আসতেন।

এখানে একটু শ্যামসায়রের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনেই শ্যামসায়র অবস্থিত। পূর্বে এই হাসপাতাল বিজয়চাঁদ মহাতাব হাসপাতাল নামে পরিচিত ছিল। মাত্র কিছুদিন আগেও ঐ বিশাল পুকুরের চারিপাশে উঁচু মাটির ঢিবি ছিল। তার নিদর্শন অবশ্য এখনও আছে।

মন্দিরসংলগ্ন অতিথিশালাটি নির্মাণ করেন বিজয়চাঁদ মহাতাব। বিজয়চাঁদ মহাতাব তাঁর মা প্রণয়দেবীর নামে অতিথিশালাটি নির্মাণ করে দেন। প্রণয়দেবী ছিলেন রাজাবাহাদুর বনবিহারী কপূরের স্ত্রী।

ঈশানেশ্বর মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত দেবদত্ত তেওয়ারী। তাঁর পুত্র রামনাথ তেওয়ারী জানালেন, ঈশানেশ্বর ঠাকুরের অনেক জায়গা এখন অন্যেরা দখল করে নিয়েছেন। ঠাকুরের ফুলবাগিচাও এখন বিক্রি হয়ে গেছে। ঠাকুরমন্দিরের সংলগ্ন মন্দিরের পুরোহিতদের সমাধিস্থলও এখন অপরের হস্তে চলে গিয়েছে।

ঈশানেশ্বর মন্দিরের সেই সুদিন আর নেই। শ্যামসায়রের সেই নির্জন মাধুর্যও আজ হারিয়ে গিয়েছে। অথচ এই মন্দিরে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, তেমনি, শোনা যায়, এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষাগুরু বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তোতাপুরীও। এ-ও এক বিস্ময়কর যোগাযোগ।

আগেই বলেছি, ঈশানেশ্বর মন্দিরে আজও শিবচতুর্দশীর ভিড় হয়। কিন্তু সেভাবে সেখানে আর গণপ্রাণের প্রতিষ্ঠা হয় না। একসময় বর্ধমানের রাজারা তাঁদের রাজ্যের যত প্রাচীন দেবপীঠ ছিল—সবগুলি সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন, ধর্মীয় উৎসবগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। কিন্তু আজ সেসব কে করবে?

একদা পূর্বভারতের প্রাচীনতম সভ্যনগর ছিল এই বর্ধমান। আজ সেই ঐতিহ্যের দীপশিখাটি জ্বলছে অজস্র নিয়ন আলোর রোশনাইকে উপেক্ষা করেও।

সেদিন যখন ঈশানেশ্বর মন্দিরে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম, শ্যামসায়রের জলে তখন পড়ন্ত রোদের শেষ আভা। প্রশান্ত জলের বুকে তখন ক্লান্ত অবসন্নতা। সেদিকে তাকিয়ে বারবার মনে হচ্ছিল, ষষ্ঠ খ্রীস্টপূর্বাব্দে এই বর্ধমানেই তো ভগবান মহাবীর বর্ধমান এসেছিলেন। কুলীন গ্রাম থেকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই বর্ধমানেরই কানাই নাটশালে এসেছিলেন। এই তো সেদিন এই শ্যামসায়রের পথ ধরেই ঈশানেশ্বর মন্দিরে এসেছিলেন অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ। বর্ধমানের পথে পথে মিশে রয়েছে তাঁদের পায়ের ধূলি। আমরা সেই ধূলির ওপর দিয়ে আজ হাঁটছি।

এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম। পথ থেকে তুলে নিলাম একমুঠো ধূলি। সেই ধূলিতে পেলাম যেন পবিত্র চন্দনের সৌরভ। চোখ বুজে মাথায় ঠেকালাম।

আমার জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়

বেঙ্গল ভলান্টীয়ার্স-এর সদস্যা উজ্জ্বলা মজুমদার (বেঙ্গল ভলান্টীয়ার্স-এর প্রখ্যাত সাংগঠনিক নেতা এবং 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব', 'সবার অলক্ষ্যে' প্রভৃতি বিপ্লব-ইতিহাসগ্রন্থ-প্রণেতা ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়) বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। তিরিশের দশকের প্রথম দিকে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন।

১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাস। বাংলার কুখ্যাত গভর্নর স্যার জন এ্যান্ডারসন দার্জিলিং-এ গ্রীষ্মযাপন করছেন। তাঁকে হত্যা করার জন্য বেঙ্গল ভলান্টীয়ার্স-এর দুই সদস্য ভবানী ভট্টাচার্য এবং রবি ব্যানার্জী দলের নির্দেশে জয়দেবপুর থেকে সোজা দার্জিলিং চলে এসেছেন। তাঁদের সাহায্য করতে আরো যে দুজন সদস্যকে দার্জিলিং-এ দল পাঠিয়েছিল তাঁদের অন্যতমা ছিলেন উজ্জ্বলা মজুমদার। তিনি ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে দার্জিলিং গিয়েছিলেন। উজ্জ্বলা একটি হারমোনিয়ামের মধ্যে এনেছিলেন দুটি আগ্নেয়াস্ত্র। তিনি যথাসময়ে আগ্নেয়াস্ত্র দুটি ভবানী ও রবির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ৮ মে দার্জিলিং লেবং ময়দানে এ্যান্ডারসন ঘোড়াদৌড় অনুষ্ঠানে পুরস্কার দিচ্ছেন। রবি ও ভবানী সেখানে এ্যান্ডারসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। বিচারে রবির দ্বীপান্তর ও ভবানীর ফাঁসির আদেশ হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন উজ্জ্বলা।

'স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম' সম্পর্কে জীবিত প্রবীণ বিপ্লবীদের বক্তব্য সংগ্রহ করছি বলে উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়ের সঙ্গেও আমি যোগাযোগ করি। শুনেছিলাম প্রবীণা এই মুক্তি-সংগ্রামী (জন্ম ১৯১৫) বার্ধক্য এবং অসুস্থতার জন্য শারীরিক দিক থেকে অপটু হয়ে পড়েছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কারণে আমার অনুরোধে অপটু শরীর নিয়েও তিনি কলম ধরেছেন এবং তাঁর বক্তব্য একটি প্রবন্ধের আকারে আমার কাছে লিখে পাঠিয়েছেন। প্রবন্ধটিতে তাঁর স্বাক্ষরের তারিখ ০১. ১২ ১৯৮৯। উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ এবং রচনাটি সংগ্রহ করার ব্যাপারে বেঙ্গল ভলান্টীয়ার্স-এর সদস্য, প্রাক্তন মুক্তি-সংগ্রামী এবং পরবর্তী কালে মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নেতা অমলেন্দু ঘোষ আমাকে সাহায্য করেছেন। অমলেন্দু ঘোষ উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়ের স্বামী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের আপন ভাগ্নে। স্বামী বিবেকানন্দ কি পরিমাণে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কোন্ গভীরে তাঁর জীবন ও বাণীর প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের এই অগ্নিকন্যার রচনায় আমরা তার পরিচয় পাব। —স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

বর্তমানে রোগে জরাজীর্ণ ও অচল দেহ আমার। সেই সঙ্গে মনের সক্রিয়তাও স্বভাবতই হারিয়েছি। তাই এই ৭৫ বছর বয়সে ফেলে-আসা অতীতের পুরনো কথা, জানি না কতটা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পেরেছি। যাই হোক, 'উদ্বোধন'-এর যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজীর একান্ত অনুরোধে চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব সে-স্মৃতি উদ্ধার করতে। আমি লেখক নই। শুধু 'বেণু'র অনুবর্তী বর্তমানের 'রাখাল বেণু' পত্রিকায় কিছু স্মৃতিচারণ করেছিলাম।

পরাধীনতার গ্লানিতে ভরা আমাদের কৈশোরের দিনগুলি, তবু এর মধ্যে আমাদের চলার পথে একটা আদর্শ ছিল। ছিল দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন। আরও ছিল স্বাধীন দেশের রঙিন স্বপ্ন দেখার মানসিকতা। এসবই সম্ভব হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের কাছেই দেশ থেকে বিদেশী শাসকদের বিতাড়িত করার প্রেরণামন্ত্রে দীক্ষিত আমাদের সকলের 'বড়দা' হেমচন্দ্র ঘোষের (১৮৮৪-১৯৮০) 'মুক্তিসঙ্ঘ' তথা পরবর্তিকালীন 'বি. ভি.' বা 'বেঙ্গল ভলান্টীয়ার্স' দলের সংস্পর্শে এসে।

তখনকার দিনে মন্ত্রগুপ্তির সাথে সাথে ছিল চরিত্রগঠনের কাজ। ছিল মনকে দৃঢ় করা ও সংকল্পে অটল থাকার সাধনা। কাজেই আমরা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, ভগিনী নিবেদিতার ত্যাগ ও সেবার আদর্শ এবং গীতার নিষ্কাম কর্মকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। স্বামীজীর সেই আহ্বান: "তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত"—মন্ত্রের মতো আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিত। ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের যেকোন উৎসবে তাই যোগদান করা আমরা কর্তব্য বলে ধরে উৎসাহের সঙ্গে যেতাম।

তখনকার দিনে পিতামাতার অগোচরে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কাজে যোগ দেবার যৌক্তিকতার যে মানসিক চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল তার মূলেও ছিল স্বামীজীর ঐ মন্ত্রশক্তিরই প্রেরণা ঃ আমি অন্যায় করছি না—কাউকে প্রতারণাও করছি না—দেশমাতৃকার পাদমূলে আত্মসমর্পণের এক মহাসুযোগ গ্রহণ করছি মাত্র।

আমার বাবা সুরেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন অত্যন্ত সংস্কারমুক্ত স্বাধীনচেতা ব্যক্তি। তাছাড়া বি. ভি. দলের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগও ছিল। নানা দিক থেকে দলের বিশেষ resourceful সভ্য ছিলেন তিনি। আমার সুবিধা ছিল সেইখানেই।

তাঁর অজান্তে ধীরে ধীরে আমি 'বি ভি.' দলে ঢুকে গেলেও একদিক থেকে দেখতে গেলে দলীয় প্রয়োজনে আমার বাবা-ই কিন্তু আমাকে হাতে-কলমে বিপ্লব-কর্মের প্রথম পাঠ দিয়েছিলেন। বাবার নির্দেশেই একবার বাবার সঙ্গে কলকাতা থেকে ঢাকা আসার সময় বুকে রিভলভার লুকিয়ে এনেছিলাম। আমাদের ঢাকার ১১নং লক্ষ্মীবাজারের বাসাটি ছিল বিপ্লবীদের একটি 'শেলটার'। এখানে অস্ত্র-শস্ত্রও যেমন থাকত, তেমনি স্বাভাবিক ও পলাতক জীবনেও এখানে অনেক বিপ্লবী অজ্ঞাতবাস করেছেন। এঁদের মধ্যে রসময় শূর (ইনি পরে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দীক্ষাও নিয়েছিলেন), ভূপতি রায় ও নিকুঞ্জ সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। আমার বাবা-ই এঁদের ছদ্মনাম দিয়েছিলেন। আমরা ভাই-বোনেরা ছেলেবেলায় বাবার ভাই জ্ঞানে এঁদেরকে যথাক্রমে হিরণ্ময়কাকু, মুরারিকাকু ও নিকেশকাকু বলেই ডাকতাম। এই শেলটারের ব্যাপারে আমার বাবার অপর ব্যবসাকেন্দ্র কলকাতাস্থ ৭নং ওয়ালিউল্লা লেনের গৃহটিও ছিল একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। ঢাকায় লোম্যান মার্ডার ও হডসন শ্যুটিং-এর পর ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে ভূপতিদার (রায়) সঙ্গে পলাতক বিনয় বসু এখানেই এসে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিলেন। অবশ্য আমি তখন ঢাকায়।

হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম। আমাদের ঢাকার বাসায় 'বি. ভি.' দলের যাঁরা আসতেন বা থাকতেন, যাঁদের মাধ্যমে আমি দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি, তাঁদের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জড়িত হবার প্রারম্ভে মনকে তৈরি করার জন্য নানা আলাপ আলোচনা তো হতোই, তাছাড়া তাঁদের দেওয়া নানা বই আমাকে দেশের শৃঙ্খলমোচনের কাজে যুক্ত হবার প্রেরণা দিয়েছে। সেই বইগুলির মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, পত্রাবলী, ভাববে বিবেকানন্দ এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের ভক্তিযোগ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বুঝি বা না বুঝি, মনোযোগ দিয়েই সেসব বই পড়তাম। স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা ও তাঁর বাণী এবং সর্বোপরি তাঁর সেই বীরত্বব্যঞ্জক মুখমণ্ডল ছিল এক মহাশক্তির আধার।

আমাদের ছেলেবেলায় ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে গেলেও এবং অনেকটা প্রথাগতভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মা ঠাকুরানীর প্রতিকৃতির কাছে নিয়মিত প্রণাম জানালেও তাঁদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তেমন কিছুই অবহিত ছিলাম না। অনেক পরে স্বামীজীর উৎস সন্ধানে গিয়েই তাঁদের কিছুটা বোঝার চেষ্টা করেছি।

আমার 'বি. ভি.' দলে অন্তর্ভুক্তির পর ক্রমে ক্রমে আমাদের বাসায় 'বি. ভি.' দলের 'মেজদা'—বড়া অস্ত্র লুণ্ঠনখ্যাত হরিদাস দত্ত, হরিদাস রায়, ১৯৩০-১৯৩৩-এর পরিসরে 'বি. ভি'-র বিভিন্ন এ্যাকশনের সঙ্গে জড়িত প্রফুল্ল দত্ত (ফুলদা), বীরেন ঘোষ, আমাদের লেবং গভর্নর শ্যুটিং মামলায় দণ্ডিত সুকুমার (নান্টু) ঘোষ, মধু ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, সুশীল চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘমেয়াদী সাজা সহ এঁরা সবাই আন্দামানে প্রেরিত হয়েছিলেন।

সেযুগে মেয়েদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কোন বৈপ্লবিক কাজে অংশ নেওয়া খুবই কঠিন ছিল। পুলিসের বাধার থেকেও বাড়ি বা পরিবারের বাধাই ছিল প্রবলতর। তবু যে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর বিশ্বাসযোগ্য গল্প বানিয়ে বাড়ি ছেড়ে মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে হারমোনিয়ামের ভিতরে দুটি রিভলভার ও বেশ কিছু কার্তুজ লুকিয়ে নিয়ে দার্জিলিং-এ পেঁৗছে তদানীন্তন বাংলার গভর্নর স্যার জন এ্যান্ডারসন-এর ওপর আক্রমণের জন্য সেগুলি পূর্বব্যবস্থামতো

জগদেবপুর থেকে আলাদা ব্যাচে আগত ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জীর হাতে তুলে দিতে পেরেছিলাম এবং পরে পলাতক অবস্থায় কলকাতায় ধরা পড়ার পর জিজ্ঞাসাবাদ, identification parade, বিচার ও দীর্ঘ সশ্রম কারাবাসের ধকল শান্ত মনে সামলে চলার শক্তি পেয়েছিলাম, তার মূলে নিশ্চয়ই ছিল স্বামীজীর সেই বাণী—"তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত"। অবশ্য শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের সম্পাদিত দলীয় মাসিকপত্র 'বেণু' ও তাঁরই লিখিত 'চলার পথে' শীর্ষক গল্পগ্রন্থটিও আমাদের পথ চলায় বিশেষ শক্তি জুগিয়েছিল। এ্যান্ডারসন শ্যুটিং মামলায় রবি ব্যানার্জীর দ্বীপান্তর এবং ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী জেলে ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়। আমি তখন সেই রাজশাহী জেলেরই জেনানা ফাটকে কয়েদ খাটছি। শহীদ ভবানীর স্মৃতি আমার কাছে আজও অম্লান। আদালতে তাঁর সেই দৃপ্ত ভঙ্গি এবং সেই বিখ্যাত উক্তিঃ "I am sorry that His Excellency is still living" কখনোই ভোলার নয়। ফাঁসির আগে এই ভবানীই তার ছোট ভাইকে চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "অমাবস্যায় শ্মশানে ভীরু ভয় পায়, আর সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ করে।" কলকাতার এ্যান্ডারসন ভবনের 'ভবানী ভবন' নামকরণ শহীদ ভবানীরই স্মৃতিতে। বলা বাহুল্য, ভবানী এবং সকল মুক্তি-সংগ্রামীই স্বামীজীর বাণীতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রথম কারাবাসের সময় অবশ্য এত কিছু ভাবিনি। মানে ভাবার অবসর হয়নি। বিপ্লবীদের কয়েদী জীবন তখন বড়ই কঠিন ছিল। প্রেসিডেন্সী, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, রাজশাহী, মেদিনীপুর, দিনাজপুর সব জেলেই একই ব্যবস্থা। তবে ১৯৪২ এ যখন দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হয়ে ভারতরক্ষা আইনে সিকিউরিটি প্রিজনার হিসাবে কারারুদ্ধ হই তখনই এসব চিন্তাভাবনার অবসর হয়েছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জেলে মার্কসীয় পুস্তকাদি কিছু পড়লেও আমরা কিন্তু স্বামীজীর চোখ দিয়েই দেশের 'দরিদ্রনারায়ণ'দের দেখেছিলাম এবং মনের দিক থেকে তাঁর সেবামন্ত্রেই দীক্ষিত ছিলাম। মার্কস্-এর Class Struggle বা শ্রেণী সংগ্রাম আমাদের আকর্ষণ করেনি। ১৯৩৮-এ মহাত্মা গান্ধীর হস্তক্ষেপের ফলে বৈপ্লবিক কাজে দণ্ডিত মহিলা বন্দিগণ মুক্তি পেয়ে কেউ কেউ কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন ঠিকই, তবে আমি চিরকালই জাতীয়তাবাদীই আছি। স্বামীজী-নির্দেশিত 'ভারতমাতা'ই আমার উপাস্য।

১৯৪৬-এ জেল থেকে বেরিয়ে যখন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন স্কুলে শিক্ষিকা-রূপে যোগ দিই তখনো এই ভেবে আমার আনন্দ হয়েছে যে, এই সেই স্কুল যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন ছাত্র ছিলেন।

ভারতের 'তথাকথিত' স্বাধীনতার পর বিবাহ-সূত্রে আমি যে-পরিবারে এলাম তাঁরা অধিকতর সংস্কৃতিবান ও সংস্কারমুক্ত ছিলেন। আরো আনন্দের কথা এই যে, তাঁরা প্রায় সকলেই রামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষিত ছিলেন। ঢাকাতে স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ (খোকা মহারাজ) তাঁদের দীক্ষা দিয়েছিলেন। আমার এক বড় ননদ প্রতিভা দেবীর কাছে সেই অমৃতময়ী 'মায়ী' সম্বোধন সহ স্বামী সুবোধানন্দ-জীর ১৯২৪ থেকে ১৯২৬-এর পরিসরে লেখা প্রায় ৪০ খানা চিঠি এখনো আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ হিসাবে রক্ষিত আছে। এর অনেকগুলো 'উদ্বোধন'-এ ১৩৭৪ থেকে ১৩৭৮-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'বি. ভি.'র একজন প্রথম সারির ব্যক্তি আমার স্বামী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত না হলেও স্বভাবতই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরম অনুরাগী ছিলেন। স্বামীজীর জীবন ও বাণী ছিল তার আদর্শ এবং প্রেরণার উৎস। স্বামীজীর ভাবানুসারী জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁরও জীবনের মূলমন্ত্র। আমার জীবনে তাই কোনদিনই আদর্শের সংঘাত আসেনি।

বেলুড় মঠে আমি বহুবার গিয়েছি। কিন্তু বেশ পরিণত বয়সে হঠাৎ একদিন দীক্ষা নেবার সুযোগ এল। আমার পরম সৌভাগ্য যে, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ আমাকে অনুগ্রহ করে দীক্ষা দেন।

বছর পাঁচ-ছয় আগে ভরত মহারাজ একদিন বীণা দাস (বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন

শ্যুটিং-খ্যাত) ও আমাকে বেলুড় মঠে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমার একান্ত দুর্ভাগ্য যে, অসুস্থ থাকায় আমি যেতে পারিনি। বীণাদি গিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সব শুনেছিলাম। আমি পরে ক্ষমা চেয়ে ভরত মহারাজের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন। সেই ভরত মহারাজও তো সেদিন চলে গেলেন। জীবনে আর দেখা হলো না। স্বাধীনতা-উত্তর কালে এঁরা ছিলেন আমাদের কাছে স্বামীজীরই প্রতিভূ।

জীবনের প্রান্ত বেলায় এসে এখন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার কথা তো ভাবিই, আর বিশেষ করে ভাবি স্বামীজী ও তাঁর মানসপুত্র নেতাজীর কথা।

সেই ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে আমাদের 'বড়দা' হেমচন্দ্র ঘোষকে স্বামীজী বলেছিলেন: "পরাধীন জাতির কোন ধর্ম নেই। তোদের এখন একমাত্র ধর্ম হলো মানুষের শক্তি লাভ করে আগে পরস্বাপহারীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া।" 'বড়দা' বলতেন: "আমরা জীবনভর এই গুরুবাক্যই অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।"

[গত ১০ মে ১৯৯০ আমি শ্রীমতী রক্ষিত রায়কে একটি চিঠি লিখি। তাতে আমি তাঁর কাছে দুটি প্রশ্ন রেখেছিলাম। শ্রীমতী রক্ষিত রায় তাঁর শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও ৩১ মে ১৯৯০ আমার প্রশ্ন দুটির উত্তর দিয়ে তিনি স্বয়ং যে চিঠি আমাকে দিয়েছিলেন নিচে তা উপস্থাপিত হলো।] —স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ
যুগ্ম সম্পাদক
উদ্বোধন,
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০০০৩

৩১ মে ১৯৯০

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ১০ মে-র চিঠিতে আমার কাছে দুটি প্রশ্ন রেখেছেন: (১) ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের আদি ও মধ্যপর্বে (১৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত) এবং জাতীয় জাগরণের উন্মেষে স্বামীজীর প্রভাব সর্বাধিক বলা যায় কি এবং গেলে কেন?

(২) বিপ্লবীদের চরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন প্রভাব ছিল কি? আমি এখানে এ প্রশ্ন দুটির উত্তর দেবার চেষ্টা করছি:

(১) পরাধীন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে যেসব কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী বিন্দুমাত্রও অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের চরিত্র-গঠনে ও মনের দৃঢ়তায় এবং আত্মত্যাগের প্রেরণায় স্বামীজীর প্রভাব সর্বাধিক বলেই মনে হয়। দেশের জন্য স্বামীজীর সর্বস্ব ত্যাগের মন্ত্র তাঁদের কাছে ছিল এক চিরন্তন প্রেরণার উৎস। দরিদ্র, অজ্ঞ, মূর্খ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষের মানুষকে পরম স্নেহে বুকে টেনে নিয়েও স্বামীজী যেন আবার চাবুক মেরে তাদের কুসংস্কার থেকে, মোহনিদ্রা থেকে মুক্ত করে এক আলোকোজ্জ্বল জীবনে উন্নীত করতে চেয়েছেন। কাজেই আদি ও মধ্য উভয় পর্বেই স্বামীজী বিদ্যমান। শুধু তাই বা কেন, পাশাপাশি মার্কসীয় প্রভাব সত্ত্বেও স্বামীজীর প্রভাব অন্ত্য পর্বেও অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের নেতাজী-পর্ব পর্যন্তও বিদ্যমান।

(২) ঠাকুর ও স্বামীজী তো অভেদ। যেখানে ঠাকুর সেখানেই স্বামীজী, বা যেখানেই স্বামীজী সেখানেই ঠাকুর। তবে আমি আগেই বলেছি আমরা—বিপ্লবীরা ঠাকুরকে কিছুটা পরে চিনেছিলাম এবং চিনেছিলাম স্বামীজীরই মাধ্যমে। স্বামীজী তন্ত্রে-মন্ত্রে নিজেকে আটকে না রেখে ভারত-আত্মার বাণী প্রচারের জন্য দেশ-দেশান্তরে গিয়েছিলেন তা ঠাকুরেরই প্রেরণায়। আজ বড় অভাব সে-আদর্শের। তাই ভারতের দিকে দিকে আজ বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা এত মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছে। তরুণ ও যুবসমাজ দিশাহারা। ঠাকুর ও স্বামীজীর আদর্শে এদের যদি পরিচালিত করা যায় তবেই ভারত আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে—জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে। নমস্কারান্তে

ইতি,
উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়

১০৪ সি, কড়েয়া রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৭

একটি লকেটের অমর জীবন

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ১ ॥

কাহিনীটি শুনেছিলুম পূজনীয় ভরত মহারাজের (স্বামী অভয়ানন্দের) মুখে। স্থান—বেলুড় মঠে তাঁর অফিস ঘর। সময়—২৩ অক্টোবর ১৯৮০, সকাল ১০-১১টা। উপস্থিত—মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাদলবাবু), বিমলকুমার ঘোষ ও অন্য কয়েকজন এবং বর্তমান লেখক। (কাহিনীটি অন্য সময়েও ভরত মহারাজের মুখে শুনেছি)।

ভরত মহারাজ মিস ম্যাকলাউডের কথা বলছিলেন।

মহারাজ তখন কর্মীরূপে মায়াবতীতে আছেন। মিস ম্যাকলাউডও সেখানে। ওঁকে মহারাজরা 'ট্যান্টিন' বলতেন। একদিন তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো দ্রুতপদে এসে বললেন: "ভরত! ভরত! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে—আমার লকেট হারিয়ে গেছে। ওর মধ্যে স্বামীজীর মাথার কেশ ছিল। কি হবে ভরত? ও লকেট আমার চাইই। যেভাবে হোক, ওটি খুঁজে বার কর।"

ভরত মহারাজ দেখলেন, বৃদ্ধা কেঁদে-কেটে অস্থির। তাঁকে নানা কথায় আশ্বস্ত করার পরে, অদ্বৈত আশ্রমের সকলে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। কিন্তু সন্ধান পাওয়া গেল না। বৃদ্ধার ধারণা হলো, কেউ ওটি চুরি করেছে। তিনি পুলিসের নীচু মহলে এবং ওপর মহলে খবর পাঠাতে লাগলেন। পুলিসের ওপর মহলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। তাছাড়া তখন বৃটিশ আমল এবং তিনি মেমসাহেব। ফলে রীতিমতো সাড়া পড়ে গেল। অবস্থা দেখে ভরত মহারাজ খুব কড়া ভাষায় তাঁকে বললেন: "ট্যান্টিন, এ কী কাণ্ড বাধাচ্ছো তুমি? তোমার প্রিয় জিনিস হারিয়েছে ঠিকই। তাই বলে এইসব গরিব পাহাড়ী লোকদের উত্ত্যক্ত করবার ব্যবস্থা করবে? এরা নিরীহ, সরল। পুলিস এদের অকারণে নাজেহাল করবে!"

মিস ম্যাকলাউড বুঝলেন। তারপর ভরত মহারাজের দুটি হাত ধরে অতি কাতরস্বরে বললেন: "ভরত, ও-জিনিস আমার সর্বস্ব। ঐ প্রাণের জিনিসটিকে যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে—সে একমাত্র তুমি। ভাল করে খুঁজে দেখো।"

বৃদ্ধা প্রায় কাঁদতে-কাঁদতে বেলুড় মঠে ফিরে গেলেন। ভরত মহারাজ অনেক সন্ধান করলেন, কিন্তু হদিস মিলল না। কয়েক মাস পরে, একদিন এক পাহাড়ী কুলি, অদ্বৈত আশ্রমে সে কাজকর্ম করে—হাতে হারের মতো কী একটা ঝুলিয়ে নিয়ে এসে হাজির। বলল: "মহারাজ, এটি রাস্তার ধারে পড়েছিল। দেখুন তো, এখানকার কারো জিনিস কিনা?" মহারাজ দেখে চমকে উঠলেন। আরে, এ-যে ট্যান্টিনের হারানো লকেট। জিজ্ঞাসা করলেন "তুই এটা পেলি কি করে?" সে বলল, রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে দ্যাখে, কী একটা চিক্‌চিক্ করছে। পাতায় আর মাটিতে বাকি অংশ ঢাকা ছিল। মাটি সরিয়ে সে সেটি পেয়ে গেছে।

মহারাজ বুঝলেন, রাস্তায় হাঁটবার সময়ে মিস ম্যাকলাউডের গলা থেকে খুলে সেটি পড়ে গিয়েছিল লতাপাতার মধ্যে। পরে ধুলোয় চাপা পড়ে যায়। বর্ষার সময়ে মাটি ধুয়ে যাওয়ায় সেটিকে কুলি দেখতে পেয়েছে।

মহারাজ তখনি টেলিগ্রাম করে মিস ম্যাকলাউডকে শুভ সংবাদ জানিয়ে দিলেন। উল্লসিত মিস ম্যাকলাউড ফিরতি টেলিগ্রামে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আবিষ্কারক কুলিকে ২০০ টাকা পুরস্কার দেবার কথা বলে পাঠালেন।

ভরত মহারাজ কুলিকে ডেকে বললেন:

"ওরে, মেমসাহেব খুশি হয়ে তোকে ২০০ টাকা দিতে বলেছে। এই নে।"

কুলি—"আমি নেব কেন?"

মহারাজ—"তুই মেমসাহেবের সাধের জিনিস খুঁজে দিয়েছিস, তাই বকশিশ দিয়েছেন।"

কুলি—"ওটা দেখতে পেয়েছি, তাই এনে দিয়েছি। তার জন্য টাকা নেব কেন? জিনিস খুঁজে এনে দিলে কেউ টাকা নেয় বুঝি?"

মহারাজ—"মেমসাহেব ভালবেসে দিয়েছে, নিবি না কেন?"

কুলি—"না, নেব না।"

অনেক চাপাচাপি সাধাসাধির পরে কুলি শেষ পর্যন্ত ২২ টাকা নিতে রাজি হলো। জমি না বাড়ি, কি একটা ব্যাপারে তার ঐ টাকা দেনা হয়েছিল।

॥ ২ ॥

লকেটটি অলংকারমাত্র ছিল না। তার পিছনের ইতিহাস সুগভীর ভাবে ও অর্থে পূর্ণ। মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে শুনে সে-কাহিনী বলেছেন তাঁর বোনঝি ফ্রান্সেস লেগেট (একদা লেডি স্যান্ডউইচ)। কাহিনী এই ঃ

স্বামীজীর সময়ের কথা। মিস ম্যাকলাউড বোম্বাই-এ আছেন। একদিন দুটি তরুণ হিন্দু ছেলে এল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাদের এক-জনের ঘড়ির চেনে ঝুলছিল একটি নীলকান্ত মণি। বড়ো চমৎকার সেটি।

মিস ম্যাকলাউড বললেন ঃ "আহা, কী সুন্দর রঙ!"

ছেলেটি তখনি বলল ঃ "আপনি এটি নিন না!"

মিস ম্যাকলাউড একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন ঃ "সে কি, নেব কেন? না না, মোটেই নেব না।"

পরদিন সেই ছেলেটি একলা এল। একেবারে ধরে পড়ল, "এটি আপনাকে নিতেই হবে।" মিস ম্যাকলাউড পূর্ববৎ গররাজি।

মিস ম্যাকলাউড—"কি বলছ? অমন দামী জিনিসটা নিয়ে নেব? কেন নেব বলো?"

ছেলেটি—"আপনি আমাদের দেশের মানুষকে ভালবাসেন। তাই এই শ্রদ্ধার নিবেদন। আপনি নেবেন না?"

মিস ম্যাকলাউড নিলেন।

পরদিন ছেলেটির বন্ধু এল। সে বলল, "জানেন, আপনাকে আমার বন্ধু যা দিয়ে গেছে, তাই ছিল তার শেষ সম্পদ।"

মিস ম্যাকলাউড আর কখনো দুই বন্ধুর কোন একজনেরও দেখা পাননি।

এই ঘটনার সাত বছর পরে নিউইয়র্কে মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে ম'সিয়ে লালীক-এর দেখা হয়। লালীক সেকালে ফ্রান্সে এবং ইউরোপে প্রখ্যাত কারু-শিল্পী ও মণিকার। শিল্পের বিশ্বকোষে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছেন, এমন শিল্পী তিনি। লালীককে মিস ম্যাকলাউড রত্নটি দেখিয়ে তার প্রাপ্তির চমকপ্রদ ইতিহাস বললেন। তারপর অনুরোধ করলেন—ঐ মণিটি দিয়ে একটি রেলিকুয়্যারি (সাধুদের দেহাবশেষ বা পবিত্র বস্তুর আধার) তৈরি করে দেবার জন্য। মণিটি নিয়ে গিয়ে ম'সিয়ে লালীক এক বছর পরে লকেটটি তৈরি করে দিলেন।

অসাধারণ সেই সৃষ্টি। মহাবিশ্বের হৃদয়-রূপ যেন সেটি। আবছা নীল কাঁচে ফুটে আছে দুই দেবদূত; অর্ধস্বচ্ছ অস্থিযুক্ত তাঁদের পক্ষ; স্ফটিকের মেঘের উপরে নতজানু হয়ে তাঁরা হাতে ধরে আছেন আলোক-বিচ্ছুরিত নীলকান্ত মণিটিকে। অপরূপ!

লকেট পেয়ে মিস ম্যাকলাউডের আনন্দের সীমা নেই। বারবার কৃতজ্ঞতা জানালেন।

মিস ম্যাকলাউড—"ম'সিয়ে লালীক, এই শিল্পকর্মটির জন্য আপনাকে পারিশ্রমিক হিসাবে কী দিতে হবে?"

ম' লালীক—"কিছু দিতে হবে না। এটি আপনাকে আমার উপহার।"

মিস ম্যাকলাউড—"উপহার? কেন, কী কারণে?"

ম' লালীক—"কারণ, আপনি আমাদের দেশের মানুষদের—ফরাসিদের—এত ভালবাসেন।"

তিন মহাদেশ মিলিত হলো একটি রত্নে—এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপ। ভারতের এক অজ্ঞাতনামা যুবক, আমেরিকার মিস ম্যাকলাউড এবং ফ্রান্সের ম'সিয়ে লালীক।

কে মিলিয়ে দিলেন?

বিবেকানন্দ।

তিনি ভারতের এবং বিশ্বের। এবং মহাবিশ্বের। তাই তাঁর স্মৃতিচিহ্নভরা লকেটটিতে দেখা গেছে মহাবিশ্ব-ছবি—সেখানে অসীম প্রেমের নীলকান্ত রত্নকে ঊর্ধ্বে ধারণ করে আছেন—দুই দেবদূত।

॥ ৩ ॥

মিস ম্যাকলাউডের কাছে বিবেকানন্দ কখনো 'নব বুদ্ধ', কখনো শুধু অনন্ত আলোক।

তিনি বলেছেন ঃ

"স্বামীজী আমাকে অনুভব করিয়েছেন,
অনন্তে অবস্থিত আমি,
তার পরিবর্তন নেই, বিকাশ নেই,
তা চিরন্তন।

স্বামীজীর এই অসীমতাই বেঁধে
রেখেছে আমাকে।
তার নিম্ন—ঊর্ধ্ব—পার্শ্ব—
পৌঁছতে পারি না কোনখানেই।"

মিস ম্যাকলাউডের যাত্রাও তাই চিরন্তন। রত্ন-লাভ তাঁর ভবিতব্য। প্রথম রত্নলাভ হয় যখন বয়স মাত্র পাঁচ কি ছয়। ম্যাকলাউড পরিবার তখন ডেট্রয়েটে অবস্থিত। একদিন শিশুটি স্বপ্নে দেখল—বাগানের একটা বিশেষ জায়গা খুঁড়লে সে সোনা পেয়ে যাবে। ঘুম ভেঙেই ছুটল বাগানে—স্বপ্নে দেখা জায়গাটি খুঁড়ল—এবং সত্যই পেয়ে গেল একটি সোনার দুল।

মেয়েটি তার পর থেকে খুঁজেই চলল। পৃথিবীর অনেক রত্নই তার আশপাশে এসে জুটল—কোনটাই মনঃপূত হলো না। অবশেষে সে পেল—সেই অনন্য রত্নটি—যার জন্ম সুদূর গঙ্গার তীরে। রত্নটিতে বিশ্বভুবন ভরা।

এহেন সম্পদ নিয়ে একান্তে বন্দি হয়ে থাকার চরিত্র তিনি নন। "শোন শোন সুরলোকবাসী, / অমৃতের যে আছো সন্তান, / জানিয়াছি সেই অবিনাশী, / জ্যোতির্ময় পুরুষ মহান।" সুরলোকবাসী নিয়ে ওঁর ব্যস্ততা ছিল না। আগে অধিকার করতে হবে নরলোকবাসীদের।

মিস ম্যাকলাউডের কাজ দাঁড়াল—'শোন শোন' বার্তা কণ্ঠে তুলে নিয়ে সারা বিশ্বে ছুটে বেড়ানো—এক আশ্চর্য রত্নজ্যোতির বার্তা।

মিস ম্যাকলাউড বললেনঃ

"নির্ধারিত বিরাট ভূমিকা আমাকে নিতে হবে।
কোথায়, কিভাবে, তা জানি না।
কিন্তু স্বামীজীর সান্নিধ্যে বৃথা বাস করিনি,
বৃথা তাঁকে ভালবাসিনি।
তাঁকে জানা আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকার পাওয়া—
একই কথা।
আমার সমাধি-ফলকে লেখা থাকবে—
'সদা প্রস্তুত আমি।'
আমার অপেক্ষা করার সময় নেই
আজই আমার নির্ধারিত লগ্ন।"

মিস ম্যাকলাউড বছরের পর বছর বৃহৎ বিশ্বে ঘুরেছেন। বলা হতো, তিনি চাকার উপর বিশ্রাম নিতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রা নিজের কাছে রেখে দিতেন—বলা তো যায় না, স্বামীজীর কাজে কখন কোথায় বেরিয়ে পড়তে হয়!

তাহলে ঐ-যে নীলকান্ত মণির লকেটটি—মিস ম্যাকলাউডের কাছে যা বিবেকানন্দ-প্রতীক—তাকে রেখে যাবেন কোথায়?

নিবেদিতা সে-প্রশ্ন তুলেছিলেন। উত্তর তিনিই দিয়েছেন।

৪ঠা জুলাই ওঁদের জীবনে মহাদিন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই মর্ত্যজীবন থেকে স্বামীজীর মহামুক্তির দিন। তার দুই বৎসর পরে ১৯০৪-এর ৪ঠা জুলাই নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেনঃ

"এই সেই রাত্রি—স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের মহা-রাত্রি। 'এ এমন রাত্রি যাকে প্রাণমন দিয়ে স্মরণ করবেন ঈশ্বরের যত সন্তান আছেন এই পৃথিবীতে—সকলেই।' ক্রিস্টিন এখন একলা বসে আছে, সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমে একেবারে নিঃশেষিত, ছাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। আর আমি লেখার টেবিলে, কেবল ভাবছি, ভেবে চলেছি। আমার চিন্তা তোমারই দিকে ধেয়ে চলেছে—সমুদ্র-পথে তুমিও হয়তো একলাই রয়েছ।"

তারপর নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডের লকেট-প্রসঙ্গ আনলেন। তাঁর লেখা থেকে স্পষ্ট নয়, লকেটটি ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে কিনা। তবে লকেটের রেখাচিত্র তাঁর কাছে এসে গিয়েছিল—এবং সেটি যে কণ্ঠে ধারণ করা হবে, এই সংবাদও। নম্র-নত কণ্ঠে নিবেদিতা লিখলেনঃ

"মিস স্টাম-এর আঁকা তোমার 'রেলিকোয়্যারি'র ছবি আজ এসেছে। কী অপূর্ব সুন্দর! কী রহস্যময়! কী শান্ত মৌন! মঁসিয়ে লালীক যে ভাবে প্রতীকের ভাষায় চিন্তা করতে পারেন, দেখে ঈর্ষা হয়। কিন্তু একটা কথা বলি, যদি তোমার জায়গায় আমি থাকতুম তাহলে ও-বস্তু কণ্ঠে ধারণ করতে পারতুম না। দেওয়ালের কোন একটি জায়গা বেছে নিয়ে, সেখানে ওটিকে স্থাপন করে, নতজানু হয়ে, তাকিয়ে থাকতুম। কিন্তু তোমার পক্ষে তা তো সম্ভব নয়। তুমি যে যাযাবর পাখি। তোমার পক্ষে ওটিকে স্থাপন করার একটি স্থানই আছে—তোমার হৃদয়।"

মা সরস্বতী

স্বামী গোপেশানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন ঃ "ও সারদা, সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে।" শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বলেছেন —মা হচ্ছেন সরস্বতী—তখন সে-কথা শ্রদ্ধা সহকারে অনেকেই মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু যাঁরা ঠাকুরের সাথে মজা করতে চান তাঁদের কথাবার্তা একটু অন্য রকমের হবে—এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে।

শ্রীশ্রীমা লেখাপড়া জানতেন না বললে বিশেষ ভুল বলা হবে না। অথচ ঠাকুর মাকে একেবারে সরস্বতী বলে দিলেন! এটি কেমন হলো? সরস্বতীর কাছে আমরা শিক্ষা পাব, জ্ঞান পাব —বিশেষ করে এই বিজ্ঞানের যুগে যখন বিশ্ব-কর্মার রমরমা তখন যদি শিক্ষা দেবার প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত না হয়, তাহলে কি শিক্ষাদাত্রীকে বর্তমান যুগ সরস্বতী বলে মেনে নেবে?

প্রথমে শিক্ষা ও নিরক্ষরতার যোগাযোগ কোথায় খোলা মনে একটু ভেবে দেখা যাক। বেদ-উপনিষদের অতুলনীয় জ্ঞানভাণ্ডার যাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন তাঁদেরকে বৈজ্ঞানিক না বলে ঋষি বলা হয়। এটাই প্রচলন। ঋষিই বলুন আর বৈজ্ঞানিকই বলুন—তাঁরা কি নিরক্ষর ছিলেন? এ কথায় আপনারা এক সঙ্গে বলে উঠবেন—"প্রশ্নটাই ভুল, প্রশ্নটাই ভুল, তখন অক্ষরই আবিষ্কার হয়নি, নিরক্ষর শব্দটি তখন অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে ঢাকা ছিল।" আপনাদের কথা মেনে নিলে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, নিরক্ষর হলেও জ্ঞানী হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। যা প্রাচীনকালে সম্ভব ছিল তা বর্তমান কালেও সম্ভব। আমাদের অবশ্য জ্ঞান আহরণের জন্যে পড়াশুনা করতে হয়। কিন্তু সরস্বতীকেও যদি পড়তে হয় তাহলে তিনি কেমন সরস্বতী অমন সরস্বতীতে আমাদের দরকার নেই। আমরা জ্ঞান-স্বরূপিণীকেই সরস্বতী বলে জানি।

এবার শ্রীশ্রীঠাকুর কি বলতেন, শ্রীশ্রীমা কি বলতেন তারই এক-আধটা কথা নিয়ে চিন্তা কর যাক।—সংসারে পাঁকাল মাছের মতো থাকবে কারও দোষ দেখবে না, সকলকে আপন কর নাও। যে মহাসত্যগুলি মনুষ্য জীবনে নিতান্ত প্রয়োজন সেই কথাগুলিই ওরা অতি সহজ সরল ভাষায় বলে গেছেন। এজন্যেই কি শ্রীম সরস্বতী? কখনই নয়। শুধু বললে হবে কেন আগেই বলেছি বর্তমান যুগে সরস্বতীকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। আমরা সাধারণতঃ মনে করি বিজ্ঞান শিক্ষাটাই বৈজ্ঞানিকভাবে দেওয়া দরকার। অন কিছু শিক্ষা বৈজ্ঞানিকভাবে না দিলেও চলবে শুধু পড়ে গেলেই হলো অথবা বলে গেলেই হলো। আমরা জেনেছি—পড়ার থেকে শোন ভাল, শোনার থেকে দেখা ভাল। ছড়ায় বলে

পড়ার চেয়ে ভাল শোনা,
শোনার চেয়ে দেখা,
বস্তুটাকে দেখলে পর
সেই তো সেরা শেখা।

বৈজ্ঞানিকের দেখাতেই বিশ্বাস, তার জন্যেই তো 'ল্যাবরেটরি'-তে 'ডেমনস্ট্রেশন' দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আন কিছু দস্তা, ঢাল কিছু 'এসিড,' ভুরভুর করে 'গ্যাস' বের হবে। আগুন দাও, কেমন সুন্দর আলো জ্বলবে। একবার যে দেখেছে, সে-ই শিখেছে। তাই বলি 'ডেমনস্ট্রেশন

।ই। অন্ততঃ বৈজ্ঞানিকরা তো 'ডেমনস্ট্রেশন' ।বেনই।

সংসার-জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন কিনা । নিয়ে বিতণ্ডা চলতে পারে। কিন্তু মা যে ।লেন এতে কোন সন্দেহ নেই। সে কি রকম ীবন? খুবই গরিবের। কাপড় গিঁট দিয়ে ।রে পরের বাড়িতে ধান ভানতে যেতে হতো। কান দিন অন্ন জুটেছে তো নুন জোটেনি। ।ড়িতে কেউ বা আধ-পাগল আর কেউ বা ।রো-পাগল। ভাইদের কথা আর নাই বা ললাম। কারণ মা বলেছেন—কারও দোষ দেখো ।। বিশেষ করে ভক্তদের কাছে জয়রামবাটীর ।টি পর্যন্ত যখন 'চন্দন সমান'—অতি প্রিয় ও ।বিত্র বস্তু, তখন এ-ব্যাপারে বলতে হয়—মুখ, ।ই চুপ করে থাক, চুপ করে থাক। এই ।বির্ষহ সংসারে কেমন করে পাঁকাল মাছের তো থাকতে হয় তা মা একদিন নয়, দিনের পর ।ন, দীর্ঘদিন দেখিয়ে গিয়েছেন। সংসারীদের ।পযুক্ত স্থান সংসার, ওটাই তাদের কেল্লা, ।মন মঠ হচ্ছে সাধু-সন্ন্যাসীদের কেল্লা। ।ীকা জলেই ভাল থাকে। জল নৌকায় না ।কলেই হলো। মা সে-টি দেখিয়ে গেছেন। ময়বিশেষে মা অবশ্যই কৃত্রিম ফোঁস করেছেন। । না হলে পরমুহূর্তেই হেসে কুটিপাটি হবেন কন? মায়ের জীবনী যাঁদের পড়া আছে তাঁদেরই ।সব ঘটনা জানা আছে। সত্যি, সংসার নিয়ে । কি-খেলাই না খেলেছেন!

মা সকলকেই নিজের সন্তানজ্ঞানে ভাল-।সতেন এবং তার জন্যেই নিজের দরকার না ।াকলেও সকলের জন্যেই কতই-না ধ্যান-জপ-।পস্যা করেছেন। আমরা তো নিজের জন্যেই ।ার্থনা করে উঠতে পারি না। খুব বেশি হলে নিজের আশ্রমের জন্য, আর সংসারীরা নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের জন্য। ব্যস। পরের ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীর জন্যে আপনি কি কোন দিন প্রার্থনা করেছেন? অথচ মা এই সংসারে থেকেই এই সকল 'ডেমনস্ট্রেশন' দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। মা বিড়ালের সেবা করেছেন, গরুর সেবা করেছেন, পাখির সেবা করেছেন, ডাকাতের সেবা করেছেন, সাধুর সেবা করেছেন, শিষ্যের সেবা করেছেন, সাধুর সেবা করেছেন, গৃহীর সেবা করেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা তো করেছেনই। কেউ বাদ নেই। সেবার কথা উনি শুধু মুখে বলেননি, সেবার 'ডেমনস্ট্রেশন' দিয়ে গেছেন। এইভাবে বলা যেতে পারে যে, মা যা যা বলেছেন তা তা 'ডেমনস্ট্রেশন' দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। সুতরাং মাকে সরস্বতী বলতেই হবে। নান্যঃ পন্থাঃ। আর যিনি সরস্বতী তিনি তো সকলেরই মা। অন্য প্রমাণও আছে। স্মরণ করুন দাক্ষিণাত্যের ঘটনা। দাক্ষিণাত্যে অনেকে মাকে দর্শন করতে এসেছেন। তাঁরা বাঙলা ভাষা জানেন না। মা-ও তাঁদের ভাষা জানেন না। মা নীরব, তাঁরা কথা বলে চলেছেন। কিন্তু তাঁরা পরম পরিতৃপ্ত ও আনন্দ হৃদয় ভরে নিয়ে গেলেন। সব কথা বলা হয়ে গেল। কেমন করে এমন হলো? হবেই তো!

তিন-চার মাসের শিশু যে কথা বলা শেখেনি এবং কথা বুঝতে শেখেনি সে তার গর্ভধারিণীর কাছে কোন ভাষায় কথা বলে? অথচ গর্ভধারিণী সন্তানের কথা বোঝেন এবং শিশুও মায়ের কথা বোঝে। কোন ভাষার দরকার হয় কি? হয় না। অথচ শিশুই মাকে সর্বতোভাবে পায়। ঠিক ঠিক আসল মায়ের কাছে এলে এমন হবেই এবং এ 'ডেমনস্ট্রেশন'-ও মা অনেকবার দিয়ে-ছেন। তাই তো বলি—সরস্বতীমায়ী কী জয়!

প্রণাম

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর, আমি আপনার নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করি। ভীরু, দুর্বল, অক্ষম, অপদার্থ বলে নয়। গৃহ ছেড়ে সংন্যাসী হব বলেও নয়। মানুষ হব বলে আমি আপনার শরণার্থী। গৃহে থেকেও আমি আপনার অনুগামী, আর সেইটাই আমার গর্ব। এত বিক্ষিপ্ততা, এত চঞ্চলতা, এত প্রলোভন, কিন্তু সেই আপনারই নির্দেশ—'দেখিস, নিক্তির নিচের কাঁটা আর ওপরের কাঁটা, কাঁটায় কাঁটায় যেন এক হয়ে থাকে। ওপরের কাঁটা হলেন আপনি আর নিচের কাঁটা হলো আমার মন। অনুক্ষণ রামকৃষ্ণস্মরণ। তার অর্থ? রামকৃষ্ণ তো শুধু একটা নাম নয়—বেঁচে থাকার বিজ্ঞান। ষড় রিপুকে বাগে রাখার বল্গা। আর যেই বলেছি, আপনি আমার অহঙ্কার, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে—বাপকা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া, কুছ নেহি হায় তো থোড়া থোড়া। আপনি যার পিতা, তার কি বেচাল সাজে! ঠাকুর, চীন দেশে অনুপম একটা কথা আছে—ছেলে তার পিতাকে কতটা শ্রদ্ধা করে তা বোঝা যাবে পিতার দেহাবসানের পরে। কিভাবে? সন্তান তার পিতার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে কিনা! পিতার আদর্শে সে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে কিনা! পিতার জীবনধারা সে বজায় রাখতে পেরেছে কিনা! যদি পেরে থাকে তবেই সে সৎসন্তান। নয় তো সে ভ্রষ্ট। যতই সে ছবিতে মালা ঝোলাক আর জন্মদিন, মৃত্যুদিন পালন করুক। কিছুই কিছু নয়।

ঠাকুর আমি আপনার প্রকৃত অনুগামী হতে চাই। ভড়ং দেখিয়ে নয়। কাজে, স্বভাবে, আমার আচরণে। লজ্জাই হলো আমার দর্পণ! যেমন? লজ্জা দর্পণ হয় কি করে? যদি কেউ বলে—আরে ছি ছি—এই নাকি রামকৃষ্ণ-সন্তান? এই তার কাজ, এই তার কথা! লজ্জা। সেই দর্পণে আমার মলিন, ভণ্ডমুখের প্রতিফলন। আমার আচরণে আপনি যেন অপমানিত না হন। আপনি বলতেন—সাধু সাবধান। আমি নিজেকে বলি—রামকৃষ্ণ-সন্তান অতিশয় সাবধান। লজ্জা পেতে পেতে লজ্জা আর লজ্জা থাকে না, হয় অঙ্গভূষণ। অপমানিত হতে হতে অপমান আর অপমান থাকে না, হয় গলার পদক। লজ্জার দর্পণটি ভেঙে যায়। কথায় আছে এক কান-কাটা গ্রামের বাইরে দিয়ে যায়, দুকান-কাটা যায় ভেতর দিয়ে। তার তো আর কোনও লজ্জা থাকে না তখন।

আমি আপনার সম্মান বাড়াতে পারব না, অপমানের কারণ হব—এই আমার ভয়। এই ভয়ই আমার ব্রেক। যদি কেউ বলেন, আরে মুছে ফেল না তোমার পরিচয়। খুলে ফেলে দাও তোমার অনুগামীর পোশাক। অনুসরণের পথ ছেড়ে বিস্মরণের দিকে যাও না। সে উপায় যে নেই। যে জানে সে জানে। ঠাকুর একদিন সকালে ঝাউতলার দিক থেকে গাড়ু হাতে ফিরছেন। অদ্ভুত একটা শব্দ কানে এল তাঁর। উঁকি মেরে দেখলেন। দেখেন কি, একটা ঢোঁড়া সাপ একটা কোলা ব্যাঙ ধরেছে। ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'ঢোঁড়ায় ধরেছে কিনা, তাই এ অবস্থা। গিলতেও পারছে না, ওগরাতেও পারছে না। জাতসাপে ধরলে এই অবস্থা হতো না।' ঠাকুর যে আমার সেই জাতসাপ। অ্যায়সা ধরা ধরেছেন যে একেবারে নীল, বিষে জর্জর। এই যখন আমার অবস্থা তখন ফেরার আর পথ কোথায়! এই জীবনটা আমাকে তাঁর হাত ধরেই কাটাতে হবে।

কোন হাত? অপবিত্র হাত হলে তো চলবে না। পবিত্র হাত হওয়া চাই। সাবান দিলেই তো হলো না। সাফা হলো বটে। পবিত্র হতে হলে সৎকর্ম আর সৎচিন্তার সাবান ঘষতে হবে। সৎকর্ম কি? দান-ধ্যান, গঙ্গাস্নান, তিলকসেবা, ঘণ্টা নাড়া, স্তোত্রপাঠ, নিরামিষ ভক্ষণ, তীর্থভ্রমণ? না। ঠাকুর এক চড় মেরে বললেন—'ও... নয়, নয়, নয়। নিজেকে ঠকিও না। তোমার ধারণা হবে—খুব হচ্ছে, খুব বুঝি এগুচ্ছি! আসলে

হচ্ছে না কিছুই। ও তোমার নিত্যকৃত্যের তালিকায় ঢুকে ভক্তিহীন, মনঃসংযোগহীন, যান্ত্রিক অভ্যাসের মতো হয়ে যাবে। কিরকম জানো? আমার সেই লাগ ভেলকি গল্পটা তোমাকে বলেছিলুম, মনে আছে?

আছে ঠাকুর। লাগ ভেলকি, লাগ ভেলকি করছিল এক মাদারিঅলা, হঠাৎ জিভ উলটে সমাধি লেগে গেল। যেই তার সমাধি ছুটে গেল, অমনি আবার সে, লাগ ভেলকি শুরু করে দিল। এর অর্থ কি ঠাকুর? এই প্রসঙ্গে এল কেন?

তুমি ভাব, ভেবে বল।

তাহলে কি এইরকম? প্রবল নামসংকীর্তন করছি, কি তারস্বরে বিশুদ্ধ সংস্কৃত স্তোত্র আওড়াচ্ছি, ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে প্রবল আরতি করছি। হঠাৎ একদিন ঘোর লেগে গেল। কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলুম। তার অর্থ এই নয় যে, আমার সিদ্ধিলাভ হয়ে গেল।

ঠিক। ওটা সিদ্ধি নয়, ঘোর। 'নিতাই আমার মাতা হাতি' বলে ধেই ধেই নাচতে নাচতে, শেষে আর বলতে পারি না, বলি, মা হা। ঘোর লেগেছে। সেকরার ধরও সমাধি হলো। সমাধি যেই ভাঙল, সে অমনি আবার হাতুড়ি ঠুকতে শুরু করল। একটু-আধটু সোনাও সরাতে লাগল। সেই তার আগের স্বভাব। স্বভাব বদলাচ্ছে কিনা দেখতে হবে। কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য, কমছে কিনা। বাজে কথা শুনতেও ভাল লাগে না, কইতেও ভাল লাগে না! কেবল তাঁর কথাই শুনতে ভাল লাগে। দিবারাত্র তাঁর প্রসঙ্গেই রুচি, অন্য প্রসঙ্গে অরুচি। **তোমার হচ্ছে কিনা বোঝার শ্রেষ্ঠ উপায়, তাঁকে মনে পড়ামাত্রই তোমার চোখে জল আসবে। ইষ্ট তোমাকে দর্শন দেবেন। দর্পণটি পরিষ্কার রাখ, দর্শন যদি পেতে চাও। সৎচিন্তা আর সৎপ্রসঙ্গ, অনুক্ষণ তাতে মগ্ন থাকা।**" কিন্তু কর্ম তো থাকবেই। গৃহী যখন, তখন বিষয়কর্ম তো থাকবেই। কর্তব্য কর্ম। আমার ঠাকুর বলছেন, 'অবশ্যই থাকবে। স্ত্রীপুত্র পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে তোমাকে করতেই হবে। সৎপথে জীবিকার্জন। কারোর কাছে হাত পাতবে না। আর দুখচেটে সংসারী হবে না। সন্ধ্যায় সব ঘর যেন আলোকিত হয়। সিঁড়িতে প্রবেশদ্বারে অবশ্যই যেন আলো থাকে।' ঠাকুর কেশব সেনের বাড়িতে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলছেন—'এইসব জায়গায় আলো দেবে, আলো দিতে হয়। নিজের মনেই বলেছিলেন, তদ্গত ভাবে। সামান্য নির্দেশ। যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ। গভীর কোনও তত্ত্বকথা নয় কিন্তু। অথচ এই একটি নির্দেশেই ঠাকুর, আমি আপনাকে আমার পরমাপিতা হিসাবে ধরে ফেলেছি। গৃহীর প্রতি আপনার কি অসীম করুণা! সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে আলো দেবে। কেন? অন্ধকার, দারিদ্র্যের লক্ষণ, আলস্যের লক্ষণ, তামসিকতার লক্ষণ, উদাসীনতার লক্ষণ, অবহেলার লক্ষণ, অসচেতনতার লক্ষণ, মনের জড়তার লক্ষণ। আলো মানে আনন্দের প্রকাশ। চিদানন্দেরই প্রতিফলন। এই আলোর জন্যে গৃহী তুমি আলস্য ত্যাগ কর। দৈহিক এবং মানসিক আলস্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।' ক্লীব হয়ে যেয়ো না। **গৃহীর ক্লীবতা কী? বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অন্ধকারে থাকা। গৃহকে আলোকিত করার জন্যে উপার্জন, হৃদয়গেহকে আলোকিত করার জন্যে সাধনা।** অতিথি যেমন গৃহ দেখেন, ঈশ্বর তেমনি মন দেখেন। অন্ধকার গৃহে আলোকিত প্রাণী থাকতে পারে না। মন আলোকিত না হলে প্রাণী আলোকিত হতে পারে না। একটি উপদেশে আমার ঠাকুর প্রাণ আর পরিবেশের শেষ কথা বলে গেছেন। একালের হাজারটা সাইকোলজিস্টের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই। **আলো করে থাক। বাইরে আলো। ভেতরে আলো।**

স্বামীজী ঠাকুরের এই কথাটিকে তাঁর নিজের মতো করে, কালোপযোগী করে বলেছিলেন, "ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না করলে তোর ধর্ম-কর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না, পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির।... ধর্মকথা

শোনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেকচার-ফেকচারে বিশেষ কোনও ফল হবে না।"

অর্থাৎ ভাত-কাপড়ের সমস্যা মেটাও। অভাব দূর করে নিজের পরিবারে আলো আনো। দক্ষিণেশ্বরে আমার ঠাকুরের কাছে বেশ মজার এক মানুষ আসতেন। সংসারে বিষম বিতৃষ্ণা। সংসার ত্যাগই করে ফেলবেন এমন অবস্থা। তিনি ঠাকুরের ঘরে এলেন। ঠাকুরকে সবাই ঘিরে আছেন। ধর্মকথা হচ্ছে। তিনি একপাশে মাদুর পেতে ভোঁস ভোঁস করে খুব খানিক ঘুমিয়ে আবার মাদুরটি গুটিয়ে তুলে রেখে চলে যেতেন। তাঁর কাণ্ড দেখে ঠাকুর হাসতেন। অভাবীর বৈরাগ্য, অলসের বৈরাগ্য, রাজার বৈরাগ্য, লোক-দেখানো বৈরাগ্য, ব্যবসায়ীর বৈরাগ্য, চোরের বৈরাগ্য, ভোগীর বৈরাগ্য, প্রকৃত বৈরাগ্য, কত-রকমের বৈরাগ্য যে আছে, ঠাকুর সবই লক্ষ্য করেছিলেন। সংসার ফেলে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল। বেশ কিছুদিন বেপাত্তা। বউ ছেলে মেয়ে পড়ে রইল অভাবে, অনাহারে, অসহায় অবস্থায়। মাস তিনেক যেতেই পোস্টকার্ড এল। বেনারসের ছাপ মারা—'আমার একটি কর্ম জুটিয়াছে। শীঘ্রই তোমাদের লইয়া আসিব।' মর্কট বৈরাগ্য অসহ্য ছিল আমার ঠাকুরের। অন্তর্যামী বুঝতে পারতেন। ধর্মকে যাঁরা পলায়নের পথ ভাবতেন তাঁদের ধমক দিতেন—লজ্জা করে না, বিয়ে করেছ, ছেলেপুলেও হয়েছে, তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কে নেবে? ভূতে? পাড়াপড়-শীরা? আগে কর্তব্য করে এস, তারপর সব হবে।

তাহলে ঠাকুর, আমার দুই হাতের পবিত্রতা আসবে কি ভাবে?

এইভাবে, একটি হাত সৎ জীবিকায়, আর একটি হাত আমার চরণে। যেই কর্ম তোমাকে মুক্তি দেবে তখন তোমার দুহাত দিয়ে আমাকে ধরবে। সংসারের প্রতি তোমার কর্তব্য কতদিন—না যতদিন তোমার সন্তান-সন্ততি জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

ঠাকুর যে-হাতটি আপনি ধরেছেন, সেই হাত বেয়ে যে ভাবতরঙ্গ আপনাতে প্রবাহিত হচ্ছে তার শুদ্ধতা, অশুদ্ধতার বিচার আপনি করবেন। আপনি বলেছিলেন—মন হলো মাছি। এই বিষ্ঠায় বসে, তো এই মধুতে। অনেক চেষ্টা করেছি আপনার নির্দেশে মনকে সেই মাছি করতে যা শুধুই ফুলে বসে। এখনও পারিনি। চেষ্টা করছি, পারছি না। কোনও আড়ম্বর রাখিনি, যেমন বলেছিলেন, মনে, বনে, কোণে, সেইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছি। আপনি বলে-ছিলেন সুতোয় সামান্য একটু ফেঁসো থাকলে ছুঁচের ফুটোয় ঢুকবে না। কামনা-বাসনার সামান্যতম ফেঁসো মনে লেগে থাকলে ঈশ্বররূপী সুচে প্রবেশ করবে না। রামকৃষ্ণ-সুচে মন প্রবিষ্ট করাতে যতটা পবিত্র হওয়া উচিত তা হয়নি। সে আমার মনমাছির অক্ষমতা। আপনার চরণ থেকে মাঝে মাঝে আমার মন টলে যায়।

স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, 'সেই নষ্ট সাম্যাবস্থা।' কোন্ সাম্যাবস্থা, গীতায় ভগবান যেমন বলেছিলেন 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভা-লাভৌ জয়াজয়ৌ।' সেই নষ্ট সাম্যাবস্থা ফিরে পেতে গেলে আমাদের প্রথমে তমঃকে ব্যর্থ করতে হবে রজঃ দ্বারা, পরে রজঃকে জয় করতে হবে সত্ত্ব দ্বারা। সত্ত্ব অর্থে সেই স্থির ধীর প্রশান্ত অবস্থা, যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, শেষে অন্যান্য ভাব একেবারে চলে যাবে।' স্বামীজী আমাকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন, 'বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দাও, মুক্ত হও, যথার্থ ঈশ্বরতনয় হও, তবেই যীশুর মতো পিতাকে দেখতে পাবে। ধর্ম ও ঈশ্বর বলতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত 'বীর্য' বোঝায়। দুর্বলতা-দাসত্ব ত্যাগ কর। যদি তুমি মুক্তস্বভাব হও, তবে তুমি কেবল আত্মা মাত্র। যদি মুক্তস্বভাব হও, তবেই অমৃতত্ব তোমার করতলগত।'

ঠাকুর আমার একটাই ভয়, যে-হাত আপনি ধরেছেন, সেই হাত যেন অপবিত্র করে না ফেলি কর্ম দোষে, কলুষিত চিন্তায়। আমার কারণে আপনি যেন ছোট না হয়ে যান। আমার এই ভয়ই আমার লাগাম। রামকৃষ্ণানুগতের বেচাল বড় দৃষ্টিগ্রাহী। যে হৃদয়গৃহে আপনি আসবেন সেখানে যেন সৎকর্ম, সম্ভাবনার আলোটি জ্বলে। আরও কথা ছিল, আজ আর হলো না। প্রণাম॥

কিংকর্তব্য

আনন্দ বাগচী

ঋষি বলেছেন অল্পে সুখ নেই। কথাটি নিখাদ সত্যি। অল্প মানেই অ-সুখ। কবিও বলেছেন, অল্প নিয়ে থাকি বলেই আমার 'যাহা যায় তাহা যায়'। সব হাহাকারের উৎপত্তি এই অল্প থেকেই। অথচ বাঙালী চিরদিন অল্প নিয়েই আছে। খুব বেশি হলে সে আদার কারবারি, কথায় কথায় প্রবচন শোনায়, জাহাজের খবরে তার দরকার কী! সব ব্যাপারেই যে এরকম আধা-ব্যাপারি, সে অল্পে নিজেই তুষ্ট থাকতে চায়। অল্পে খুশি তো নিশ্চয়ই তবে অল্পেই খুশি হয়। এই স্বল্পতা থেকেই অস্থিরতা তার স্বভাবে শেকড় গেড়েছে। অস্থিরতাই তাকে অগভীর করেছে। অলস এবং অনুকরণ-বিলাসী করেছে। কোন কিছুর মূলে পৌঁছানোর উদ্যম নষ্ট করেছে। তাই দেখি সে ছোটে কিন্তু দৌড়ায় না, অন্ততঃ শেষ পর্যন্ত দৌড়ায় না। হুজুগের ছুট কিছুদূর গড়িয়েই থেমে যায়।

ফেলে দিয়েছে। সঙ্কটকালে প্রয়োজনবোধে পণ্ডিতরা নাকি অর্ধেক ত্যাগ করে থাকেন। কিন্তু এই ত্যাগের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, অর্ধেক বাঁচাবার জন্যেই এই অর্ধেক ছাড়া। কিন্তু সঙ্কটকালে যাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয় তারা অর্ধেক তো ছাড়েই বাকি অর্ধেকও রক্ষা করতে পারে না। বাঙালীর ইতিহাস অন্ততঃ এই কথাই বলে। যে বিদ্যাবলী তার করায়ত্ত ছিল একদিন, সনিষ্ঠ চর্চার অভাবে তা সে বিস্মৃত হয়েছে। যে মহাপুরুষের দল বারে বারে তার ঘরের দরজায় এসে ঘুম ভাঙিয়ে গেছেন তাঁদের সে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়েছে বারে বারে। তাঁদের জীবন থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে সে ভুলে গেছে। সেই সব মহামন্ত্র, মহাবাণী কানে পৌঁছালেও বুকের মধ্যে পৌঁছায়নি। বিকারকালে রোগী যেমন তার নিকটতম জনকেও চিনতে পারে না, সেও তেমনি চিনতে

বাঙালীর ইতিহাস অন্ততঃ এই কথাই বলে। যে বিদ্যাবলী তার করায়ত্ত ছিল একদিন, সনিষ্ঠ চর্চার অভাবে তা সে বিস্মৃত হয়েছে। যে মহাপুরুষের দল বারে বারে তার ঘরের দরজায় এসে ঘুম ভাঙিয়ে গেছেন তাঁদের সে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়েছে বারে বারে। তাঁদের জীবন থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে সে ভুলে গেছে। সেই সব মহামন্ত্র, মহাবাণী কানে পৌঁছালেও বুকের মধ্যে পৌঁছায়নি। বিকারকালে রোগী যেমন তার নিকটতম জনকেও চিনতে পারে না, সেও তেমনি চিনতে পারেনি যাঁরা ছিলেন তার আত্মার অধিক, প্রিয় হতে প্রিয়জন। সোনার বাংলা দুটুকরো হয়েছে, তলা থেকে মাটিও সরে যেতে শুরু করেছে অলক্ষ্যে। আত্মনষ্ট বন্ধভ্রষ্ট বাঙালীর এখন ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ অবস্থা।

বাঙালীর কল্পনা, কৌতূহল এবং কর্মোদ্যম, তার জ্ঞান বিদ্যা ও বিশ্বাস কেমন যেন আলগা, অপ্রাতিভ এবং অসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। অথচ তার সৌভাগ্য ছিল ঈর্ষনীয়, ইতিহাস অসামান্য, চরিত্র তুলনাহীন। এই সেদিন পর্যন্তও নেই-নেই করেও তার যা ছিল তা কাজে লাগাতে পারলে বিশ্বের দরবারে শীর্ষাসন অধিকার করা কিছু অসম্ভব ছিল না। কিন্তু অনায়াসপ্রাপ্ত ঐশ্বর্যকে সে চিনতে পারেনি, ধরে রাখতে পারেনি, নষ্ট করেছে : রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই পরশপাথর খোঁজা ক্ষ্যাপার মতো অস্তিত্বকে হাতে পেয়েও মূর্খের মতো ছুঁড়ে

পারেনি যাঁরা ছিলেন তার আত্মার অধিক, প্রিয় হতে প্রিয়জন। সোনার বাংলা দুটুকরো হয়েছে, পায়ের তলা থেকে মাটিও সরে যেতে শুরু করেছে অলক্ষ্যে। আত্মনষ্ট বন্ধভ্রষ্ট বাঙালীর এখন ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ অবস্থা।

শুধু বাঙালীর নয়, গোটা ভারতবাসীরই আজ এই দশা, ভাঙনের দশা। অবশ্য ভালয় যেমন মন্দেও তেমনি, অতীতে যেমন আজকেও তেমনি, বাঙালীই হয়েছে ভারতের পথিকৃৎ। স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম বিপ্লবের অগ্রভূমিকা নিয়েছিল এই বাঙালীই। প্রথম স্বাধীনতার সূর্যও এই বাংলার প্রান্তরে ডুবে

ছিল বলেই হয়তো সেই কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত এড়াবেই তাকে প্রথম শুরু করতে হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রথম মুক্তি-যুদ্ধের নেতৃত্বও দিয়েছিল বাঙালীই। তারপর রাজনীতির বিবর্তনেও বাঙালীই অগ্রণী হয়েছে।

এই শতাব্দীর শেষ প্রহরে এক অদ্ভুত অন্ধকার এখন পৃথিবী জুড়ে। বাঙালী কবির ভবিষ্যদ্বাণী এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে কে ভেবেছিল। এ এমন সময় যখন চক্ষুষ্মানরা দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছেন। শুধু তারাই বেশি চোখে দেখছে যারা যত বেশি অন্ধ। এই অফুরন্ত অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষও রুদ্ধনিঃশ্বাসে তার দিগভ্রান্ত পথযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছে। চতুর্দিকে কেবল দুর্নীতির রাজত্ব, আর মিথ্যাচার আর রাজনীতির ব্যভিচার। মনুষ্যত্ব শিরদাঁড়ার অসুখে ভুগছে। অন্যায় এবং অধর্মের সঙ্গে আপসরফার মধ্য দিয়ে সমাজ তার চলচ্ছক্তি বজায় রেখেছে। মূল্যবোধ বিনষ্ট, আদর্শ অট্ট-হাসির বিষয়। দেশের মানুষ মানেই সাময়িক ভোটপত্র, আর শোষণের চিরস্থায়ী করপাত্র। তার বাইরে তার কোন অস্তিত্ব নেই। এদেশের স্বাধীনতার এখন দুটিমাত্র হাতিয়ার বুলেট আর ব্যালট। কারণ প্রশাসনের তামাম কাঠামোটি এখন ঘুণে ধরা, সব উন্নয়ন পরিকল্পনারই অধোগতি শেষ পর্যন্ত ছোটবড় পকেটে। জনসাধারণের বহুকষ্টের অর্থ নিয়েও ছিনিমিনি খেলা চলেছে সর্বত্র। এদেশে এখন আর কেউ কাজ করে না, কাজ করতে দেওয়া হয় না। যতই জনসংখ্যা বাড়ছে 'মানুষ'-এর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে ততই দ্রুত হারে। এদেশের কোটি কোটি মানুষ এখন একলা, অসহায়, নিরাপত্তাহীন। তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ, নালিশ জানানোর ভাষা নেই, অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানোর উপায় নেই। দেশে আইন আছে কিন্তু সেই আইন শাঁখের করাতের মতো সামনে কাটে পিছনে কাটে মাঝখানেও কাটে। তার ফাঁক-ফোকরও যথেষ্ট। বিত্তহীন মানুষের কাজে লাগা শক্ত। পুলিস আছে, কিন্তু তার সাহায্য কারা পায়? পুলিসে ছুঁলে এবং পুলিস ছুঁলে একই অবস্থা। বিভিন্ন অঞ্চল মাসলম্যান, মস্তানদের খাসতালুক। এবং তাদের রিমোট-কনট্রোল অন্যত্র। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং ভেজাল রোধ করার সাধ্য এখন স্বয়ং সরকারেরও নেই। যে বণিকের মানদণ্ড একদা রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছিল সেটাই বুঝি বণিকের তৈলদণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে দেশশাসনের বাটখারা। রাজা গেছে, রাজছত্র গেছে, সিংহাসন লোপাট। গণতন্ত্র মতে এখন গদি, রাজনীতিও এখন তার প্রয়োগ-পদ্ধতি বদলে গদিয়ান হতে উদ্গ্রীব। দেশ রসাতলে যাক, ঋণের ওপর ঋণের বোঝা পর্বতপ্রমাণ হোক, জোড়া-তালি গোঁজামিল দিয়ে, ভাষণের ব্যাসকূট দিয়ে বিভ্রান্ত করে এক নির্বাচন থেকে আর এক নির্বাচন পর্যন্ত টিকে থাকাই এখন মোক্ষ। মৌলবাদী রাজ-নীতি গোষ্ঠীস্বার্থে সমর্পিত। জনস্বার্থের যারা দোহাই পাড়ে জনসাধারণের সর্বনাশে তারা অবিচল, বিবেকহীন, নির্মম।

শিক্ষাব্যবস্থায় দূরদৃষ্টির অভাব দেখে ব্যথিত হতে হয়। মনে হয় শিক্ষাই এখন জাতীয় জীবনে সবচেয়ে অজরুরী ব্যাপার। স্কুলগুলিও চলেছে তেমনি ভাবে। আগের তুলনায় শিক্ষকদের বেতন বেড়েছে, শিক্ষকদের সম্মান বেড়েছে কিন্তু শিক্ষার মান উত্তরোত্তর অবনতির দিকে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে কবেই। ছাত্রের নৈতিক দায়িত্ব, জীবনের শুভাশুভ নিয়ে কেউ ভাবিত নয়। ক্লাসে পড়ানো হয় না, স্কুলে ক্লাস হয় না, শিক্ষকতা এখন নিছকই হাজিরাসর্বস্ব চাকরি। বিদ্যালয়ের বুড়ি ছুঁয়ে শিক্ষকরা তাঁদের নিজস্ব কুটিরশিল্পে আগ্রহী। যদিও সেই উপরি উপার্জনের ঘরানাও পুরোপুরি যান্ত্রিক বাণিজ্যে পরিণত। সব দেখে মনে হয়, 'নাথিং ইজ রং ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার' কথাটির সঙ্গে এ-যুগে আর একটি শব্দ যোগ করে নেওয়া যায়। সেই শব্দটি হচ্ছে এডুকেশন। বিদ্যা এখন আর কেউ দান করে না, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এই পণ্যটি এখন হস্তান্তরিত হয়। সব মিলিয়ে বাঙালীর এখন সমূহ দুর্দিন।

বাঙালীর সমাজ, বাঙালীর ঘর-সংসার ঠিক কবে থেকে, কোথা থেকে এবং কেন ভাঙতে শুরু করেছে, সেকথা সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক হয়তো বলতে পারেন, আমার জানা নেই। আমি শুধু জানি, পঞ্চাশ বছর আগেও যে বাংলার অস্তিত্ব ছিল, বাঙালীর যে মন-মেজাজ-মর্জি টিকে ছিল সেটুকুও আজ আর

অবশিষ্ট নেই। সেই দেশপ্রেম, সেই ভালবাসা, সেই কর্মনিষ্ঠা, ধর্মবোধ এবং উদ্দীপনা কোথায় হারিয়ে গেছে। মানচিত্রের দিকে তাকালে তো বটেই, তার মনচিত্রের দিকে তাকালেও বাঙালীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষয়িষ্ণুতা ও অবনতি চোখে পড়ে।

অখণ্ড বাংলা আজ কেবল দ্বিখণ্ডিতই হয়নি, বিবিধ ক্ষেত্রে এবং অবস্থায় খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। বহু রকমে ভেঙেছে, চিড় খেয়েছে, তুবড়ে গেছে। যাবেই। কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে অপর কোন জাতি এত আঘাত, এত উপর্যুপরি গভীর আঘাত পেয়েছে বলে জানা নেই। ছেচল্লিশের আগস্ট থেকে সাতচল্লিশের আগস্ট পর্যন্ত মাত্র এক বছরে—মাত্রই এক বছরে তিন তিনটি বড় রকমের আঘাত বাঙালী জীবনের উপকূলেই কেবল আছড়ে পড়েনি, তাকে ভেতরে বাইরে বিপর্যস্ত করেছে। দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা তার এযাবৎকালের প্রচলিত বিশ্বাসকে আমূল নাড়া দিয়েছে।

মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা, আস্থা এবং নির্ভরতা নষ্ট হয়েছে। একগৃহস্থ পরিবারের ওপরে যে একসমাজস্থ পরিবার থাকে, এবং তারও ঊর্ধ্বে স্বদেশভূমির অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা যাকে বলা যায়। এক-দেশদর্শী স্বজনপ্রত্যয়—সেই পারস্পরিক একান্নবর্তি-তায় এবং একান্নবর্তিতায় ফাটল ধরতে শুরু করেছে। যৌথ পরিবার ভাঙতে শুরু করেছে, সম্পর্কের জোড় খুলে চালে-চুলোয় পৃথগন্ন হয়েছে, সমাজের অভি-ভাবকতা নড়বড়ে, অগ্রাহ্য এবং স্বদেশপ্রেমের আদর্শ ফিকে। কারণ ঠিক এর আগে আগেই জনজীবন ঘোলা করে রেখে যাওয়ার মতো দুটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেছে। বিশ্বযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ। আর্থিক এবং চারিত্রিক অসাম্যের সূচনা তখন থেকে। মনুষ্য-সৃষ্ট মন্বন্তর তাকে প্রথম বিবেকহীন, নির্দয়, কপট-চারি, স্বার্থান্ধ করেছে। চরিত্রহীনতা ঘৃণাক্ষরে হলেও তার স্বভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। নগর-মুখিনতা দুর্নীতিগ্রস্ত হবার পথ দেখিয়েছে। রাতারাতি কালোবাজারের ভেল্কি আর ধনকৌলিন্য বাঙালীর মূল্যবোধকে নুইয়ে দিয়েছে।

অধঃপতনের ক্ষেত্রটি যখন এইভাবে প্রস্তুত, সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন স্তিমিত, দিল্লী দূর অস্ত, বর্মা, আসামের সীমান্ত ছুঁয়ে স্বাধীনতার শেষ ফৌজ ফেরার, ঠিক সেই সময় হুড়মুড় করে এক বিকলাঙ্গ স্বাধীনতা এদেশের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। শতাব্দী সেমুখর প্রসব। কবল সেকথা তখনো কেউ ভাল করে বুঝতে পারেনি।

তারপর দীর্ঘ চার দশক কেটে গেছে। নানা প্রাত্যহিক সমস্যায় রুদ্ধশ্বাস বাঙালীর এখন আর মরবারও সময় নেই। কিন্তু সে যে এখন দ্রুত গতিতে ডুবছে তাতে আর সন্দেহ নেই। এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তার ঘরে একটা আলোর রেখাও অবশিষ্ট নেই। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে একক পরিবারে এসে দাঁড়িয়েছিল একদিন। সেই ছোট পরিবারেও আর সুখ নেই। মা-বাবা যে-সন্তানের মুখ চেয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন, যে-সন্তানের সমৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে কৃপণের মতো, স্বার্থপরের মতো দিন যাপন করেছেন, সেই সন্তানও এখন মা-বাবার দিক থেকে মুখ ফেরাতে শুরু করেছে। উত্তরোত্তর বড়ো হবার স্বার্থশিক্ষায়, অন্যকে ছলেবলে কৌশলে ডিঙিয়ে যাবার উর্দ্ধশ্বাস একচোখোমিতে তারা জীবনের এমন তালিম পেয়েছে যে, নিদারুণ হৃদয়হীন এক-একটি সফিস্টিকেটেড রোবটে পরিণত হয়েছে। কেউ দেশে, কেউ বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত এই বঙ্গ-সন্তানরা এখন কার ভাববার? দেশের না, দশেরও না। এমনকি মা-বাবারও না।

আগামী প্রজন্মের বাঙালী তাহলে কোন্ মাটিতে পা রেখে দাঁড়াবে? একটি জাতি কি এইভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে? মানুষের জন্যে তার কি বিন্দু-প্রমাণ দায় এবং দরদও থাকবে না? এরই নাম কি জীবনের সাফল্য, সচ্ছলতা, সার্থকতা? কোন্ শিক্ষা—ইংরেজী বাঙলা মিডিয়ামের কোন্ শিক্ষা—এখান তাদের বাঁচাতে পারবে, যে-শিশুরা মাটিতে হামাগুড়ি দিচ্ছে? কোন্ আদর্শ তাদের বাঙালী হবার, মানুষের মতো মানুষ হবার শক্তি যোগাবে? সুস্থ সবল চরিত্রবান করবে? হৃৎপিণ্ডের পাশা-পাশি তার হৃদয়কেও বাঁচিয়ে রাখবে? উপদেশ, বক্তৃতা, লেখালিখি অনেক হয়েছে। বয়স্ক জীবনে আর কোন জীবনদায়ী ওষুধই এখন কাজ করবে

না। শৈশব থেকেই তাহলে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে আমাদের। আব সে-শিক্ষা শুরু হবে ঘর থেকেই। ঘরের মানুষ সেকথা এবার ভাবতে থাকুন।

কিন্তু কোন্ ঘর থেকে তার শিক্ষা শুরু হবে, মা-বাবার কোন্ আচরণ থেকে তার বোধোদয় ঘটবে, শুরু হবে জীবনের প্রথমপাঠ? সে-ঘরে কেবল সচ্ছলতাই আছে, কিন্তু স্বজনতা নেই, বিলাসের উপকরণ এবং ইচ্ছাপূরণের অকৃপণতা আছে, কিন্তু বাকসংযম নেই, বাক্যে ও ব্যবহারে সঙ্গতি নেই, সততা নেই, সেখান থেকে এই অপাপবিদ্ধ শিশুরা কি শিখবে? তারা কি বেশিদিন অনাহত থাকবে? তাদের পাখির চোখ কতদিন স্বচ্ছ থাকবে? যাবতীয় জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে, মাথার ওপর কেবলই পাঠকেতাবের বোঝা চাপানোর রোখ চেপেছে, তাকে নিঃশ্বাসও ফেলার অবকাশ না দিয়ে বহুমুখী ছকের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়ানো হচ্ছে, কিন্তু নিজের মতো করে তাকে বাড়তে দেওয়া হচ্ছে না, তখন বিকলাঙ্গই জন্মাবে।

যে শিশু তার চারপাশে দাদু-দিদিমাকে দেখল না, কাকা-জ্যাঠাকে চিনল না, এমনকি মা-বাবাকেও পেল না, স্নেহ কি বস্তু জানল না, তার পুষ্টি আসবে কোথা থেকে?

তাকে এখন থেকেই মানুষকে ভালবাসতে, মানুষের বেদনায় ব্যথিত হতে এবং পরের উপকার করতে শেখাতে হবে। সত্য

শিক্ষাব্যবস্থায় দূরদৃষ্টির অভাব দেখে ব্যথিত হতে হয়। মনে হয় শিক্ষাই এখন জাতীয় জীবনে সবচেয়ে অজরুরী ব্যাপার। স্কুলগুলিও চলেছে তেমনি ভাবে। আগের তুলনায় শিক্ষকদের বেতন বেড়েছে, শিক্ষকদের সম্মান বেড়েছে কিন্তু শিক্ষার মান উত্তরোত্তর অবনতির দিকে। ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে কবেই। ছাত্রের নৈতিক দায়িত্ব, জীবনের শুভাশুভ নিয়ে কেউ ভাবিত নয়। ক্লাসে পড়ানো হয় না, স্কুলে ক্লাস হয় না, শিক্ষকতা এখন নিছকই হাজিরা-সর্বস্ব চাকরি। বিদ্যালয়ের বাড়ি ছুঁয়ে শিক্ষকরা তাঁদের নিজস্ব কুটিরশিল্পে আগ্রহী।… বিদ্যা এখন আর কেউ দান করেন না, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এই পণ্যটি এখন হস্তান্তরিত হয়। সব মিলিয়ে বাঙালীর এখন সমূহ দুর্দিন।

স্বাভাবিক প্রবণতা কি কেবলই ঘা খেতে খেতে অবিশ্বাসী, সন্দেহ-পরায়ণ, বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে না? কার বিরুদ্ধে তার অভিমান, আক্রোশ এবং ঘৃণা তা সে সঠিক করে জানবে না। ফলে গোটা সমাজের বিরুদ্ধেই, নীতি এবং ঐতিহ্যের প্রতিই সে বিমুখ ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে উঠবে। সে কেবলই ভাঙতে শিখবে, নিজেকে পর্যন্ত ভেঙে চুরমার করতে চাইবে, গড়তে শিখবে না। অসাধু, অশিষ্ট এবং কপটচারির মুখে নীতিবাক্য, উপদেশ আর বড় হবার তাগিদবাক্য শুনতে শুনতে এরকম প্রতিক্রিয়া আশ্চর্য এবং অসম্ভব নয়।

শিশুকে চিরন্তন বস্তুবাদী, সপ্রতিভ এবং নগদ-মূল্যে বাজারচালু করতে গিয়ে যখন তাকে প্রকৃতি-জগৎ থেকে, খেলাধুলোর জগৎ থেকে, কল্পনার কথা বলতে শেখাতে হবে। এবং সেই শিক্ষা নিজেদের আচরণের মধ্য দিয়ে দিতে হবে, মহাপুরুষদের জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসে এবং বোধে আনতে হবে। জাতিগঠন করতে হবে বললেই তো আর হবে না। প্রতিটি ঘরে এই চরিত্র মক্শো করতে না পারলে শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না। কারণ দেশে এখন কোন নেতা নেই, জাতির কাণ্ডারী নেই। এই ভারতক্ষেত্রে যাদের প্রহরী বলে মনে হচ্ছে এখন, কাছে গেলে দেখা যাবে তারা সকলেই কাকতাড়ুয়া, হাওয়াই মোরগের মতো দিক বদল করতে সময় নেয় না। একেলার কথার স যাদের ওবেলার কথার সঙ্গতি থাকে না, স্বার্থ। র জন্যে যাদের শঠতার সীমা-পরিসীমা থাকে না, তাদের কাছ থেকে আমাদের কিছুই পাবার নেই।

প্রবন্ধ

হাওড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়ার ইতিহাস সুপ্রাচীন। লক্ষ্মণ সেনের (দ্বাদশ শতক) তাম্রশাসনে 'বেতড্ড চতুরক্রের' অর্থাৎ বেতড় অঞ্চলের উল্লেখ আছে। বিপ্রদাসের 'মনসা মঙ্গল' (১৪৯৫) কাব্যে চাঁদ সওদাগরের 'বাণিজ্য যাত্রা'-র বর্ণনায় বেতড় বন্দরের উল্লেখ দেখা যায়।

ডাহিনে কোতরঙ বাহি কামারহাটি বামে।
পূর্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষুড়ি পশ্চিমে॥
চিৎপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা।
নিশিদিশি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা॥
তাহার পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা॥

শতকের কবি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে তাই দেখা যায়—

ত্বরায় বহিছে তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥
বেতড় চণ্ডীপূজা কৈল সাবধানে।

কলকাতাকে সেসময় সকলে এড়িয়ে চলত, তার কারণ তখনকার কলকাতা ছিল বনবাদাড়, জলাজমি ও শ্বাপদসংকুল। কিন্তু গঙ্গার পশ্চিমকূলে ছিল সমৃদ্ধ গ্রামসমূহ এবং বেতড়ের মতো প্রাচীন ও

কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। কিন্তু পুরনো কলকাতার চেয়ে অধিকতর সমৃদ্ধশালী গঙ্গার অপর তীরের 'হাওড়া' নামক জনপদটির কথা প্রায় অনুচ্চারিতই রয়ে যাচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান রচনাটির প্রকাশ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হবার পর পর্তুগীজরা এদেশে সকলের আগে এসেছিল। এই পর্তুগীজদের প্রথম ঘাঁটি ছিল বেতড়। ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভেনিশিয়ান নাবিক সিজার ফ্রেডারিক (Ceasar Frederic) এই অঞ্চলে এসেছিলেন। তার লিখিত বিবরণে জানা যায় বেতড়ের কাছে সরস্বতী ও দামোদরের জলধারা গঙ্গায় পড়ে যে ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে পর্তুগীজদের সমুদ্রগামী জাহাজগুলি নদীপথে আর না এগিয়ে সেখানেই নোঙর করত, কেবলমাত্র ছোট ছোট জলযানগুলি সোজাসুজি সপ্তগ্রামে চলে যেত। ফ্রেডারিক সাহেবের মতে বেতড় ছিল সপ্তগ্রামের সহায়ক বন্দর। জানা গেছে যে, শেঠ-বসাকরা সুতানুটি ও কলকাতায় বসবাসের আগেই বেতড়-সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাস করতেন। পরে গঙ্গা পার হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন। পর্তুগীজরা পরে সাঁকরাইলেও একটি ঘাঁটি তৈরি করেছিল।

প্রাচীন কাব্যে 'বেতড়', 'শালিখা' ইত্যাদি স্থানের উল্লেখ থাকলেও 'হাওড়া'র কোন উল্লেখ নেই। ষোড়শ প্রসিদ্ধ বন্দর-জনপদ।

হুসেন শাহের, মতান্তরে আকবরের, আমলে বাংলার বার ভুইঞার অন্যতম যশোহরের প্রতাপাদিত্য (ষোড়শ শতক) শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছাকাছি কোন একটি জায়গায় একটি মাটির দুর্গ তৈরি করান, তা পরে 'থানা মাকুয়া' নামে পরিচিত হয়। গঙ্গার তীরে এই অঞ্চলটি এখনও থানা মাকুয়া নামে পরিচিত। ১৫৮৯-এ মানসিংহ ষষ্ঠ মোগল সুবেদার হিসাবে বাংলায় আসেন। এই সময় হুগলির ফৌজদারের অধীনে থানাদুর্গের থানাদার নিযুক্ত করা হয় এবং পরে থানাদুর্গের সংস্কার করে গঙ্গার পূর্বদিকে আর একটি মাটির দুর্গ তৈরি হয়—যা মেটিয়াবুরুজ নামে বর্তমানে পরিচিত। ১৭৫০-এ মারাঠারা থানাদুর্গ অধিকার করলে নবাব আলীবর্দী ইংরেজদের সাহায্যপ্রার্থী হন। মারাঠারা পালিয়ে যাবার কিছুদিন পরে ক্লাইভ থানাদুর্গ অধিকার করে ধ্বংস করে দেন। এই ঘটনাটিকে পরবর্তী পলাশীর যুদ্ধের ইঙ্গিত বলে অনেকে মনে করেন। হাওড়ার বুকেই এই ঘটনা ঘটেছিল।

ইংরেজদের দুর্গ অধিকার সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গলার ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃঃ ২১৫) লিখেছেন ঃ

"ইংরেজেরা ১৩ জুন প্রাতে দুইখানি যুদ্ধ-জাহাজ ও দুইখানি ক্ষুদ্র তরণী পাঠাইয়া এই দুর্গ আক্রমণ করেন। অকস্মাৎ অগ্নিবৃষ্টিতে স্তম্ভিত হইয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধকার্যে অনভ্যস্ত সিপাহী সৈন্য হুগলি অভিমুখে পলায়নপর হইল। ইংরেজগণ কামানের কতকগুলিকে অকর্মণ্য, কতকগুলিকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। পরদিন হুগলির ফৌজদার ২০০০ সিপাহী পাঠাইয়া ইংরেজদের তাড়াইয়া দেন। তৃতীয় দিন ৩০জন ইংরেজ ফৌজ জাহাজ হইতে গোলাগুলি ছুঁড়িয়াও আর তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। অতঃপর ইংরেজরা প্রত্যাবৃত্ত হইল। নবাবসৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নদীমুখ দিয়া প্রত্যাবর্তন বা পারাপার হইতে সহজে খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ইংরেজরা থানার এই দুর্গ অধিকারের পরিকল্পনা করেন।"

সিরাজের প্রত্যাবর্তনের সময় থানাদুর্গে ২০০ জন সিপাহী ছিল। এডমিরাল ওয়াটসন ও ক্লাইভ কলকাতা উদ্ধারে আসছেন খবর পেয়ে হুগলির ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমারকে থানাদুর্গ মেরামত ও মজবুত করার আদেশ দেন। নন্দকুমার ঠিক করলেন থানাদুর্গ ও মেটিয়াবুরুজের মধ্যের গঙ্গা ইট দিয়ে বুজিয়ে দেওয়াই হবে উপযুক্ত কাজ। এই উদ্দেশ্যে দুজাহাজ ইট দিয়ে বোঝাই করাও শুরু হয়। কিন্তু কাজ শেষ হবার আগেই ক্লাইভ থানাদুর্গ অধিকার ও ধ্বংস করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কর্মচারী উইলিয়াম হেজেস লিখেছেন ঃ "Tanna fort taken by Job Charnock and destroyed by Clive and Watson on the 1st January, 1757" (Hedges' Diary, Vol. III, p. CCXV)।

অতএব ক্লাইভ কর্তৃক থানাদুর্গ অধিকারকেই পলাশীর যুদ্ধের ইঙ্গিত বলে ধরা যায়।

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে নবাবের কর্মচারীদের সংঘর্ষ বাড়তে থাকে। হুগলিতে সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে হেরে গিয়ে ইংরেজরা প্রথমে সুতানুটি পরে আরো দক্ষিণে হাওড়ার উলুবেড়িয়াতে এসে আশ্রয় নেয়। সালকিয়ার নুনের গোলা ধ্বংস করে থানাদুর্গ থেকে নবাব-সৈন্যদের বিতাড়িত করে কোম্পানি উলুবেড়িয়াতে ঘাঁটি করতে চাইলেন স্থায়িভাবে বাণিজ্যের জন্য। পরে স্থানীয় জনসাধারণের বাধা দানে কোম্পানির নির্দেশে উলুবেড়িয়া পরিত্যাগ করে গঙ্গা পার হয়ে সুতানুটিতে চলে আসেন জব চার্নক। সেটি হচ্ছে ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়।

হাওড়া যে কলকাতা হতে পারত—গঙ্গার পশ্চিম কূলেই উলুবেড়িয়ায় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী গড়ে উঠত—সেবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। এটিই ইতিহাসের নির্মম পরিহাস। স্থানীয় কিছু ব্যক্তির বাধাদানে সেদিন যা ঘটেছিল তাও কিন্তু বিশেষভাবে ইতিহাসের গুরুত্ব পাবার অধিকারী। তা হচ্ছে হাওড়ার মানুষের স্বাধিকারবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা।

কেউ কেউ মনে করেন উলুবেড়িয়ার অনেক উত্তরে খাস হাওড়া-শিবপুরেই জব চার্নক কুঠি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শিবপুর কাহিনী' গ্রন্থে (পৃঃ ৫১) লিখেছেন ঃ "ভারতে ইংরেজ রাজধানীর বীজবপনের পূর্বে চার্নক সাহেব গঙ্গার পশ্চিমকূলে হাওড়া-শিবপুরের দিকে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের সংকল্প করিয়াছিলেন।" অন্নদাপ্রসাদ তাঁর গ্রন্থে গোল্ডউইনের 'বেঙ্গল' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন কেন জব চার্নকের ঐ সংকল্প বাস্তবায়িত হয়নি ঃ 'The natives repaired to Murshidabad [i.e., to the Nawab] *to complain* and orders came to prohibit finishing the factory. On this Charnock setting fire to all the houses on this side of the river (Howrah) embarked in a ship." অভিযোগটি ঠিক কি ছিল ? গোল্ডউইন লিখেছেন—ইংরেজরা নদীর তীরে কুঠি স্থাপন করলে গঙ্গায় স্নানার্থিনী দেশীয় মহিলাদের আব্রু নষ্ট হবে।

'হাবড়' শব্দের অর্থ জলা জমি বা কর্মাক্ত স্থান। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও 'হাওড়া' শব্দটির উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'হাওড়া' শব্দের অর্থ 'জলা জায়গা'। 'ড়া'-শব্দটি হচ্ছে দ্রাবিড় ভাষার চিহ্ন। ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

মতে বাঙলা শব্দের 'ড়া'-প্রত্যয়টি অস্ট্রিক গোষ্ঠীর 'ওড়ীক' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ বাড়ি। 'জলা জায়গায় বাড়ি' অর্থে হাওড়াকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ বলেন 'হাওড়' শব্দটি ওড়িয়া। হাওড়া একসময় পরাক্রান্ত ওড়িয়া রাজাদের দ্বারা আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়েছিল এবং তার প্রভাব 'হাওড়া' নামের পিছনে থাকা অসম্ভব নয় বলে এঁদের অভিমত। ওড়িয়া 'হাওড়' শব্দের অর্থ ডোবা।

হাওড়া শহরের একাংশ এক সময়ে চলিল-পল্ল 'বোরো পরগণা' বলে উল্লিখিত হতো। 'বোরো' শব্দের অর্থ জলমগ্ন জায়গা। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দেও কেবলমাত্র হাওড়া শহরের অন্তর্গত সাড়ে আট মাইল এলাকায় খানা-ডোবার সংখ্যাই ছিল ১৮০০টি।

ভাষাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন যে 'হাড়িবাড়া' শব্দটি অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে 'হাওড়া'-য় রূপান্তরিত হয়েছে। 'আড়া' শব্দটি তাঁদের মতে কোল ভাষা থেকে উৎপন্ন যার অর্থ 'বাঁধের পাড়'—হাড়িদের বাঁধের পাড়। যাই হোক, আঠার শতকের প্রথম দিকে কোম্পানির কাগজপত্রে হাওড়ার নাম ছিল হাবিড়া এবং একশ বছর আগে দেশীয় ব্যবহারে ছিল হাবড়া।

১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে বার্ষিক খাজনা ১৪৫০ টাকার বিনিময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাদশাহী ফরমান পেলেও গঙ্গার পশ্চিম কূলে পাঁচটি গ্রামের জমিদাররা ইংরেজদের অধিকার অস্বীকার করেছিলেন প্রায় তেতাল্লিশ বছর (১৭১৭-১৭৬০)। মীরকাশিমের সময় এই অঞ্চলকে বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে রাজস্ব আদায়ের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সময় থেকেই অনুমান করা যায় যে, 'হাবিড়া' বা 'হাড়িআড়া' বা 'হাবড়া' বিদেশীদের উচ্চারণ ক্রমে স্থায়িভাবে 'হাওড়া'য় পরিণত হয়েছে। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে হাওড়া রেলস্টেশন স্থাপিত হয়। রেলের টিকিটে সেসময় ছাপা হয়েছিল Howrah—হাওড়া।

১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের প্রপৌত্র সম্রাট ফারুক-শিয়ার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে গঙ্গার পূর্বতীরে তেত্রিশটি গ্রামের সঙ্গে গঙ্গার পশ্চিমকূলে যে-পাঁচটি গ্রামেরও ফরমান দিয়েছিলেন, তাতে হাওড়ার উল্লেখ আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সিলের 'Consultation Book'-এ গঙ্গার পশ্চিম-কূলের পাঁচটি গ্রামের নাম এইরূপ বানানে লিপিবদ্ধ আছে—Salica (সালকিয়া), Harrirah (হাওড়া), Cassundeah (কাসুন্দিয়া), Ramkrishnapur (রামকৃষ্ণপুর) এবং Battor (বেতড়)। অধুনা শিবপুর অঞ্চল তখন বেতড় নামেই পরিচিত ছিল।

বার্ষিক ১৪৫০ টাকা খাজনার বিনিময়ে ফরমান পাওয়া গেলেও গঙ্গার পশ্চিমকূলের পাঁচখানি গ্রামের জমিদাররা রাজা শুকদেব রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে সেদিন ইংরেজদের এই পাঁচটি গ্রামের অধিকার দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁরা এই বাদশাহী ফরমানকে এবং ইংরেজদের কর্তৃত্বকে স্বীকার করেননি। ইংরেজদের ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাটি দেশের স্বাধিকার রক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয়। বেশ কিছু দিন পরে ১৭৬০-এ মীরকাশিম বাংলার নবাব হয়ে আসার পর বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার তুলে দেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে। তখন হাওড়াকে বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত করে তার স্বাধিকার কেড়ে নেওয়া হলো। এইভাবে হাওড়ার অঞ্চলগুলিকে বারবার বিভিন্ন জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, কোন স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত করা হয়নি অনেক দিন পর্যন্ত। প্রথমে হাওড়া ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। মীরকাশিমের আমলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মিঃ এস ডেভিস-এর ওপর রাজস্ব আদায়ের ভার দেন এই জেলার। তারপর লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বর্ধমানকে ভেঙে নতুন জেলা হুগলির সৃষ্টি হয়। জানা যায়, এক সময় হাওড়া জেলার আমতা ও বাগনান থানা ছিল হুগলির মধ্যে আর হাওড়া সদর ছিল চব্বিশ পরগনার সঙ্গে। ১৮২২-এর ১ মে বর্ধমান থেকে হাওড়া ও হুগলির কালেকটরি আলাদা হয়ে যায়। ১৮৪৩-এ হাওড়াকে একটি স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা দেওয়া হয়। পরের বছর হাওড়ার জন্য একজন স্বতন্ত্র ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়। তার আগে হাওড়া যথাক্রমে চব্বিশ পরগনা এবং হুগলির জজের অধীনে ছিল।

১৯০৯-এ হাওড়ার প্রথম গেজেটিয়ার লেখা হলেও হুগলি থেকে হাওড়ার দেওয়ানী বিচার ও রাজস্ব

বিভাগ নিয়ন্ত্রিত হতো। ১৯২০-এ হাওড়ার রাজস্ব বিভাগ হুগলি থেকে পৃথক হয়ে যায়। এর পর থেকে হুগলির সঙ্গে হাওড়ার প্রশাসনিক কোন সম্পর্ক থাকল না।

হাওড়ার ধর্মীয় ঐতিহ্য হিসাবে বলা যায় যে, ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে ঘাঁটি করে। এরই পঁচিশ বছর পরে বেতড় অর্থাৎ বর্তমান শিবপুর অঞ্চলে ঘাঁটি তৈরি হয়। প্রাচীন বেতড়ের স্মৃতি বহন করে চলেছে রাজা রামব্রহ্ম রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বেতাইচণ্ডী বা বেত্রচণ্ডীর মন্দির (সতের শতক)। প্রাচীন বেতড় কেবল প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দর রূপেই গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ধর্মস্থান হিসাবেও। পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণের রাজত্বের শেষভাগে বেতড় বন্দরের সন্নিহিত গঙ্গা, দামোদর, সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে গড়ে উঠেছিল শাক্ত উপাসনার নানা পীঠস্থান। একটি প্রাচীন ছড়ায় পাওয়া যায়, "কালীঘাটে কালীবন, বেতড়ে বেতাই।" বর্তমান শিবপুরের ধর্মতলার মোড়ে ধর্ম-মন্দির প্রায় চারশ বছরের প্রাচীন, শিবপুর বাজারে শিবমন্দিরও প্রায় পাঁচশ বছরের প্রাচীন। এই শিব-মন্দিরের জন্যই শিবপুর নাম। এছাড়া আছে প্রায় তিনশ বছরের পুরনো ব্রহ্মময়ী মন্দির। হাওড়ার এই অঞ্চলটি এককালে এমন একটি ধর্মের কেন্দ্রভূমিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার জন্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল-এ বলেছিলেন যে, মক্কা যাত্রীদের যেমন বিশ্রামস্থল ছিল জেড্ডা বন্দর, ঠিক তেমনি সপ্তগ্রামের বাণিজ্য যাত্রার নাবিকরা বেতড় বন্দরে বেতাই চণ্ডীকে প্রণাম জানিয়ে যেত।

পরবর্তী কালে স্থাপিত শিবপুরের হাজার হাত কালীর মন্দির ও সাঁতরাগাছির রামরাজার মন্দির বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ হয়েছে। শিবপুরের রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষের ভদ্রাসনে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদসহ এসেছেন; স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন (৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮)। শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত প্রণাম-মন্ত্র 'স্থাপকায়চ ধর্মস্য ...' তিনি নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে মূর্তি-প্রতিষ্ঠার সময় রচনা করেন।

হাওড়া স্টেশন থেকে কিছু দূরে ঘুষুড়ি কালীতলার অদূরে অবস্থিত ভোটবাগানের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন পুরাণগিরি (১৭৪৩-১৭৯৫) নামে শৈবসম্প্রদায়-ভুক্ত এক সন্ন্যাসী যিনি কয়েকবার বিশ্ব-পর্যটনে বেরিয়ে শ্রীলঙ্কা, মালয়, কাবুল, খোরাসান, মস্কো, ইস্পাহান, বসরা ও মস্কট হয়ে সুরাটে আসেন। পরে তিনি নেপাল ও মানস সরোবর পার হয়ে তিব্বতে যান। দলাইলামা তখন নাবালক থাকায় তাশীলামা ছিলেন তিব্বতের সর্বময় কর্তা। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে ভুটান রাজ্যের বিরোধ বাধলে তাশীলামা পুরাণগিরির মারফৎ হেস্টিংস-এর কাছে পত্র পাঠান। পরে হেস্টিংসও পুরাণগিরিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূত হিসাবে ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে লাসায় পাঠান। তাঁর মাধ্যমেই কোম্পানির সঙ্গে তিব্বতের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি পুরাণগিরি তাশীলামার সঙ্গে পিকিং যান এবং একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাশীলামার অনুরোধে পুরাণগিরি একটি মঠ বা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। হেস্টিংস হাওড়ার ঘুষুড়িতে একশ এবং পঞ্চাশ বিঘা দুই খণ্ড জমির ব্যবস্থা করে দেন। এইখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় ভোট-বাগান যা পরবর্তী যুগে তিব্বতী ও চীনা বণিক, বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মেলনক্ষেত্ররূপে পরিচিত হয়। পাঞ্চেনলামাও এই কেন্দ্রটি গড়ে তোলার জন্য অর্থসাহায্য করেন। বর্তমানে এটি শিবমন্দির রূপে পরিচিত। বলা চলে হাওড়ার বুকেই তখন গড়ে উঠেছিল আধুনিক অর্থে প্রথম বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন, অপরদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মিলনকেন্দ্র। আর পুরাণগিরি সেই অর্থে আধুনিক ভারতের একজন ভূপর্যটক, রাষ্ট্রদূত, ধর্মসংহতি স্থাপনের প্রবর্তক। হাওড়ার বুকেই এই অসাধারণ ঘটনাগুলি ঘটেছিল আজ থেকে দুশো বছরেরও আগে। এরই একশ বছর পরে স্থাপিত হয়েছিল হাওড়া জেলার বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়—যা পরবর্তী যুগে বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র রূপে খ্যাতিলাভ করেছে।

হাওড়ায় সংস্কৃত ও সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল অনেকদিন আগে। শ্রীধর-আচার্য, ভরত মল্লিক এবং প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের রচয়িতা কৃষ্ণমিশ্র হাওড়ায়

থাকতেন। সালকিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত রামলোচন কবিভূষণকে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোনস তাঁর সংস্কৃত শিক্ষক-রূপে নিয়োগ করেছিলেন। মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় এবং জনপ্রিয় বাঙালী কবি ভারতচন্দ্রের (জন্মস্থান হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতার নিকটবর্তী পেঁড়ো গ্রাম) মৃত্যুর পর থেকে বাঙলা-সাহিত্যে আধুনিক যুগ আসার আগে যে কবিয়ালের যুগ শুরু হয়েছিল তার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন সালকিয়ার রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮)। ব্যাঁটরার ঠাকুরদাস দত্তের পাঁচালী ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-দিকে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ঊনবিংশ শতকের প্রখ্যাত কবি আবদুল রহিম থাকতেন সালকিয়াতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত নাট্যকার হরিশচন্দ্র মিত্র (১৭৮৬-১৮২৩) সালকিয়াতে থাকতেন। আধুনিক যুগের বহু ঔপন্যাসিক, কবি ও সাহিত্যিক কর্ম এবং বসবাসের সূত্রে হাওড়ায় থেকে তাঁদের সাহিত্য রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার এবং জীবনানন্দ দাশ শিক্ষকতা সূত্রে হাওড়ায় ছিলেন। ঊনিশ শতকের মহিলা নাট্যকার কামিনীসুন্দরী দেবী শিবপুরে থাকতেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর—যাঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে গত বছর (২.১০.৮৯)—পৈত্রিক নিবাস হাওড়ার রামরাজাতলায়।

১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু যুবকদের জন্য হাওড়ায় যে বোর্ডিং স্কুলটি খোলা হয়েছিল সেটি হাওড়ার প্রথম ইংলিশ স্কুল। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা শিবপুর থেকে বিস্তৃত এলাকায় ছটি স্কুল স্থাপিত করেছিলেন। হাওড়া ময়দানের কাছে ১৮৪৫-এ প্রতিষ্ঠিত হাওড়া গভর্নমেন্ট স্কুল পরে জেলা স্কুলরূপে পরিচিত হয়েছিল। এই স্কুলে প্রথম ভারতীয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

হাওড়ায় আধুনিক যন্ত্রশিল্পের পত্তন হয় জাহাজ নির্মাণশিল্পকে কেন্দ্র করে। ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে জব চার্নক ও তাঁর সঙ্গীরা হাওড়ায় যে ডক নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন সেটি ভারত-বর্ষের প্রথম ডক স্থাপনের প্রচেষ্টা বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৭৯৬-এ সালকিয়াতে মিঃ বেকন একটি জাহাজ নির্মাণের ডক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০-তে গোলাবাড়ি এলাকায় ম্যাকেঞ্জি ডক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৮-এ 'ফরবেস' নামে হাওড়ায় প্রথম বাষ্পীয় পোতটি নির্মিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সালকিয়া থেকে শিবপুর পর্যন্ত আটটি বড় জাহাজ নির্মাণের ডক ছিল। হুগলি ডকের বাঙালী প্রতিষ্ঠাতা রাধানাথ বসু মল্লিক ১৮৩৮-এ জলপথে মাল পরিবহনের ব্যবসা শুরু করেন। রামকৃষ্ণপুর ও শিবপুরেও ডক ছিল।

হাওড়ার শিল্পপ্রয়াসও বেশ পুরনো। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর টেগোর কোম্পানির পত্তনের সময়েই ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে কিশোরীলাল মুখার্জী শিবপুর আয়রন ওয়ার্কস স্থাপন করেন। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে শিবপুরের ভড়পাড়ায় হেনরী উইলিয়াম একটি কারখানা স্থাপন করেন। পরে আন্দুল রোডে স্থানান্তরিত হয়ে সেটির নতুন নাম হয় গেস্ট-কীন উইলিয়াম। রেলগাড়ি নির্মাণশিল্পে হাওড়া ছিল অগ্রণী। ১৮৫৪-তে হাওড়া স্টেশন প্রতিষ্ঠার পর ১৮৮৩-তে শালিমার রেল টার্মিনাস, ১৯১৪-তে রেল কারখানা, ১৯২০-তে ব্রিজ অ্যান্ড রুফ তৈরি হয়। ১৮৬০-এ সালকিয়া শিবপুর প্রভৃতি অঞ্চলে চটকল স্থাপিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে হাওড়া, শিবপুর প্রভৃতি স্থানে জুট মিলের পর পর প্রতিষ্ঠা হতে থাকে।

হাওড়ার শিল্প-প্রচেষ্টা যে কত ঐতিহ্যপূর্ণ তা জানা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিককার ইম্পি-রিয়াল গেজেটে। সেই যুগের ৫৬টি কারখানার মধ্যে কাপড় কল ৩টি, চটকল ৯টি, পাট-বাঁধাই কল ৭টি, কাগজ কল ২টি, ময়দা কল ৩টি, রেলের ওয়াগন ও সাজসরঞ্জাম এবং ওয়াগন ও মেরামতির কারখানা ৪টি, লবণ তৈরির কারখানা ২টি, ছাপাখানা ১টি এবং আরও বিভিন্ন ধরনের কারখানা ছিল হাওড়াতেই। মোট কর্মীসংখ্যা ছিল ৫১,০০০। এছাড়া ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য হাওড়াকে এককালে 'ভারতের শেফিল্ড' নামে অভিহিত করা হতো।

ধর্মের সন্ধানে সোভিয়েত রাশিয়ায়

স্বামী ভাস্করানন্দ

১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে আমি রাশিয়া ভ্রমণে যাই। তখন রাশিয়ার প্রধান দুটি শহর মস্কো এবং লেনিনগ্রাদ ও বিশেষতঃ ককেসাস অঞ্চলের বেশ কিছু শহর ও গ্রামাঞ্চল দেখার আমার সুযোগ হয়েছিল। ককেসাসে ভ্রমণ আমাকে প্রধাণতঃ ট্যুরিস্ট বাসের সাহায্যে করতে হয়। বাসে যেতে যেতে সোভিয়েত রাশিয়াতে জনৈক ইংরেজ সহযাত্রীর সঙ্গে আমার মোটামুটি নিম্নলিখিত কথোপকথনটি হয়েছিল।

সহযাত্রী ঃ "আপনি তো ধর্মযাজক, এই ধর্ম-বর্জিত দেশে বেড়াতে এলেন কেন?"

আমি ঃ "এদেশে আমি এসেছি ধর্মের সন্ধানে।"

সহযাত্রী (অবিশ্বাসের স্বরে) ঃ "তাই নাকি?"

আমি ঃ "দেখুন, ব্যাপারটা তাহলে আমি খুলেই বলি। বছর কুড়ি আগে আমি সোভিয়েত সরকারের প্রকাশিত একটি বই পড়েছিলাম। বইটির নাম—Religion in the U. S. S. R.; লেখক—A. Puzin। তাতে বলা হয়েছিল যে, ধর্মের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকারের অনুসৃত নীতি হচ্ছে ঃ নাস্তিকতা প্রচার। উপযুক্ত প্রচার ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্রমে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিটি মানুষকে ধর্মবিশ্বাস-বিহীন করাই হচ্ছে সোভিয়েত সরকারের লক্ষ্য।

"কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের বলশেভিক বিপ্লবের পূর্বে, অর্থাৎ 'জার'-দের শাসনকালে, রাশিয়া ছিল অতি ধর্মসচেতন দেশ। সে-আমলে রাশিয়ায় বেশ কয়েকজন খ্রীস্টান সন্তেরও জন্ম দিয়েছে। রাশিয়ার ধর্মভীরু সাধারণ মানুষ তখন রাশিয়ার বহু সহস্র গির্জা, মসজিদ ও সিনাগগে উপাসনা করেছেন; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে হৃদয়ে শান্তি পেয়েছেন। এ ধর্মবিশ্বাস কি আইন বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মন থেকে দূর করা যায়? এবিষয়ে জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ এঙ্গেলস বলেন যে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মন থেকে ধর্ম-বিশ্বাস দূর করার চেষ্টা করলে সে-ধর্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ়ই করা হয়।

"বছর কয়েক আগে আমেরিকার একটি সংবাদ-পত্রে মস্কো থেকে সংগৃহীত একটি সংবাদ পড়েছিলাম। সংবাদটিতে বলা হয়েছিল যে, দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টার ফলে এতদিনে রাশিয়ার যুব-সমাজকে বা নতুন প্রজন্মকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মবিশ্বাসবিহীন করা সম্ভব হয়েছে। যদি এ সংবাদটি সত্যি হয় তাহলে প্রশ্ন উঠছে ঃ 'কি করে তা সম্ভব হলো? এবং এই ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তে এঁরা কি পেয়েছেন?' উত্তরে আপনি বলতে পারেন ঃ 'পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই তো ধর্মকে ঠিক ঠিক মানেন না। তাঁদের অধিকাংশই ধর্মকে স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেননি; তাঁরা তাঁদের ধর্ম পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন মাত্র। এভাবে প্রাপ্ত ধর্মের উপযুক্ত মর্যাদা তাঁরা সচরাচর দেন না অথবা দিতে পারেন না। ধর্মের শিক্ষা তাঁদের অধিকাংশের জীবনে আদৌ প্রতিফলিত হয় না। এঁদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল এবং একান্ত অগভীর। এই শিথিল ধর্মবিশ্বাস দূর করা এমন কঠিন হবে কেন? তাছাড়া এই উপযোগিতাভিত্তিক বস্তুতান্ত্রিক যুগে ধর্মের উপযোগিতা কতটুকু? এ ধর্ম গেলেই বা কি, আর থাকলেই বা কি?'

"এর উত্তরে আমি বলব যে, শুধু ব্যক্তিজীবনেই নয় সমাজজীবনেও ধর্মের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। ধর্ম কতগুলি নির্দেশিত আচার-ব্যবহার বা আচরণবিধির মাধ্যমে তার নিজস্ব সমাজ সৃষ্টি করে। এই ধর্মকেন্দ্রিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষ সে-সমাজের অপর মানুষের প্রতি নৈকট্যবোধ অনুভব করেন। ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে যেমন এক ধরনের অন্তরঙ্গতা দেখা যায়, এক ধর্মীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যেও তেমন অন্তরঙ্গতা, স্বাচ্ছন্দ্য বা নৈকট্যবোধ লক্ষ্য করা যায়।

"ব্যক্তিজীবনে ধর্মের উপযোগিতা কতটুকু তা নির্ণয় করার জন্য ইতিহাসের সাহায্য নেওয়া যাক। শুধু সুদূর অতীতেই নয়, বর্তমান যুগের ইতিহাসেই দেখা যায় যে, শুধু সত্যিকারের ধার্মিকেরাই নন, ধর্মে শিথিল-বিশ্বাসী মানুষেরাও প্রায়ই স্ব স্ব ধর্মের জন্য স্বেচ্ছায় নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেন এবং কঠোর

ত্যাগ স্বীকারে পরাঙ্মুখ হন না। উদাহরণস্বরূপ, ভারতবর্ষের পার্টিশানের কথাই ধরা যাক। সে ঐতিহাসিক দেশ-বিভাগের পর হিন্দু ও ইসলাম এই দুটি ধর্মের বহু ধনী এবং প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি, যাঁরা সমাজে একদা ক্ষমতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সমস্ত বিষয়সম্পত্তি ও বহু পুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে শরণার্থী হয়ে রিক্ত হস্তে হয় ভারত, নয় পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। এঁদের অধিকাংশই ব্যক্তিজীবনে ধর্মের শিক্ষা বা অনুশাসন তেমন মেনে চলেননি; তৎসত্ত্বেও এঁরা ধর্মের জন্য এই কঠোর ত্যাগস্বীকার ও দুঃখকষ্ট বরণ করলেন কেন?

"ধরে নেওয়া যাক, এঁরা যদি তখন স্বেচ্ছায় অপর ধর্মে ধর্মান্তরিত হতেন তাহলে খুব সম্ভবতঃ এঁদের বিষয়সম্পত্তি খোয়াতে হতো না, সামাজিক প্রভাব, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকত; এবং তাঁদের এই কঠোর ত্যাগস্বীকার করতে হতো না। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। স্ব স্ব ধর্মের কোনও উপযোগিতা তাঁদের ব্যক্তিজীবনে যদি তাঁরা অনুভব না করতেন তাহলে ধর্মের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে এঁরা কপর্দকহীন শরণার্থীর জীবন বরণ করতেন না। এ বিনিময়ধর্মী জগতে এঁরা যদি নিজ ধর্মের কাছ থেকে মহামূল্য কিছু না পেতেন তাহলে ধর্মের জন্য এই কঠোর ত্যাগস্বীকার এঁরা করতেন কিনা সন্দেহ।

"এ-প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠছে: 'ধর্ম এঁদের কি দিয়েছে যা এঁরা অন্যত্র পাননি? ধর্মের মাধ্যমে এঁরা কি পেয়েছেন যা এত মূল্যবান?'

"এ-প্রশ্নের উত্তরে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর সকল মানুষই মুখ্যতঃ চান নিরাপত্তা; নিছক ক্ষণস্থায়ী নিরাপত্তা নয়—চিরস্থায়ী নিরাপত্তা। তাঁরা চান জীবন, স্বাস্থ্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মান-সম্মান, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, জীবিকা ও ধনসম্পত্তির ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী নিরাপত্তা। তদুপরি তাঁরা চান ন্যায়বিচার, যদি না সে-ন্যায়বিচার তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিকূল হয়।

"কিন্তু মানবসমাজ অথবা কোন রাষ্ট্র যতই উন্নত হোক না কেন বড়জোর দিতে পারে খাদ্য, জীবিকা, আবাস, স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে আংশিক নিরাপত্তাবোধ। জীবন, ধনসম্পত্তি, স্বাস্থ্য, মানসম্মান ও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সত্যিকারের কোন চিরস্থায়ী নিরাপত্তাবোধ কেউ দিতে পারে না। কোন রাষ্ট্রের কোর্ট বা আদালত সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতে পারে না। কিছু নিরপরাধীকেও শাস্তি পেতে হয় এবং বহু অপরাধীর শাস্তি হয় না।

"পক্ষান্তরে অধিকাংশ ধর্মই শিক্ষা দেয়—সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরসদৃশ মহাপুরুষদের কৃপায় মানব-জীবনের সকল প্রত্যাশাই পূর্ণ হওয়া সম্ভব। ধর্ম আশ্বাস দেয় যে, মৃত্যুর পর স্থূলদেহ বিনষ্ট হলেও সূক্ষ্মাকারে মানুষের সত্তা অব্যাহত থাকবে। এই পার্থিব আপাত ক্ষণস্থায়ী জীবন চিরস্থায়ী মহাজীবনের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কোন কোন ধর্ম সর্বপ্রকার দুঃখ ও যাতনার আত্যন্তিক নিবৃত্তির আশ্বাস দেয়!

"ধর্ম আরও বলে যে, ঈশ্বর হচ্ছেন চরম বিচারকর্তা। তাঁর অমোঘ ন্যায়দণ্ডের হাত থেকে দুষ্কৃতকারীর নিস্তার নেই। ধর্মাচারীদের এ পৃথিবীতে কখনো কখনো কষ্ট ভোগ করতে দেখা যায়; অধর্মাচারীরা প্রায়ই করেন সুখভোগ। কিন্তু ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত ধার্মিকদের পুরস্কৃত করবেন; যাঁরা অধার্মিক তাঁরা করবেন কষ্টভোগ। এধরনের বহু আশ্বাসের মাধ্যমে ধর্ম সাধারণ মানুষের মনে এক বিশেষ ধরনের নিরাপত্তাবোধ এনে দেয়। মানুষের মনোজগতে এই নিরাপত্তাবোধের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এধরনের নিরাপত্তাবোধ নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত ও ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও মানবমনের স্থৈর্য বা ভারসাম্য সহজে নষ্ট হতে দেয় না।

"ধর্মকে বা ধর্মবিশ্বাসকে যদি সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষের মন থেকে সত্যি সত্যিই উৎখাত করা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে ধর্মকেন্দ্রিক সে-নিরাপত্তাবোধও নিশ্চয়ই তাঁদের মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। সে-শূন্যস্থান পূর্ণ হচ্ছে কি দিয়ে? তাছাড়া ধর্মবর্জিত সমাজসৃষ্টির যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সোভিয়েত রাশিয়াতে গত আট দশক ধরে চলছে তার সফলতা কতদূর হয়েছে, তার শুভ বা অশুভ ফলই বা কী, এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যই আমি এদেশে বেড়াতে এসেছি।"

আমার এই নাতিদীর্ঘ বক্তব্য শোনার পর আমার ইংরেজ সহযাত্রীটি বললেন : "আপনার কথাগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক।" এই বলে দু-একবার হাই তুলে এবং চোখ বন্ধ করে তিনি একটু দিবানিদ্রার চেষ্টা করতে লাগলেন।

॥ ২ ॥

বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিপ্লবের পরবর্তী ৭৩ বছরের মধ্যে প্রথম ৪৭ বছর সোভিয়েত রাশিয়াতে ধর্মকে কমবেশি উৎপীড়ণের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। এর পরের ২১ বছরকে ধর্মের ক্ষেত্রে 'উপেক্ষার যুগ' বলা যায়। বাকি পাঁচ বছরকে আমি বলব 'সহনশীলতার যুগ'।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দব্যাপী লেনিনের আমলে চার্চকে সরকার থেকে পৃথক করা হয়। কিন্তু সমস্ত চার্চ বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারের ক্ষমতাধীনে আনা হয়। সমস্ত ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও জমিজমা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। লেনিন কোন গির্জা বা উপাসনালয় বন্ধ করেননি, ধর্মযাজকদের ওপর কোন অত্যাচার করেননি ; কিন্তু তাঁর আমলে রাশিয়াতে যে অন্তর্বিপ্লব হয়েছিল তার ফলে সৈন্য ও দুর্বৃত্তদের হাতে বেশ কিছু ধর্মযাজক মারা যান।

এরপর এল স্ট্যালিনের যুগ। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৯ বছর স্ট্যালিন ক্ষমতাসীন ছিলেন। স্ট্যালিনের যুগকে সন্ত্রাসের যুগ বলা যায়। সমগ্র সোভিয়েত রাশিয়া 'পুলিস স্টেট' পরিণত হয়। রাশিয়ানরা এযুগকে বলেন 'personality cult-এর যুগ।' এ যুগে সোভিয়েত রাশিয়াকে সম্পূর্ণরূপে 'লৌহ যবনিকার' অন্তরালে আনা হয়। বহির্জগৎ থেকে—সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্মের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে—তা জানা এ আমলে প্রায় অসম্ভব ছিল। ইদানীং স্ট্যালিনের যুগের রাশিয়ার অনেক অপ্রিয় ঐতিহাসিক তথ্য জানা যাচ্ছে।

অনুমান যে, স্ট্যালিনের আমলে সোভিয়েত রাশিয়ার অর্ধেকেরও বেশি গির্জা, মসজিদ ও সিনাগগ হয় বন্ধ নয় ধ্বংস করা হয়েছিল। একমাত্র মস্কো শহরেই শ-খানেক উপাসনালয় ধ্বংস করা হয়। মস্কোতে আট-দশটি মাত্র গির্জা স্ট্যালিনের আমলে খোলা ছিল।

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত রাশিয়ার কর্ণধার হলেন। রাশিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা ও স্ট্যালিনের আমলের সন্ত্রাস-নীতি বহুলাংশে দূর করার জন্য রাশিয়া বর্তমানে তাঁর কাছে ঋণী। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের চেয়ে খুব বেশি সহনশীল ছিলেন না। তাঁর আমলে বহু গির্জা ও উপাসনালয়কে সরকারি দপ্তরে পরিবর্তিত করা হয়। কিছু গির্জা, মসজিদ প্রভৃতিকে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়। অবহেলা ও মেরামতের অভাবে বহু গির্জা ও উপাসনাগৃহ অব্যবহার্য হয়ে পড়ে, নতুবা ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। ক্রুশ্চেভের আমলে পাঁচ-ছ হাজার চার্চ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বেশ কিছু সংখ্যক গির্জা ও উপসনালয়কে ভেঙ্গে ফেলা হয়। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে ক্রুশ্চেভের পদচ্যুতির কিছু পূর্বে তিনি মস্কোর বিখ্যাত 'রেড স্কোয়ারের' অনতিদূরে তিনটি ছোট অথচ অতি সুন্দর গির্জাকে ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ফলে তাঁর আদেশ কাজে পরিণত হয়নি।

১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে ক্রুশ্চেভের পরে এলেন ব্রেজনেভ। ব্রেজনেভের যুগকে রাশিয়ানরা বলেন 'নিষ্ক্রিয়তার যুগ' (the period of stagnation)। তাঁর আমলে রাশিয়ার সামরিক শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও ভোগ্যপণ্যের বা দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্রের সরবরাহ অত্যন্ত কমে যায়। ব্রেজনেভের যুগ সরকারি মহলের দুর্নীতির জন্য কুখ্যাত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রেজনেভই সর্বপ্রথম রাশিয়ার বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠী, বিশেষতঃ সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বপ্রধান গির্জা 'রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের' প্রতি কিছুটা সহানুভূতি দেখাতে আরম্ভ করেন। তাঁর আমলে এক মুমূর্ষু খ্রীস্টানের অন্তিম প্রার্থনা সত্ত্বেও ধর্মযাজককে সেই মৃত্যু-পথযাত্রী ব্যক্তির কাছে যেতে অনুমতি না দেওয়ার জন্য জনৈক সরকারি আমলাকে জেলে দেওয়া হয়। এধরনের ঘটনা ব্রেজনেভের আমলের পূর্বে কম্যুনিস্ট রাশিয়াতে কখনো ঘটেনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সোভিয়েত রাশিয়াতে শিক্ষার খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। রাশিয়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যুক্তি, বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ধর্ম এক ধরনের কুসংস্কার মাত্র।

॥ ৩ ॥

ককেসাস অঞ্চলে বেড়াবার সময় আমি ককেসাস পর্বতমালার পাদমূলে অরদ্‌জোনিকিদ্‌জে (Ordzhonikidze) শহরে গিয়েছিলাম। শহরটি 'উত্তর ওসেসিয়ান স্বশাসিত গণরাজ্যের' রাজধানী। শহরটিতে আমি একটি সুন্দর মসজিদ দেখেছি। মসজিদটিকে একটি মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়েছিল সম্ভবতঃ স্ট্যালিন অথবা ক্রুশ্চেভের আমলে। মসজিদের ভিতরে উঁচু সিলিং থেকে বিখ্যাত ফরাসী পদার্থবিদ্যাবিদ্ ফুকোর (Foucault) পেন্ডুলামের মতো বিরাট একটি পেন্ডুলাম মেঝে পর্যন্ত ঝোলানো রয়েছে দেখতে পেলাম। উদ্দেশ্য—জনসাধারণকে অবহিত করা যে, ইসলামধর্ম অথবা খ্রীস্টধর্ম বিজ্ঞানসম্মত নয়। এ দুটি ধর্ম অনুযায়ী পৃথিবী স্থির রয়েছে; সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে। পেন্ডুলামটির ক্রমপরিবর্তনশীল গতিপথ দ্বারা প্রমাণ করা হচ্ছে যে, পৃথিবী আবর্তনশীল, স্থির নয়। সূর্য নয়, পৃথিবীই সূর্যকে পরিক্রমা করছে।

ধর্মের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকালের দমননীতির ফলে বিপ্লবোত্তর যুগের প্রথম অবস্থায় যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন, তাঁদের সবার মন থেকে ধর্মবিশ্বাস আইন বা শাস্তির ভয় দেখিয়েও দূর করা যায়নি। সেক্ষেত্রে এঙ্গেলসের কথাই সত্যি হয়েছে অনুমান করা যায়। রাশিয়ানদের মধ্যে যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের ধর্মবিশ্বাস দমননীতির ফলে খুব সম্ভবতঃ আরও দৃঢ়ই হয়েছিল। কিন্তু ততদিনে সোভিয়েত রাশিয়াতে যেকোন প্রকারের ধর্মপ্রচার আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই তখন পিতামাতাদের পক্ষেও প্রকাশ্যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের ধর্মের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া মোটেই নিরাপদ ছিল না।

আমি গত বছর আগস্ট মাসে যখন সোভিয়েত রাশিয়াতে যাই তখন সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান গোরবাচভ সেখানে 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রৈকার' সূত্রপাত করেছেন। শাস্তির ভয়ে ভীত রাশিয়ার মূক জনতা তখন ক্রমে ক্রমে মুখর হতে আরম্ভ করেছেন। বুদ্ধিজীবীরা উৎসাহের সঙ্গে গোরবাচভের এই নীতি-পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন। ছাত্রসমাজ উল্লসিত। কিন্তু রাশিয়ার খেত-খামারের শ্রমিকরা সন্দেহাচিত্ত; গোরবাচভের পূর্ববর্তী নেতাদের অনেকেই বহুবার তাঁদের আশাভঙ্গের কারণ হয়েছিলেন। পেরেস্ত্রৈ-কার মাধ্যমে গোরবাচভ যে-ধরনের সর্বাঙ্গীণ পরি-বর্তন সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজের সর্বস্তরে আনতে চাইছেন সে-পরিবর্তন কার্যকরী করতে হলে বহু পুরনো আইনকে রদ করতে হবে। ধর্মাচরণের স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি গোরবাচভ দিতে চাইছেন তা কার্যকরী হতে হলে ধর্মপ্রচার-নিরোধক আইনটি সর্বপ্রথমে রদ করা দরকার। কিন্তু আমি যখন গতবছর আগস্ট মাসে সোভিয়েত রাশিয়াতে ছিলাম তখনো পর্যন্ত সে আইনটি সংস্কৃত বা রদ করা হয়নি।

রাশিয়ার নয়া প্রজন্ম এখন আর ধর্মবিশ্বাসী নয় বলে যে-দাবি করা হয়েছিল, আমার অভিজ্ঞতায় তা সাধারণভাবে সত্যি বলা চলে। এঁদের অধিকাংশই নিজ জীবনে ধর্মের আদৌ প্রয়োজনবোধ মনে করেন না। বিগত ষাট বা পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে যাঁরা কম্যুনিস্ট রাশিয়াতে জন্মেছেন তাঁরাই এখন রাশিয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের অধিকাংশই নাস্তিক। এঁদের পূর্বে যাঁরা জন্মেছেন এবং বর্তমানে জীবিত রয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন সংখ্যালঘু। এই সংখ্যালঘু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই এখনো ধর্মে বিশ্বাসী। এঁরাই বিভিন্ন উপাসনালয়-গুলিতে যান। রাশিয়ার বর্তমান নেতা গোরবা-চভের বয়স ষাট বছর। তিনি নাস্তিক; কিন্তু এঁর বৃদ্ধা মা ধর্মে বিশ্বাসী। তিনি নিয়মিত গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেন।

রাশিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ইংরেজ সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক মার্টিন ওয়াকার বলেন: "গোরবাচভ যদিও নাস্তিক তবু তিনি মনে করেন যে, 'চার্চ'কে এখন দেশের শত্রু ভাবাটা ঠিক হবে না। বিপ্লবের পর প্রায় আশি

বছর কেটে গেছে। ধর্মবিশ্বাসী হলেই যে রাশিয়ার কোন লোক রাষ্ট্রবিরোধী হবে এমন ভাবার এখন আর কারণ নেই।"

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পেলে বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়াতে কারা ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হবেন? সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীরা—যাঁরা ধর্মজীবন যাপনের প্রয়োজন আদৌ বোধ করেন না—তাঁরা কি হঠাৎ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হবেন?

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, সে-সম্ভাবনা বিশেষ নেই। রাশিয়াতে ভ্রমণকালে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে, রাশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ নাস্তিক মানুষেরা তাঁদের মনোজগতে ধর্মের উচ্ছেদের ফলে যে-শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছে তা কম্যুনিজমের ভাবাদর্শ দিয়ে পূর্ণ করেছেন। ধর্ম মানবমনে যে বিশেষ ধরনের নিরাপত্তাবোধ এনে দেয় কম্যুনিজমের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী নাস্তিক সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষ, বিশেষতঃ সেখানকার যুবসমাজ, অনুরূপ নিরাপত্তাবোধ কম্যুনিজমের মাধ্যমে পাওয়ার আশা এতদিন হৃদয়ে পোষণ করে এসেছেন। তাঁদের বলা হয়েছিল যে, কম্যুনিস্ট পার্টি মেহনতী মানুষের পরম হিতৈষী, পরম সুহৃদ। মেহনতী মানুষের কল্যাণই পার্টির একমাত্র লক্ষ্য। কম্যুনিজমের মাধ্যমেই একমাত্র সমগ্র পৃথিবীতে শোষণবর্জিত ও ভোগ-তারতম্যবিহীন সমাজ সৃষ্টি করা সম্ভব। আরও বলা হয়েছিল যে, কম্যুনিস্ট পার্টি কখনো ভুল করতে পারে না।

কিন্তু আদর্শ যত উঁচুই হোক না কেন আদর্শ যদি কাজে পরিণত না করা যায়, তাহলে সে-আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা বেশি দিন বজায় রাখা চলে না। বিগত ৭৩ বৎসরব্যাপী কম্যুনিস্ট আমলে রাশিয়ার সাধারণ মানুষ সরকারের রাজনৈতিক ভাবাদর্শকে পার্টির মাধ্যমে প্রতিফলিত হতে দেখেননি। তাঁরা দেখেছেন যে, পার্টি প্রায়ই ভুল করে; বিগত আট দশকেও সত্যিকারের ভোগ-তারতম্যবিহীন সমাজ সোভিয়েত রাশিয়াতে সৃষ্টি হয়নি। সমগ্র পৃথিবীর মেহনতী মানুষেরা এক সম্মিলিত বিরাট আদর্শ মানবসমাজ একদিন গঠন করবেন বলে যে-আশা রাশিয়ার মানুষের মনে সৃষ্টি করা হয়েছিল কার্য-ক্ষেত্রে তা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে। কম্যুনিস্ট মহাচীন ও কম্যুনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়া একই রাজনৈতিক ভাবাদর্শের অনুরাগী হয়েও শেষপর্যন্ত বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারেননি। ইউরোপ ও এশিয়ার ছোট বড় অনেক কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ভাবা-দর্শকে ছাপিয়ে 'ন্যাশন্যালিজম'কে মাথা তুলতে দেখা গিয়েছে।

ভোগ-তারতম্য অন্যান্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রেও রয়েছে। ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে যখন আমি চীনদেশে গিয়েছিলাম তখন জনৈক সুশিক্ষিত চীনা যুবকের সঙ্গে আমার একদিন কথা হচ্ছিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে যুবকটি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য নন। আমি তখন জানতে চাইলাম কেন তিনি পার্টির সভ্য হননি। তখন যুবকটি বললেন: "পার্টির মেম্বার হতে হলে অনেক বই পড়তে হয় এবং পরীক্ষা দিতে হয়, আমি তাই সে-চেষ্টা করিনি।" আমি তখন বললাম: "এদেশে পার্টির মেম্বার হলে কি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়?" যুবকটি এদিক ওদিক তাকিয়ে অর্থপূর্ণভাবে মুচকি হেসে বললেন: "যেতেও পারে।"

এসব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে, সোভিয়েত রাশিয়ার কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শ যদি সেখানকার সাধারণ মানুষের আশাভঙ্গের কারণ হয়ে থাকে তাহলে বহু নাস্তিক রাশিয়ান শেষপর্যন্ত ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হতেও পারেন। রাশিয়াতে ইদানীং অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্মের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন বলে জনৈকা বিদুষী রুশ মহিলা আমাকে জানিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, বেশ কিছু যুবক ইদানীং 'রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ' ও 'জর্জিয়ান অর্থোডক্স চার্চে' ধর্মযাজক হওয়ার জন্য যোগ দিচ্ছেন। আমি প্রশ্ন করলাম: "কেন?" তিনি উত্তর দিলেন: "গির্জার ধর্মযাজকদের আয় আজকাল যথেষ্ট; মনে হয় এর জন্যেই।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই চার প্রকার ভক্তের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ধর্মের প্রতি আকর্ষণ অনেক সময় রাজনৈতিক কারণেও হতে দেখা যায়। পোল্যান্ড হচ্ছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পোল্যান্ডে কম্যুনিস্ট সরকার

যখন ছিল (ইদানীং সেখানে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়েছে; 'সলিডারিটির' নেতৃবৃন্দ সেখানে সবেমাত্র অকম্যুনিস্ট সরকার গঠন করেছেন) তখন *পৃথিবীর সমস্ত খ্রীস্টান দেশগুলির মধ্যে পরিসংখ্যান* অনুযায়ী পোল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি লোক নিয়মিত ভাবে গির্জায় যেতেন। আনুমানিক ৯৫ শতাংশের অধিক খ্রীস্টানকে সেখানে গির্জাতে যেতে দেখা গিয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অকম্যুনিস্ট ও সমৃদ্ধিশালী খ্রীস্টান দেশগুলিতে—যেখানে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত উন্নত—গির্জাগুলির অধিকাংশে দু-চারটি খ্রীস্টীয় উৎসবের সময় ভিন্ন প্রায় শূন্যই থাকে। এথেকে এই ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে যে, পোল্যান্ডের লোকেরা অন্যান্য খ্রীস্টান দেশের অধিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি ধার্মিক। কিন্তু যে-কারণে পোল্যান্ডের খ্রীস্টান অধিবাসীরা এত অধিক সংখ্যায় গির্জায় যেতেন সে-কারণটি মুখ্যতঃ রাজনৈতিক। এর পেছনে পোল্যান্ডবাসীদের মনে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছিল ভাবলে ভুলই হবে। অপ্রিয় নাস্তিকতাবাদী কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে পোল্যান্ডবাসীরা এভাবে তাঁদের অহিংস প্রতিবাদ জানাতেন মাত্র!

সোভিয়েত রাশিয়াতেও সরকারের বা পার্টির বিরুদ্ধে বহু সাধারণ মানুষের মনে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ রয়েছে। ককেসাস অঞ্চলের বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস পিয়াটিগরস্ক (Pyatigorsk) শহরে আমি যখন গিয়েছিলাম তখন আমাদের হোটেলের অভ্যর্থনা বিভাগের একটি কমবয়সী মহিলা কর্মীকে আমার এক সহযাত্রী বলেছিলেন: "আপনি তো খুব হাসিখুসি স্বভাবের দেখছি; কিন্তু বাইরের অন্যান্য মহিলাদের তো তেমন হাসতে দেখি না?" তখন সে-মহিলা কর্মীটি উত্তর দিলেন: "আমি আপনাদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছি একারণে নয় যে, আমি খুব আনন্দিত। হোটেলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের হাসতে আদেশ দিয়েছেন বলেই আমি হাসছি।"

রাশিয়ার প্রায় সর্বত্র কর্মীদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে অনীহা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি কাজেই প্রায় গাফিলতির লক্ষণ দেখা যায়। তাঁরা নাকি বলেন: "এরা (অর্থাৎ সরকার) আমাদের বেতন দেওয়ার ভান করেন, আমরাও কাজ করার ভান করি!"

রাশিয়ার হাসপাতালগুলিতে নীচু তলার কর্মচারীদের প্রায়ই দু-চার রুবল ঘুস না দিলে ভাল সেবা পাওয়া যায় না। এধরনের দুর্নীতি অন্যত্রও রয়েছে।

রাশিয়ার জনসাধারণের অধিকাংশের মনে যে অসন্তোষ রয়েছে তা ব্যক্তি-স্বাধীনতা বৃদ্ধি পেলে কিভাবে প্রকাশ পাবে এখন সঠিকভাবে অনুমান করা কঠিন। পোল্যান্ডের অধিবাসীদের মতো রাজনৈতিক কারণে ধর্মের ব্যবহার তাঁরাও করবেন কি?

ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীনতা পেলে সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মৈত্রীভাব বজায় থাকবে কিনা এবিষয়ে ইদানীং এর ঘটনা-পরম্পরা দেখে সংশয় দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে আর্মেনিয়া ও আজেরবাইজানে যে-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে তার কারণ মুখ্যতঃ রাজনৈতিক হলেও এই হিংসাত্মক ঘটনাগুলিতে উভয় প্রদেশের খ্রীস্টান ও মুসলমান অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসের গৌণ অবদান আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার জর্জিয়া প্রদেশে ভ্রমণ করার সময় শুনেছি যে, সংখ্যালঘু চার্চ বা ধর্মসম্প্রদায়গুলির মনে ভয় ঢুকেছে যে, সোভিয়েত সরকারের ইদানীং সমর্থনপুষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ 'রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ'ই সে-দেশে ধর্মের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করবে। সোভিয়েত রাশিয়াতে 'রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ ছাড়াও 'লুথারান', 'জর্জিয়ান অর্থোডক্স', 'ক্যাথলিক', প্রভৃতি খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের চার্চ রয়েছে। এ ছাড়াও সোভিয়েত রাশিয়াতে বেশ কিছু ইসলামধর্মাবলম্বী রয়েছেন। ইহুদীদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। বহু ভাষা, বহু কৃষ্টি ও বহু ধর্মমত-সমন্বিত সোভিয়েত রাশিয়াতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যদি মৈত্রীভাব রক্ষা করা সম্ভব না হয় তাহলে সোভিয়েত রাশিয়ার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। সে-সম্ভাবনার কথা বিচার করে আমাদের মনে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী যদি সে-দেশে প্রচার করা সম্ভব হয় তাহলে হয়তো তা সোভিয়েত রাশিয়াতে খুবই মঙ্গলপ্রসূ হতে পারে।

অনেকেই হয়তো জানেন যে, ইদানীং মস্কোতে একটি 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র সূত্রপাত হয়েছে। রাশিয়ার 'রাইটার্স ইউনিয়ন'-এর কিছুসংখ্যক প্রভাবশালী সদস্য এই সোসাইটি সৃষ্টির ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। ধর্মপ্রচার-নিরোধক আইনটি রদ হলে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' আইনানুগভাবে যথারীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। বর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দের জনকল্যাণমূলক সমাজচেতনার দিকটিই বিশেষ করে বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করেছে। আবার কেউ কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রতি ক্রমশঃ শ্রদ্ধান্বিত হচ্ছেন। নাস্তিকতাপ্রধান সোভিয়েত রাশিয়াতে আমাদের মনে হয় জ্ঞানযোগ তথা বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

আমি যখন জর্জিয়াতে বেড়াতে যাই তখন আমাদের ট্যুর গাইড ছিলেন জনৈকা মধ্যবয়স্কা রাশিয়ান মহিলা। মহিলাটি বহুভাষী এবং উচ্চশিক্ষিতা।

রাশিয়ার জর্জিয়া প্রদেশের বর্তমান রাজধানী টিবিলিসি। সেখানকার একটি হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। একদিন হোটেল থেকে ট্যুরিস্ট বাসে আমাদের টিবিলিসি শহরের অনতিদূরে মাৎসখেটা (Mtskheta) বলে একটি প্রাচীন শহরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। শহরটি ৩০০০ বছরের পুরনো। এ শহরটিতে একটি বিখ্যাত গির্জা রয়েছে। নাম: ক্যাথিড্রাল অফ স্বেতিতস্কোভেলি (Cathedral of Svetitskhoveli)। আমরা যখন গির্জাটি দেখতে যাই তখন সেখানে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠানটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাচীন গির্জাটির পবিত্র ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে আমরা প্রায় আধঘণ্টা ছিলাম। আমাদের গাইডও ততক্ষণ আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন। অনুষ্ঠানটি শেষ হলে বেরিয়ে এসে আমি গির্জাটির বহিঃচত্বরে একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের গাইডও আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন: "স্ট্যালিনের আমলেও এ গির্জাটি বন্ধ করা হয়নি। গির্জাটি কেমন লাগল আপনার?" আমি বললাম: "সব মন্দির ও উপাসনালয়ই আমার ভাল লাগে। এসব স্থানে এলে ধর্মভাবের উদ্দীপন হয়।" তখন মহিলাটি বললেন: "ধর্ম কি জিনিস আমি তা ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না; কারণ আমি নাস্তিক। কিন্তু যখন গীর্জাটিতে অনুষ্ঠানটি হচ্ছিল তখন আমি প্রাণে এক ধরনের শান্তি পাচ্ছিলাম। খুব সম্ভবতঃ সেটা গির্জার শান্ত পরিবেশের প্রভাব।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "এধরনের শান্তি কি আপনি অন্য কোথাও পেয়েছেন?" তদুত্তরে তিনি বললেন: "হ্যাঁ, যখনই আমি সুযোগ পাই তখন জনকোলাহলের বাইরে নির্জন বনভূমিতে ক্যাম্পিং-এ (Camping) যাই। তাঁবুর মধ্যে বসে আমি পাখির ডাক শুনি; প্রজাপতি ও মৌমাছিদের ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করতে দেখি; কখনো বা ঝিঁঝিঁর ডাক শুনতে পাই। অরণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ক্রমে আমার মন শান্ত হয়ে আসে; আমি তখন হৃদয়ে এক অপার্থিব আনন্দ পাই। কিন্তু সে-আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শহরে আমার কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলে সে-আনন্দ আবার ম্লান হয়ে যায়।"

ওঁর একথা শুনে আমার মন হঠাৎ এক গভীর সমবেদনায় পূর্ণ হলো। ওঁর মাধ্যমে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, রাজনৈতিক প্রচার মানবমন থেকে ধর্মবিশ্বাসকে দূর করতে পারলেও মানবহৃদয়ের শান্তির তৃষ্ণাকে হনন করতে পারে না। উপনিষদের বাণীও মনে পড়ল। সে-বাণীর আলোকে দেখতে পেলাম যে, সংসারের তীব্র অনলে দগ্ধ মানুষের মন শান্তি বা আনন্দের সন্ধানে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে শেষপর্যন্ত নিজের সত্তার গভীরে সেই অন্বেষিত শাশ্বত শান্তি এবং অনন্ত আনন্দকে খুঁজে পাবে। এবং নিরুপাধিক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে পরিপূর্ণ এবং কৃতকৃত্য হবে।

আরও দেখতে পেলাম যেন সোভিয়েত রাশিয়ার ধর্মবিশ্বাসবর্জিত বহু তৃষিত প্রাণ তাদের অজ্ঞাতসারেই উপনিষদের বাণীর পথ চেয়ে বসে আছে।

কলকাতায় কয়েকটি ভাইরাস রোগ

সন্দীপকুমার চক্রবর্তী

কলকাতা তার সুদীর্ঘ ৩০০ বছরের পথপরিক্রমায় বহু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। কত রাজনৈতিক উত্থান-পতন, সাংস্কৃতিক ঘটনা, কত মনীষীর কর্মযজ্ঞের ক্ষেত্র যেমন এই কলকাতা, তেমনই কত রোগ ও মহামারীর সাক্ষী হয়ে আছে এই শহর। বহু ধরনের ব্যাধি কলকাতায় ছিল, পরবর্তী কালে কোন কোন ব্যাধি দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে, আবার কিছু নতুন রোগের সূত্রপাতও হয়েছে। বহুধরনের রোগের মধ্যে ভাইরাস-জনিত যে-সকল রোগের কথা আমরা জানি তা এই শহরে কতদিন থেকে আছে তা বলা শক্ত। বর্তমানে পরীক্ষাগারে উন্নততর পরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের উদ্ভাবনের ফলে বহু ভাইরাস-জনিত রোগের প্রকৃত স্বরূপ এখন ক্রমশঃ জানা যাচ্ছে।

সাধারণ ভাইরাস রোগগুলি যা এই কলকাতা শহরে সচরাচর দেখা যায় ও বিশেষ ঋতুতে এদের সংখ্যাধিক্য ঘটে তার মধ্যে জলবসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মাম্পস প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এছাড়া রুবেলা ও সাইটোমেগালো ভাইরাস-জনিত রোগের সন্ধানও পাওয়া গিয়েছে এই কলকাতা শহরে। শেষোক্ত রোগদুটির উল্লেখ করার অর্থ এই যে, গর্ভাবস্থায় মায়েদের এই রোগ হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হবার সম্ভাবনা থাকে।

শুরু করা যাক গুটিবসন্ত রোগ (small pox) দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে বসন্ত রোগের ইতিহাস কলকাতার ইতিহাসের চেয়েও পুরনো। কলকাতায় এই রোগ প্রায় প্রতি বছরই মহামারীর আকারে দেখা যেত ; শত শত শিশু, নারী-পুরুষ এই রোগে আক্রান্ত হতো। সত্তর দশকের আগে এই বসন্ত রোগ ছিল কলকাতার বুকে এক বিভীষিকা। বর্তমান বেলেঘাটায় ইনফেকশাস ডিজিস (Infectious disease) বা আই. ডি. হাসপাতালে এক সময়ে বসন্ত রোগীদের জন্য আলাদা বিভাগ (ward) থাকত—যেখানে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে শত শত রোগী এসে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হতো। যদিও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টিকা আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং তার প্রয়োগও হতো এবং কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরোলজি বিভাগ বসন্ত রোগ সংক্রমণের ধারা নিয়ে মৌলিক গবেষণা ও তথ্য পরিবেশনও করেছিল ; তবুও রোগটিকে আয়ত্তে আনা যায়নি। অবশেষে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O.) ও অন্যান্য দেশের সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় বসন্ত রোগ ১৯৭৫ খৃীস্টাব্দ থেকে সারা পৃথিবী থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছে।

ডেঙ্গু জ্বর কলকাতার অপর এক ভাইরাস-জনিত রোগ। মোটামুটিভাবে এই রোগ খুব ভয়ঙ্কর না হলেও সময়ে সময়ে মানুষকে সাময়িকভাবে পঙ্গু করে দিতে পারে। হঠাৎ প্রচন্ড জ্বর ও তার সাথে মাথা ব্যথা, গায়ে ও গাঁটে গাঁটে বেদনা, সারা দেহে লালচে চাকা চাকা দাগ এই রোগের লক্ষণ। ইডিজ জাতীয় মশা এই রোগের ভাইরাস বহন করে। ভাইরাসবাহী মশা কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে তিন-চার দিনের মধ্যে সে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হতে পারে। বর্ষাকালে মশার বংশবৃদ্ধির সাথে সাথে ডেঙ্গু রোগের আধিক্য দেখা যায়। রক্ত পরীক্ষার দ্বারা সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কলকাতায় শতকরা ৯৮জন ব্যক্তিই জীবনে কোন-না-কোন সময়ে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকে। জানা গিয়েছে, অতীতেও কলকাতায় ডেঙ্গু জ্বর সময়ে সময়ে এমন সমস্যা সৃষ্টি করেছিল যে, ১৮৭২ খৃীস্টাব্দে ডেঙ্গুর ভয়ে বালক রবীন্দ্রনাথকে কলকাতা ছেড়ে পানিহাটিতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ হঠাৎ ভিন্নরূপ নিল ১৯৬৩ খৃীস্টাব্দে। ঐ সময়ে ও পরবর্তী দু'বছর ধরে ডেঙ্গু জ্বরে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়। দেহের

বিভিন্ন স্থান থেকে, যেমন শ্বাসনালি বা পেট থেকে, প্রস্রাবের সঙ্গে কয়েকদিন ধরে রক্তক্ষরণ হয়ে রোগী এক সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছে যায় ; নাড়ির গতি অতি ক্ষীণ ও দ্রুত হারে চলতে থাকে। সময় মতো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে না পারলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ট্রপিক্যাল স্কুলের ভাইরোলজি বিভাগ তিনশোর বেশি রক্তক্ষরণজনিত ডেঙ্গুরোগীর সমীক্ষা তথা পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষায় শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই রোগের আধিক্য ও মৃত্যুহার লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের ডেঙ্গু জ্বর পরবর্তী কালে কলকাতায় ব্যাপকভাবে দেখা না গেলেও বিচ্ছিন্নভাবে এখনো দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কদাচিৎ হলেও এই কলকাতায় কয়েক বছর আগে এক এনসেফেলাইটিস (মস্তিষ্কপ্রদাহজনিত রোগ) রোগীর মস্তিষ্ককোষ থেকে ডেঙ্গু ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে : সুতরাং এই ভাইরাস ক্ষেত্র-বিশেষে মস্তিষ্কপ্রদাহ ঘটাতে সক্ষম।

এনসেফেলাইটিস রোগের মূলে বহু ধরনের ভাইরাসকে দায়ী করা হয়। এই রোগ প্রধানতঃ শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। হার্পিস, কক্স্যাকী, পোলিও, ইকো প্রভৃতি ভাইরাস এই রোগের কারণ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলকাতায় অবস্থিত আই. ডি. হাসপাতাল থেকে কয়েকটি শিশুর মৃত্যুর পর তাদের মস্তিষ্ক থেকে কক্-স্যাকী ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে।

পোলিও ভাইরাসও মস্তিষ্কপ্রদাহের অন্যতম কারণ হলেও পক্ষাঘাতজনিত বিকলাঙ্গের জন্য একে দায়ী করা হয়ে থাকে। পোলিও একটি জলবাহিত রোগ। কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে পোলিও রোগের প্রাদুর্ভাব নেহাৎ কম নয়। শহর কলকাতায় পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা থাকলেও এর উপকণ্ঠে বহু নিম্নমানের বসতি ও কাঁচা নালা-নর্দমা থাকার জন্য এই শহরে পোলিও রোগের সংক্রমণ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। যত্রতত্র মলত্যাগের অভ্যাসের জন্য পোলিও ভাইরাস যা আক্রান্ত ব্যক্তির মলের মধ্যে থাকে, সেগুলি কোন-না-কোন সময়ে পানীয় জলকে দূষিত করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। এ ছাড়া কাটা ফল, সস্তার আইসক্রীম প্রভৃতির ব্যবসায় যারা লিপ্ত, তাদের স্বাস্থ্য-বিধির মান ও জ্ঞান আশাপ্রদ না হওয়ার জন্য এই সকল দ্রব্যের মাধ্যমে কলকাতা শহরে পোলিও রোগ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। দেহের মধ্যে ভাইরাস প্রবেশ করার পর সকলের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ না পেতেও পারে, কিন্তু যেসকল হতভাগ্য শিশু এর শিকার হয় তাদের সংখ্যা এই নগরীতে গড়ে বছরে প্রায় ৮০০ থেকে ২০০০, তার মধ্যে ৫ বছরের কম-বেশি বয়সীর সংখ্যা সর্বাধিক। এই রোগের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ও পরিণতি লক্ষ্য করে বেলেঘাটায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পোলিও হাসপাতাল স্থাপিত হয় ষাটের দশকে।

পোলিও রোগের পরেই যে-রোগ বেশ উদ্বেগজনক তার নাম ভাইরাস হেপাটাইটিস। পুরনো চিকিৎসা-বিজ্ঞান পত্রিকাগুলিতে কল-কাতায় ভাইরাস হেপাটাইটিস রোগের ব্যাপকতার উল্লেখ আছে। আগে ধারণা ছিল যে, এই রোগ প্রধানতঃ দূষিত জলের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। ক্ষুধামান্দ্য, ওপর পেটে ব্যথা ও বমিভাব দিয়ে শুরু হয়ে জ্বর ও তার সঙ্গে চোখ হলুদ বর্ণ—যাকে বলে ন্যাবা (Jaundice) ও তার সঙ্গে হলুদ বর্ণের প্রস্রাব এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভ করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে আরোগ্য লাভ না হলে রোগীর অবস্থা আরও অবনতির দিকে যায়। লিভার গ্রন্থির সংকোচন (cirrhosis of liver) অথবা লিভারের ক্যানসার পর্যন্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়। গত এক দশকের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উন্নত ধরনের রোগ-নির্ধারণ সরঞ্জাম (diagnostic kit) উদ্ভাবনের ফলে ভাইরাস হেপাটাইটিস সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। হেপাটাইটিস রোগের ভাইরাস-গুলিকে এখন চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। হেপাটাইটিস 'এ' বা ইনফেকশাস হেপাটাইটিস

যা দূষিত জল দ্বারা সংক্রামিত হয় ; হেপাটাইটিস 'বি' বা সেরাম হেপাটাইটিস আর এক শ্রেণীর ভাইরাস যা সংক্রামিত হয় রক্ত বা যৌন-ক্রিয়ার মাধ্যমে: তৃতীয় শ্রেণীর ভাইরাসগুলিকে এখনও সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা না গেলেও জানা গিয়েছে যে, এরা 'এ' বা 'বি' কোন শ্রেণীরই নয় ; তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'নন এ নন বি' হেপাটাইটিস। ইদানীং জানা গিয়েছে যে, এই 'নন এ নন বি' শ্রেণীর ভাইরাস আবার দুই ধরনের। এক ধরনের ভাইরাস হেপ্যাটাইটিস 'এ'-র মতোই ছড়ায় অর্থাৎ জলের মাধ্যমে ; এদের নাম দেওয়া হয়েছে হেপাটাইটিস 'ই'। 'নন এ নন বি' গোষ্ঠীর অপর ধরনের ভাইরাসটির সংক্রমণের ধারা ঠিক হেপাটাইটিস 'বি'-এর মতো ; এর নাম দেওয়া হয়েছে 'হেপাটাইটিস সি'। সর্বশেষ শ্রেণীর ভাইরাসটির নাম 'হেপাটাইটিস ডি'। এরা আলাদা করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে না, এরা 'হেপাটাইটিস বি' ভাইরাসের সাহায্যে রোগ সংক্রমণ করে থাকে। লক্ষণ দেখে কি ধরনের ভাইরাস জন্ডিস-এর কারণ তা বলা শক্ত ; তবে পরীক্ষার দ্বারা তা জানা যায়। রোগীর নিরাপত্তার দিক থেকে 'হেপাটাইটিস এ' শ্রেণীর রোগ থেকে নিরাময় অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং এতে মৃত্যুহার সবচেয়ে কম। 'নন এ নন বি' ও তার পরেই 'বি' শ্রেণীর ভাইরাস রোগ থেকে যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি থাকে , এর সঙ্গে 'ডি' ভাইরাস যুক্ত হলে দুশ্চিন্তা আরও বাড়ে।

রেবিস (Rabies) বা জলাতঙ্ক রোগ এই কলকাতায় এক আতঙ্ক-স্বরূপ। কারণ এই রোগের লক্ষণ যার মধ্যে দেখা দেয়, তার মৃত্যু অবধারিত। অতি প্রাচীন কাল থেকেই জলাতঙ্ক রোগের কথা শোনা যায়, তাই কলকাতা শহরের পত্তন থেকেই যে জলাতঙ্ক রোগ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। অনেক প্রকার প্রাণীর কামড় থেকে এই রোগ হওয়া সম্ভব হলেও কলকাতা শহরে জলাতঙ্ক রোগের প্রধান কারণ রেবিস-আক্রান্ত কুকুরের কামড়। কলকাতায় বেওয়ারিস কুকুরের সংখ্যা ঠিক কত তার সঠিক পরিসংখ্যান দিতে না পারলেও অনুমান করা যায় যে, ২০ থেকে ৩০ হাজারের কম তো নয়ই। মানুষের মধ্যে এই রোগের ভাইরাস কোন রেবিস রোগাক্রান্ত কুকুরে (প্রধাণতঃ রাস্তার কুকুরই) কামড় দেবার কয়েকদিন থেকে ৪।৫ সপ্তাহের মধ্যে রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। শ্বাসনালী ও অন্ননালীর সঙ্কোচন (tracheo-oesophageal spasm) যার ফলে তরল পদার্থ পান করার অসুবিধা (জলাতঙ্ক নাম এই থেকেই) ও পরে দেহের মধ্যে ঘনঘন খিঁচুনি (convulsion) ও জ্ঞান বিলুপ্ত এই রোগের প্রধান লক্ষণ। মৃত্যু এই রোগের পরিণতি।

দুঃখের বিষয়, জলাতঙ্ক একটি মারাত্মক রোগ জানা সত্ত্বেও কলকাতার রাস্তায় বেওয়ারিস কুকুরের ছড়াছড়ি এবং এই কুকুরগুলিকে ঠিক মতন আয়ত্তে না আনার জন্য সমস্যা আরও জটিল হয়ে রয়েছে। কলকাতা পৌর সংস্থায় কুকুর রাখার জন্য লাইসেন্স বাধ্যতামূলক, কিন্তু ঐ কুকুরের রেবিস রোগের টিকা দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কলকাতায় বিভিন্ন প্রাণীর কামড়ে রেবিস চিকিৎসার কেন্দ্রগুলিতে প্রতিবছর গড়ে প্রায় চব্বিশ হাজার থেকে একত্রিশ হাজার ব্যক্তি পরামর্শের জন্য আসেন এবং এই প্রাণীগুলির মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগই কুকুরের কামড়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ১·৫ লক্ষ বেওয়ারিস কুকুর ঘুরে বেড়ায়। গত পাঁচ বছরে বেলেঘাটা আই. ডি. হাসপাতালে গড়ে ১৪২ থেকে ১৮৭জন ব্যক্তি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয় ও শতকরা ১০০জনই মারা যায়। কলকাতায় কয়েকটি হাসপাতালে প্রাণীর কামড়ের ফলে রেবিসের টিকা দেবার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া টিসু কালচার টিকাও (প্রাণিকোষে প্রস্তুত) আজকাল পাওয়া যাচ্ছে যার প্রতিরোধ-শক্তি (immunity) বাড়ানোর ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি , কিন্তু এর দাম অত্যন্ত বেশি হওয়ার জন্য সাধারণ ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতার বাইরে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আন্ত্রিক রোগের (gastro enteritis) খবর পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতায়ও তা দেখা গিয়েছে। আন্ত্রিক রোগ বলতে আমরা বুঝি অন্ত্রের অসুখ যা বিভিন্ন

ধরনের ব্যাকটেরিয়া (কলেরা, ব্যাসিল্যারি ডিসেন্ট্রি ইত্যাদি) ও প্রোটজোয়া (অ্যামিবা) থেকে হয়ে থাকে। জলবাহিত এই সকল জীবাণু দেহে প্রবেশ করায় বারবার তরল দাস্ত হয়, তার সঙ্গে বমি ও পেটে খিঁচ ধরতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে এই অবস্থা চলতে থাকলে রোগীর দেহ থেকে অত্যধিক জল ও লবণজাত পদার্থ বেরিয়ে যায়। ফলে রোগীর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। ইদানীং জানা গিয়েছে যে, এই সকল আন্ত্রিক রোগের মূলে ভাইরাসের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রোটা নামে এক ধরনের ভাইরাস এই আন্ত্রিক রোগের কারণ হিসাবে জানা গিয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বছরে প্রায় ১৪ লক্ষ শিশু বিভিন্ন আন্ত্রিক রোগে মৃত্যুবরণ করে। তার মধ্যে শতকরা ২৫ শতাংশই রোটা ভাইরাস-জনিত। কলকাতার বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতাল ও বেলেঘাটা আই, ডি. হাসপাতালে ১৯৮২ ও ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে যথাক্রমে ১১৬ ও ২১৫ জন শিশুর মল পরীক্ষা করা হয় এবং তাদের মধ্যে অনেকের মলে রোটা ভাইরাস পাওয়া গিয়াছে। পরিশ্রুত জল ব্যবহার ও স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সচেতনতা রোটা ভাইরাসজনিত আন্ত্রিক রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

কলকাতার ভাইরাসের রোগের মানচিত্রে সর্বাধুনিক সংযোজন এইডস (AIDS)। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে এই মারাত্মক রোগ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই আমাদের কৌতূহল তথা সচেতনতা বেড়েছে। এখনো পর্যন্ত এই রোগ কলকাতায় তেমন সমস্যার সৃষ্টি না করলেও বৈজ্ঞানিকদের ধারণা উপযুক্ত সতর্কতা ও যথাযথ ব্যবস্থা এখনই না নিলে অদূরে ভবিষ্যতে এই রোগ দ্রুত এই শহরে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকজন যুবকের মধ্যে প্রথম এই রোগ দেখা দেবার পরই ঐ দেশের অন্য সকল প্রদেশে এবং ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এই রোগ ব্যাপকহারে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। এশিয়ার কয়েকটি দেশ যেমন জাপান, ভারত ও ইজরায়েলেও এই রোগ দেখা যাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার খতিয়ান থেকে ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে তা থেকে সারা বিশ্বে মোট এইডস-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৫৪,০৭৪জন; তার মধ্যে শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই এই সংখ্যা ১২৬,১২৭; আফ্রিকায় ৬৩,৮৪২, সমগ্র ইউরোপে ৩৩,৮৯৬ ও অস্ট্রেলিয়ায় ১৭৮৯ জন। ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত এইডস রোগীর সংখ্যা মাত্র ৪৪ হলেও রক্তে এইডস সংক্রমণের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে প্রায় ২০০০ লোকের। এইডস রোগ প্রসঙ্গে জনসাধারণের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিবেশনের প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ এই বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকলে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এইডস রোগের সম্ভাবনা যাদের মধ্যে বেশি (high risk group) তাঁরা হলেন: সমকামী পুরুষ (homosexuals), মাদকদ্রব্য সেবন-কারী বিশেষতঃ যারা এই সকল দ্রব্য বহুজনের ব্যবহৃত সিরিঞ্জের মাধ্যমে সেবন করার অভ্যাস রাখেন, বারবনিতা, এইডস-দূষিত রক্ত গ্রহণকারী বিশেষতঃ হিমোফিলিয়াক রোগী যাদের ঘন ঘন রক্ত বা রক্তের বিশেষ উপাদান (factor viii & ix) নিতে হয় এবং বিভিন্ন ধরনের যৌন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি। এই রোগের ভাইরাস দেহে প্রবেশ করার কয়েক মাস থেকে কয়েক বছরের মধ্যে রোগলক্ষণ দেখা যায় যার মধ্যে ঘুসঘুসে জ্বর, দ্রুত ওজন হ্রাস ও দুর্বলতা, রাত্রিকালীন ঘাম, বারবার তরল দাস্ত ইত্যাদি। এছাড়া রোগটির বিশেষত্ব এই যে, রোগীর রোগ প্রতি-রোধশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পায়, যার ফলে অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাকজাতীয় জীবাণু-সংক্রান্ত রোগের শিকার হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর অবধারিত মৃত্যু হয়। এই রোগের সহায়ক চিকিৎসা-ব্যবস্থা থাকলেও সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হবার জন্য কোন ওষুধ এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রচেষ্টায় জনগণকে এই রোগ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া খুবই প্রয়োজন।

গীতার বাণী চিরন্তনী

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

গীতার কথা—গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। নবমালিকা মুখোপাধ্যায়, 'শ্যামলী', সি-এস ১/৮ গল্ফ গ্রীন, কলকাতা-৭০০ ০৪৫। কুড়ি টাকা।

একথা সকলেই জানেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-সূচনার আগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশাবলীর দ্বারা মোহমুক্তি ঘটিয়ে ধর্মরক্ষার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তা-ই 'গীতা' নামে জগদ্বিখ্যাত। গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্ভুক্ত (২৫—৪২ অধ্যায়)। সুতরাং মহাভারত যত প্রাচীন, গীতাও তত প্রাচীন। ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনূদিত হওয়ায় গীতার বাণী আজ দেশ-দেশান্তরের অগণিত নরনারীর প্রাণের তন্ত্রীকে অনুরণিত করছে।

গীতা আপাতদৃষ্টিতে প্রাচীন যুগের দুটি পুরুষের মধ্যে সাধারণ কথোপকথনমাত্র। যদি সাধারণ কথোপকথনমাত্রই গীতা হতো তাহলে কি সহস্র সহস্র বছর ধরে এত বিপুলসংখ্যক নরনারীর কাছে তা এইভাবে আকর্ষণের বস্তু হয়ে থাকতে পারত? প্রশ্ন সেখানেই। উত্তর দিয়েছেন মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি ঃ

ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা॥

—চিরন্তন কালের নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, ক্ষুদ্রত্ব-মহত্ত্ব, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খতিয়ান হলো বেদ-উপনিষদ। বেদ-উপনিষদের সারমর্ম নিহিত আছে মহাভারতে এবং মহাভারতের নির্যাস বিধৃত রয়েছে গীতার মধ্যে। তাই গীতা হলো সর্বশাস্ত্রময়ী।

সেখানেই গীতার কালোত্তীর্ণতার রহস্য। গীতার বাণীকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা দুরূহ। তবে যদি একটিমাত্র বাক্যে গীতার মর্মবাণীকে প্রকাশ করতে বলা হয়, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল ভাষায় বলতে হয় ঃ দশবার 'গীতা' বললে যা হয় তা-ই গীতার সার। অর্থাৎ 'ত্যাগ'। ত্যাগই গীতার মর্মবাণী। ত্যাগের দ্বারাই মানুষ সকল অশান্তির ঊর্ধ্বে যেতে পারে, সকল দুঃখ জয় করতে পারে। 'ত্যাগ' অর্থে নেতিবাচক কিছু নয়। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন ঃ 'To conquer is to renounce''—ত্যাগ হলো জয়। কি জয়? মানুষের অন্তর-স্থিত ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, আবিলতা, লোভ, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, হিংসাকে জয়—বর্জন। যে-ব্যক্তি যত বড় 'ত্যাগী', সে তত বড় মানুষ। গীতার মধ্যে সেই ক্ষুদ্র আমিত্বকে ত্যাগ করে, বৃহৎ আমিত্বে—মহৎ আমিত্বে উত্তরণের নিত্য আহ্বানই জানিয়েছেন ভগবান। সেই অর্থে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষের মধ্যেই বিস্তৃত রয়েছে নিত্যকালের কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গন। ক্ষুদ্র আমিত্বে আচ্ছন্ন, মানবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার দ্বারা পরাভূত অর্জুন মানুষমাত্রেই—দেশে দেশে, কালে কালে। সেই অর্জুন যখন মনুষ্যত্বের যথার্থ মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে জগতের ধর্মরক্ষক হয়। এবং তা হয় কখন? যখন মানুষের অর্জুনরূপী মোহগ্রস্ত সত্তা মানুষের অপর সত্তা কৃষ্ণরূপী সারথির বাণীরূপ কশাঘাতে আপন-শক্তিতে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। সেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠার প্রথম শর্ত হলো, ভগবানের ভাষায়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং পরবর্তী শর্ত হলো আত্মশক্তির বিকাশ-সাধনে সর্বতোভাবে যত্নবান হওয়া।

বর্তমান বাংলার কৃষ্টিজগতের অন্যতম পুরোধা-ব্যক্তিত্ব ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় অসাধারণ পারঙ্গমতায় তাঁর নাতিবৃহৎ গ্রন্থ 'গীতার কথা'য় গীতার সেই চিরন্তনী বাণীর মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে গভীর ও শাশ্বত তত্ত্বগুলি উপস্থাপিত করেছেন, মণি-রত্নের মতো অমূল্য বাণীগুলিকে মালার মতো সুগ্রথিত করেছেন, অর্জুনের মাধ্যমে জগতের মানুষের কাছে জীবনের নানা সংগ্রামে সম্মুখীন হবার আদেশগুলি উচ্চারণ করেছেন—সে-সমস্তই ডঃ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে এই গ্রন্থে আমাদের উপহার দিয়েছেন। গ্রন্থটি পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছে শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা এই অনবদ্য উপস্থাপন সম্ভব নয়। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মণি-কাঞ্চন সংযোগ হয়েছে অনুভূতির, মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উদ্বোধন

গত ৮ জনু '৯০ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ **বাঙ্গালোর আশ্রমের আলসুর উপকেন্দ্রের** নবনির্মিত রামকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ১০৭ জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং বহু ভক্ত যোগদান করেন।

গত ৪ জুলাই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ **মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগরে** সেকেন্ড ম্যাডলে স্ট্রীটে অবস্থিত সারদা বিদ্যালয়ের ইংরেজী-মাধ্যম প্রাথমিক বিভাগের জন্য নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন।

পরিদর্শন

গত ২৬ মে মেঘালয়ের রাজ্যপাল মধুকর দীঘে, মুখ্যমন্ত্রী বি. বি. লিংদো ও শ্রমমন্ত্রী এ. পি. সোয়ের **চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন** পরিদর্শন করেন। গত ১৫ জুন অসমের রাজ্যপাল ডি. ডি. ঠাকুর, মিজোরামের রাজ্যপাল স্বরাজ কৌশল এবং জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি এস. এস. কাং এবং ২২ জুন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীলিংদো পুনরায় এই আশ্রম পরিদর্শন করেন।

গত ১১ জুলাই মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল কানওয়ার মামুদ আলি **নারায়ণপুর (মধ্যপ্রদেশ) আশ্রম** পরিদর্শন করেন এবং প্রস্তাবিত সংগ্রহশালা ভবনের শিলান্যাস করেন ও উপজাতি-অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে প্রদর্শনের জন্য 'ভিডিও-অন-হুইল'-এর উদ্বোধন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মধ্যপ্রদেশের উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী বলিরাম কাশ্যপ।

ছাত্র-কৃতিত্ব

আলং বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র শঙ্কর কুমার ইউনাইটেড স্কুলস অর্গানাইজেশন অব ইন্ডিয়া কর্তৃক অনুষ্ঠিত ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের ৩৭তম সর্বভারতীয় সাধারণজ্ঞান পরীক্ষায় (জুনিয়র গ্রুপ) প্রথম স্থান লাভ করেছে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশ ঝঞ্ঝাত্রাণ : বিশাখাপত্তনম আশ্রমের মাধ্যমে ঐ জেলার ইলামাঞ্চিলি ও রাম্বিল্লি মণ্ডলের ১৪টি ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত গ্রামের ২৪৩১টি পরিবারের মধ্যে ৫১১৮ কিলোঃ চাল, ২৫৬৫টি শাড়ি, ২৪৩৭টি ধুতি, ৩০০টি চাদর, ৫০২টি বিছানার চাদর, ৮২৮৬টি বিভিন্ন রকমের কাপড়-চোপড়, ১০০২ সেট বাসনপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

রাজমন্দ্রী আশ্রমের মাধ্যমে গুন্টুর জেলার রাপালে মণ্ডলের ৭টি গ্রামের ৩০৩৩৪টি পরিবারকে ৭৫০ কিলোঃ আলু, ৫০০ কিলোঃ পেঁয়াজ, ৫৫০ সেট অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র, ২৮৮৪টি ধুতি, ২৯৭১টি শাড়ি ও ৩৬৩২টি বিভিন্ন রকম পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্বাসন : ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশাখাপত্তনম জেলার ইলামঞ্চিলি মণ্ডলের কোঠাপালেম গ্রামে পাকাবাড়ি নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। গত ১৬ জুলাই এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল কৃষ্ণকান্ত। প্রথম দফায় এই গ্রামের জন্য ৮৫টি বাড়ি তৈরি হবে।

গুন্টুর জেলার রাপালে মণ্ডলের আদিবিপালেমে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সেখানে একটি কমিউনিটি হল-সহ আশ্রয়-গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ পুনর্বাসন : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের মালকান গুমটিতে বিদ্যালয় সহ আশ্রয়-গৃহের দ্বিতলের ছাদঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে।

বাংলাদেশ পুনর্বাসন : ঢাকা আশ্রমের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলার সাতুরিয়া ও ধামরাই মহকুমার ২৪টি গ্রামের ৪২৪টি পরিবারকে ৪২৪টি নতুন বাড়ি (বাড়িগুলির অর্ধেকাংশ পাকা), সমসংখ্যক পায়খানা এবং উন্নতমানের উনুন ও রান্নার সাজসরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে।

বহির্ভারত

বাকিংহামশায়ার বেদান্ত সেন্টার (ইংল্যান্ড)-এর প্রধান স্বামী ভব্যানন্দ গত জানুয়ারি মাসে এক সপ্তাহের জন্য এথেন্স গিয়েছিলেন সেখানকার ভক্তবৃন্দের আমন্ত্রণে। সেখানে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় ধ্যান পরিচালনা ও ধর্মালোচনা করেছেন। ঐ সময় স্থানীয় যোগ সেন্টারের উদ্যোগে এক সপ্তাহের সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সেখানেও যোগদান করেছিলেন।

সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি (উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া): গত মে মাসের রবিবার ও বুধবারগুলিতে যথারীতি ধর্মীয় আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া ১২ মে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা এবং ১৯ মে ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান হয়েছে। 'জয় মা মিউজিক কনসার্ট' নামে একটি সঙ্গীত দলের সদস্যবৃন্দ গত ৯ মে সোসাইটির পুরনো মন্দিরে যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেছে।

বেদান্ত সোসাইটির পরিচালনায় ওলেমা-তে গত ২৬ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত একটি সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ মে সকালে এই সাধন-শিবিরে ভাষণ দিয়েছেন ধর্ম ও দর্শনের অধ্যাপক ফিলিপ নভক এবং বিকালে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী অপর্ণানন্দ। তাছাড়া প্রতিদিন স্তোত্রপাঠ, ধ্যান, পূজানুষ্ঠানাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটি: জুলাই মাসের রবিবারগুলিতে ধর্মপ্রসঙ্গ করেছেন স্বামী সর্বগতানন্দ এবং স্বামী ভাস্করানন্দ।

নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি: জুন মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রতি মঙ্গলবারে গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠ এবং প্রতি শুক্রবারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ওপর আলোচনা করেছেন স্বামী তথাগতানন্দ। তাছাড়া প্রতি শনিবার ও রবিবার সন্ধ্যায় সমবেত ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে। ৩ জুন অতিথি-বক্তা রাবাই আশার রুক 'দি ওয়ান গড' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সেন্টার: জুন মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এবং প্রতি শুক্রবার কঠ উপনিষদ্ ও প্রতি মঙ্গলবার 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

পরিদর্শন

ভারত সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী মনোভাই কোটাড়িয়া গত ২১ জুন **ঢাকা আশ্রম** পরিদর্শন করেন।

গত ২৪ জুন **সিঙ্গাপুর আশ্রমের** বার্ষিক উৎসবে স্বামী বিবেকানন্দের 'শিকাগো বক্তৃতা'-র চৈনিক অনুবাদ প্রকাশ করেন সিঙ্গাপুরের সাংসদ পে চিন হুয়া।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথিপালন

গত ২০ জুলাই শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ; ৬ আগস্ট শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁর জীবনী এবং ১৩ আগস্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে তাঁর জন্মলীলা আলোচনা করেন স্বামী গর্গানন্দ এবং ১৯ আগস্ট শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, অন্যান্য শুক্রবার স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ স্বামী-শিষ্য-সংবাদ এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

গত ৭ ও ৮ এপ্রিল '৯০ **পশ্চিম রাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে** (কলকাতা-৩২) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য চক্রবর্তী ও সম্প্রদায় কর্তৃক রামায়ণ গান (রাবণবধ পর্ব) অনুষ্ঠিত হয়। ৮ এপ্রিল ছিল মূল উৎসব। এদিন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বাস্তুতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, অনির্বাণ ও স্বাধীন মণিমেলা, যাদবপুর অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল ও যাদবপুর অখণ্ডমণ্ডলীর সভ্য-সভ্যা ও ভক্তগণ সমবেত সংকীর্তন ও শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ ও আলোচনা ও ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের অঙ্গ। সর্বমোট ১২০০জন ভক্ত প্রসাদ পান। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দ, প্রধান অতিথি ছিলেন দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী। রবীন ভট্টাচার্য ও স্বপ্না দাস ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

গত ১৩ মে **বিরাটী নবাদর্শ রামকৃষ্ণ কুটিরে**—ভোর ৪টা থেকে মঙ্গলারতি, বৈদিক স্তোত্র, ভজন, চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, আরাত্রিক প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল ৯টা থেকে কমিউনিটি হলে বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী। মধ্যাহ্নে বহু ভক্ত নরনারী, ছাত্র-ছাত্রী ও দরিদ্র নারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে স্বামী ভবেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দান করেন স্বামী গিরিজাত্মানন্দ। এই অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী বিষয়ক পুস্তক, ২০জন দুঃস্থ নরনারীকে ধুতি, শাড়ি ও স্থানীয় রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের ১১জন দুঃস্থা ছাত্রীকে বিদ্যালয়ের পোশাক দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র-বৃন্দ "গল্পে ও গানে শ্রীরামকৃষ্ণ" গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে।

ফালাকাটা (জলপাইগুড়ি) **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে** গত ৫ ও ৬ মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম জন্মোৎসব ও আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাত-ফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিমূলক গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা, ভক্তসম্মেলন ও সঙ্গীতাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল, উভয় দিনই মধ্যাহ্নে বহু ভক্ত নরনারী বসে প্রসাদ পান। স্বামী নিবৃত্তানন্দ ও স্বামী রামেশ্বরানন্দ উভয় দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। উভয় দিনের ধর্মসভায় সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় ও নীরদবরণ রায়। উভয় দিনেই বহু ভক্তের সমাবেশ হয়েছিল। অনুষ্ঠানে আলিপুর-দুয়ারের রঞ্জিত ঘোষ ও সম্প্রদায় ভক্তিমূলক লীলা-গীতি পরিবেশন করেন।

গত ৫—৯মে পাঁচদিন ব্যাপী মেদিনীপুরের **হরেকৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিলনমন্দিরে** শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মর্মর মূর্তির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে পূজাপাঠ, শোভাযাত্রা, ভজন-সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং যুবসম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন দিনে ধর্মসভায় আলোচনায় অংশ নেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দ, ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, স্বামী গোপেশানন্দ, স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী ঈশাত্মানন্দ, স্বামী অরূপানন্দ, স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী একরূপানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ এবং স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ। শেষের দুইদিন সন্ধ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার সংঘ' 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ও 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গীতিনাট্য পরিবেশন করে। গ্রন্থনা ও সঙ্গীতে অংশ নেন নটরাজ চ্যাটার্জী ও শংকর সোম।

গত ৬ ও ৭ মে **বর্ধমান জেলার পূতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের** উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথমদিন ধর্মসভা, ভক্তিগীতি, ভি. ডি. ও.

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ছায়াচিত্র** প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজো, হোম, পাঠ, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রায় দেড় হাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। প্রথম দিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন কালীকিঙ্কর চৌধুরী, বক্তব্য রাখেন জ্যোৎস্না চৌধুরী এবং স্বামী সচ্চিদানন্দ। দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী পুরাণানন্দ, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী প্রেমরূপানন্দ; বক্তব্য রাখেন স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী গিরিজাত্মানন্দ ও স্বামী নির্লিপ্তানন্দ। সন্ধ্যার পর দুটি গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে গীতিনাট্য পরিবেশন করে বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রবৃন্দ ও পরে সঞ্জিত দাস ও সম্প্রদায়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় **ইছাপুর (হুগলি) শ্রীরামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণানন্দ আশ্রমে** গত ২৭ মে ১৯৯০ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের (শশী মহারাজের) জন্মস্থানে এক বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দ, সহঃ সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ এবং কামারপুকুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যুষে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রতিকৃতি সহ প্রভাতফেরিতে সমগ্র ইছাপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষ যোগদান করেন। পরে স্বামী দেবদেবানন্দ পূজো ও হোম পরিচালনা করেন। মধ্যাহ্নে ইছাপুর ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের সহস্রাধিক ভক্ত প্রসাদ পান। বিকালে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় স্বামী গহনানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ এবং স্বামী দেবদেবানন্দ রামকৃষ্ণানন্দের জীবনী ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা বিষয়ে ভাষণ দান করেন। উল্লেখ্য যে, এই বাৎসরিক উৎসব গত প্রায় পনের বছর যাবৎ ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-রামকৃষ্ণানন্দ আশ্রমের দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আশ্রম একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় এবং দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য একটি অবৈতনিক কোচিং ক্লাসও পরিচালনা করেন।

নিবেদিতা পুরস্কার

গত ২৯ এপ্রিল **হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে** নিবেদিতা পুরস্কার প্রদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। শিল্পীকে বই, ফলক ও অর্থমূল্যে পুরস্কার দেওয়া হয়। ফলকটি নির্মাণ করেন শিল্পী অধ্যাপক নিত্যানন্দ ভকত। শিল্পীর হাতে পুরস্কার অর্পণ করেন উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। বিকাশ ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা এবং তাঁর ব্যক্তিজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার প্রভাবের কথা বলেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষে ভগিনী নিবেদিতার অবদান এবং ভারতীয় শিল্পীদের উপর তাঁর প্রভাবের কথা বলেন। এইসঙ্গে তিরিশজন শিশুশিল্পীকে নিবেদিতার নামাঙ্কিত পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ডঃ নিমাই-সাধন বসু, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়। সভায় হাওড়া শহরের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ও শিল্পী এবং বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **অনিলচন্দ্র দত্তগুপ্ত** গত ১৮ এপ্রিল ১৯৯০ বিকাল ৫টা ৫৫ মিঃ তাঁর বেহালাস্থ বাসভবনে করজপরত অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে বেলুড় মঠে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী হীরাবতী দত্তগুপ্ত দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) ঢাকার নিকটস্থ সাতগ্রামে। বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসিটি সোসাইটির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা (১৯৩৭ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন উদ্বোধন পত্রিকার একজন আজীবন গ্রাহক। শেষ বয়সে শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিজে না পারলেও বেলুড় মঠ, মায়ের বাড়ী, নরেন্দ্রপুর প্রভৃতি মঠ-মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে স্ত্রী ও কনিষ্ঠা কন্যার মাধ্যমে তিনি আমৃত্যু ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেছেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

বহুপ্রচলিত পানমশলা

বর্তমানে ভারতবর্ষে পানমশলা চিবানোর অভ্যাস প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। আন্দাজে বলা যেতে পারে যে, দেশে প্রায় দুই কোটি লোক এখন পানমশলা ব্যবহারে অভ্যস্ত। এদের সংখ্যা ধূমপানকারীদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। রাজ্য অনুযায়ী ভাগ করলে—গুজরাটে ৩ শতাংশ লোক তামাক দেওয়া মশলা ও ১·৫ শতাংশ লোক তামাকবিহীন মশলা ব্যবহার করে; কেরালাতে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ২৬ ও ০·৪, অন্ধ্রপ্রদেশে ২·৩ ও ০·৫; বিহারে ১৩ ও ০·৪; মহারাষ্ট্রে ২৮ ও ০·৬। পান খাবার জন্য মশলা তৈরি করতে লোকের অনেকটা সময় ও অনেক রকম উপাদান লাগে। সেজন্য কয়েকটি সংস্থা দেশীয় প্রথা অনুসরণ করে তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য এটি তৈরি করে ছোট প্যাকেটে বাজারে চালু করেছে। এতে পান ছাড়া পান খাবার জন্য আনুষঙ্গিক সবই আছে। এ খেতে বেশি চিবুতে হয় না। বিজ্ঞাপনের জোরে পানমশলা ভারতে ও তৃতীয়-বিশ্বের দেশগুলিতে খুব চালু হয়ে গিয়েছে। ফলে বছরে ৩০০ কোটি টাকার বেশি পান-মশলা বিক্রি হয়। ছেলে-বুড়ো সকলেই পানমশলা ভালবাসে। মধ্যপ্রাচ্যে ও দূর প্রাচ্যে বর্তমানে পানমশলা ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানি হয়।

ভারতে এখন কুড়িরও বেশি কোম্পানির তৈরি পানমশলা পাওয়া যায়। কোন-কোনটি খেতে মিষ্টি, কোনটিতে মিষ্টি নেই। মোটামুটিভাবে পান-মশলাতে আছে :

	সাদা মশলা (%)	মিঠা মশলা (%)
সুপারি	৮০	১০
শুকনো খেজুর	—	৭০
খয়ের	১০	১০
চুন	১	১
অন্যান্য মশলা (এলাচ, দারচিনি, মেন্থল, জৈত্রী প্রভৃতি)	৯	৯

যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শুকনো খেজুর দিয়ে মিষ্টি করা হয়, তবে কোন-কোনটিতে মিষ্টি করবার জন্য স্যাকারিনও ব্যবহার করা হয়। একশ গ্রাম সুপারিতে আছে—প্রোটিন ৫—৯ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট (শর্করা জাতীয়)—৪৪—৪৭ গ্রাম, ধাতু—ক্যাল-সিয়াম, ফসফরাস, লোহা; ভিটামিন—ক্যারোটিন; ট্যানিন—১১—২৬ মিলিগ্রাম; কয়েক প্রকার অ্যাল-কালয়েড (ক্ষারীয় পদার্থ) ১৫০—৬৭০ মিলিগ্রাম। অ্যালক্যালয়েডগুলির মধ্যে অ্যারিকোলিন (are-coline) উল্লেখযোগ্য, কারণ এর বিষাক্ত ক্রিয়া আছে; এটি প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুশিরাকে উত্তেজিত করে, মুখে লালা নিঃসরণ করায়, এবং ঘাম নির্গত করে; বেশি মাত্রায় এটি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুশিরাকে দমন করে এবং দাঁতের এনামেল নষ্ট করে।

তামাক সমেত সুপারি খেলে যে ক্যানসার হতে পারে তা প্রমাণিত হয়েছে। তামাকবিহীন সুপারি খেলে ক্যানসার হয় কিনা তা ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। ইঁদুরের ওপর গবেষণার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, খয়েরের জীবকোষের মধ্যে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা আছে। মুখে ঠাণ্ডার ভাব আনার জন্য মেন্থল যোগ করা হয়। মেন্থল খেতে খেতে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। তবে লজেন্স এ এবং নানা খাবারে এখন মেন্থল ব্যবহৃত হয়। একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে বেশি পরিমাণে পানমশলা খেলে মুখের জীবকোষে ক্যানসারজাতীয় কিছু কিছু পরিবর্তন হতে পারে; তবে ক্যানসার হয় বলে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি এখনো পর্যন্ত।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। স্যাকারিনের মূত্রাশয়ে (urinary bladder) ক্যানসার করার ক্ষমতা আছে—এই ধরনের কিছু কিছু প্রমাণ অন্যত্র পাওয়া গিয়েছে।

সিগারেট সম্বন্ধে যেমন সতর্কবার্তা প্রচারিত হয়, পানমশলা সম্বন্ধে সেরূপ করা, প্রতিদিন এক প্যাকেটের কম পানমশলা ব্যবহার করা, সুপারি বাদ দিয়ে পানমশলা তৈরি করা—এই সব বিষয়ে বিবেচনা করা জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

[Nutrition News, November—1989]

I shall give you directions for business. You will find that in five years you will get together a lot of money. ... What are you doing? Even after learning so much, you go about the doors of others, crying, "Give me employment". Trampled under others' feet, doing slavery for others, are you men any more?... A nation that cannot provide for its simple food and clothing, which always depends on others for its subsistence—what is there for it to vaunt about? Throw your religious observances overboard for the present and first prepared for the struggle for existence. ...The people of foreign countries import Indian raw goods, manufacture various commodities by bringing their intelligence to bear upon them, and become great; whereas you have locked up your intelligence thrown away your inherited wealth to others, and roam about crying piteously for food!

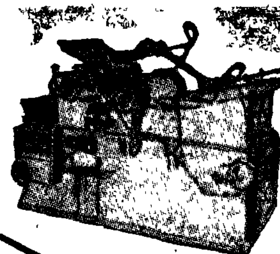
Swami Vivekananda

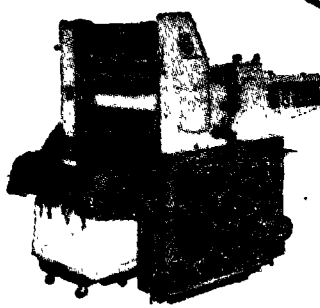
গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা। ···লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক। ···যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন ভাল কাজের জন্য দেহত্যাগই শ্রেয়।

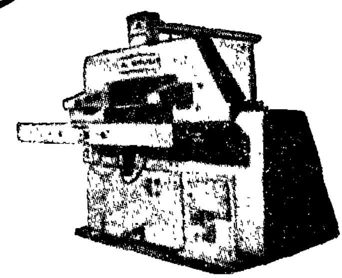
স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক এই বাণী।

শ্রীপুরুষোত্তম চট্টোপাধ্যায়









Doing good to others out of compassion is good, but the seva (service) of all beings in the spirit of the Lord is better.

Swami Vivekananda

Be not a traitor to your thoughts. Be sincere; act accoridng to your thoughts; and you shall surely succeed.

Sri Ramakrishna

One who has a pure mind, considers everyone pure.

Holy Mother Saradadevi

Purity, patience, and perseverance are the three essentials to success, and above all, love

Swami Vivekananda

Fill the mind with the highest thoughts, hear them day after day, think them month after month. The ideal of man is to see God in everything. But if you cannot see Him in everything, see Him in one thing, in that thing which you like best, and then see Him in another. So on you can go.

Swami Vivekananda


কেন পরশ ডি.এ.পি.
সব রকম ফসলের জন্য
শ্রেষ্ঠ মূল সার
১ শক্তিশালী পরশ (১৮ : ৪৬) সারে আছে ৬৪% পুষ্টি যা অন্য কোন সার দিতে পারে না।
২ পরশে নাইট্রোজেনের তুলনায় ফসফেট ২১/২ গুণ বেশি আছে। তাই পরশ সার মূল সার।
৩ প্রতি ব্যাগ পরশ সার ৩ ব্যাগ সুপার ফসফেট ও ১ ব্যাগ অ্যামোনিয়াম সালফেটের প্রায় সমান শক্তিশালী। তাই ব্যবহারে সাশ্রয় বেশী।
৪ ... ছড়িয়ে পড়ে। তাই সেচের অভাব বা অনাবৃষ্টিতেও চারা মাটি থেকে জল টেনে নিতে পারে।
৫ পরশের অ্যামোনিয়াকাল নাইট্রোজেন জমির মধ্যে মিশে গিয়ে চারাকে সরাসরি পুষ্টি দেয়। তাই খরিফ মরশুমেও পরশ সার দারুণ কাজ দেয়।
DAP
সঠিক ওজন
পরশ
ডি.এ.পি. সার (১৮:৪৬)

"যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।"

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

Wherein is the strength of a devotee ? He is a child of God, and his devotional tears are his mightiest weapon

Sri Ramakrishna

There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing.

Swami Vivekananda

একটি ভাব লইয়া উহাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত কর, শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বদা উহাই চিন্তা করিতে থাক। ঐ ভাব অনুযায়ী জীবনযাপন কর।

স্বামী বিবেকানন্দ

যদি ভারতের ইতিহাস পড়ো, তবে দেখবে—এখানে বরাবরই নিম্নজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা হয়েছে। অনেক জাতিকে উন্নত করা হয়েছেও। আরও অনেক হবে। শেষে সকলেই ব্রাহ্মণ হবে। ...কাকেও নামাতে হবে না—সকলকে ওঠাতে হবে। ...ইউরোপ আমেরিকার জাতি-বিভাগের চেয়ে ভারতের জাতি-বিভাগ অনেক ভাল। ...ভারতীয় সমাজ স্থিতিশীল কবে দেখছ? এসমাজ সর্বদাই গতিশীল।

* * *

জাতিভেদের বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শক্তির কারণস্বরূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা; তাহা যদি করিতে পারো, তবে তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা পাইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

Purity, Patience and perseverence are the three essentials to success and above all, love.

Swami Vivekananda.

One who has a pure mind, considers everyone pure.

Sri Sri Ma Sarada Devi.

Be not a traitor to your thoughts Be sincere; act according to your thoughts; and you shall surely succeed.

Sri Ramakrishna.

ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে। ঠাকুরের কাছে যা চাইবে তাই পাবে।

শ্রীমা সারদাদেবী

All beings long for happyness ; therefore extend thy compassion to all.

The Buddha

সর্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করতে চেষ্টা কর।

স্বামী বিবেকানন্দ

এই জীবন ক্ষণ-ভঙ্গুর, জগতের ধন, মান, ঐশ্বর্য—সকলই ক্ষণ-স্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

......ওঠ, সাহসী হও, বীর্যবান হও। সব দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ কর—জানিয়া রাখো, তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা। তুমি যে শক্তি বা সহায়তা চাও, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

The vision of God depends on His grace. Still a man must work a little with longing for God in his heart. If he has longing he will receive the grace of God.

Sri Ramakrishna

He who has a pure mind sees everything pure.

Sri Ma Sarada Devi

Go to hell yourself to buy salvation for others. There is no Mukti on earth to call my own

Swami Vivekananda

যখনই কোন সুখভোগ করবে, তারপর দুঃখ আসবেই আসবে—এই দুঃখ তখন তখনই আসতে পারে, অথবা খুব বিলম্বেও আসতে পারে। যে আত্মা যত উন্নত, তার সুখের পর দুঃখ তত শীঘ্র আসবে। আমরা যা চাই, তা সুখও নয়, দুঃখও নয়। এ উভয়ই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়ে দেয়। উভয়ই শিকল—একটি লোহার শিকল, অপরটা সোনার শিকল। এ উভয়ের পশ্চাতেই আত্মা রয়েছেন—তাঁতে সুখও নেই, দুঃখও নেই। সুখ-দুঃখ উভয়ই অবস্থা বিশেষ, আর অবস্থা মাত্রেই সদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু আত্মা আনন্দস্বরূপ, অপরিণামী, শান্তিস্বরূপ। আত্মাকে যে আমাদের লাভ করতে হবে, তা নয় : আত্মাকে আমরা পেয়েই আছি : কেবল তাঁর উপর যে ময়লা পড়েছে, সেটি ধুয়ে ফেলে তাঁকে দর্শন কর।

স্বামী বিবেকানন্দ

যাহা ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না, তাহাকেই আমাদের যথার্থ প্রয়োজন বা অভাব বলা যায়; হয় আমাদের উহা পাইতে হইবে, নতুবা মরিব। যখন এমন সময় আসিবে যে, আমরা ভগবানের জন্যও ঐরূপ অভাব বোধ করিব, ...তখন আমরা ভক্ত হইতে পারিব।

স্বামী বিবেকানন্দ

Love never fails, my son; today or tomorrow or ages after, truth will conquer! Love shall win the victory.

Swami Vivekananda

Renunciation and the performance of selfless action both lead to the Highest Good, but of the two, the performance of selfless action is superior to the renunciation of action.

Bhagwan Sri Krishna

Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits.

Jesus Christ

Religion is not in doctrines, in dogmas, nor in intellectual argumentation ; it is being and becoming ; it is realisation.

Swami Vivekananda

If the woman be old, regard her as your mother, if young, as your sister, if very young, as your child.

Bhagawan Sri Buddha

ধ্যান না হয়, জপ করবে। "জপাৎ সিদ্ধি।"
জপ করলেই সিদ্ধিলাভ করবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

This mind becomes pure through much spiritual discipline.

Sri Sri Ma Sarada Devi

With best compliments from :

PANJA VALVE MFG. CO.

KHAPUR ROAD (CANAL SIDE)

P. O. SANTRAGACHI, HOWRAH-711 104, (W.B.).

দাস তোমা দোঁহাকার
সশক্তিক নমি তব পদে

TRANSELECTRICALS

2/3 E, KEYATALA ROAD, CALCUTTA-700 029

Manufacturer of all types of High Voltage Isolator.
Approved supplier to Indian Railways for 25 KV to 132 KV Isolators

Phone : 46-6832, 42-7164

With best compliments from :

Vedan Automotives (P) Ltd.

138, G. T. Road, Howrah-711 101.

Dealers of : Bajaj two wheelers and three wheelers and
Light Commercial Vehicles Eicher Mitsubishi

Let New India rise—out of the peasant's cottage, grasping the plough; out of the huts of the fisherman, the cobbler and the sweeper.

Swami Vivekananda

With best compliments from :

M/s. Precision Engineering Services

Mechanical & Electrical Engineers and Govt. Contractors.

3, Mangoe Lane, Calcutta-700 001.

Phone : 20-8065

I do not believe in a religion or God which cannot wipe the widow's tears or bring a piece of bread to the orphan's mouth.

Swami Vivekananda

AN ACKNOWLEDGEMENT

SRI & SMT. MANJU RAY TAKE THIS PRIVILEGE
IN EXPRESSING THEIR PROFOUND GRATITUDE
TO SRI JIBAN KRISHNA BHOWMIK OF
47-B, BOSE PARA LANE, CALCUTTA-700 003
FOR THE "RAMAKRISHNA INSPIRATION" KINDLED IN THEM BY WAY OF CELEBRATING "GURU PURNIMA" EVERY YEAR.
MAY GOD GIVE US THE MIGHT TO FOLLOW THE FOOT-PRINTS LEFT BEHIND HIM IN THE FIELD OF SPIRITUAL ACTIVITY.

Each soul is Potentially divine.

The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal.

Do this either by work or worship or Psychic control, or Philosophy—by one or more, or all of these—and be free.

This is the whole of religion. Doctrines or dogmas, or rituals or books, or temples or forms, are but secondary details.

Swami Vivekananda

O Siva ! O Pasupati ! O Thou the Lord of Parvati ! Kindly rescue me, helpless as I am, from the trackless forest of this miserable world.

Sri Sankara

নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে? ভবনদী পার হতে জানাই দরকার। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। ঈশ্বরকে ভালবাসা—এইটি জীবনের উদ্দেশ্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ছেলেদের কল্যাণের জন্য আমি সব করতে পারি। আমার আশীর্বাদ সকলের উপর আছে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

তিনি যখন শূদ্রের গলায় ব্রাহ্মণের পৈতে ঝুলিয়ে দিয়ে ভাঙ্গী, মুসলমানের হাতে অন্ন গ্রহণ করে জাতিহীন, বর্ণহীন, শ্রেণীহীন, সম্প্রদায়হীন এক মহান, বৃহৎ সম্মিলিত ভারতবর্ষের আদর্শ তুলে ধরেন তখন বিস্ময়ে বিমূঢ় আমরা তাকিয়ে দেখি সেখানে দণ্ডায়মান মহানকবি বিবেকানন্দ।

আবেদন

কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল পূর্বে ভাঙ্গড় থানার সন্নিকটে গঙ্গা ও বিদ্যাধরী নদীর সংযোগকারী জলাধারের তীরে শ্মশান সংলগ্ন মনোরম নির্জন পরিবেশে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে উৎসর্গীকৃত একটি আশ্রম পরিচালনা করেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ।

আশ্রম পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য একটি হলঘর, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের অসম্পূর্ণ বারান্দা, পানীয় জলের জন্য একটি নলকূপ এবং একটি সাধুনিবাসের জন্য আনুমানিক এক লক্ষ টাকার আশু প্রয়োজন।

সহৃদয় দেশবাসী এবং ভক্তজনের নিকট আমরা আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি।

সভাপতি
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ, ভাঙ্গড়
ডাকঘর ঃ ভাঙ্গড়, জেলা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা,
পঃ বঙ্গ, পিন ৭৪৩৫০২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ
ভাঙ্গড়
রেজিস্টার্ড (এস/৬৩৩৩০)

Without the will of God nothing ever happens. Even a blade of grass will not stir unless He wills it.

Holy Mother Sri Sarada Devi

Doing good to others out of compassion is good, but the seva (Service) of all beings in the spirit of the Lord is better.

Swami Vivekananda

Believe me, there is much talking in other lands, but the practical man of religion, who has carried it into his life is here and here alone.

Swami Vivekananda

You can safely walk upon thorns with your shoes on ; shoed with spiritual knowledge you can as safely roam over this thorny world

Sri Ramakrishna

A perfect Muslim is he from whose tongue and hands mankind is safe, and a Muhajir is he who fleeth what God hath forbidden

Prophet Muhammad

Hatreds never cease by hatreds in this world. By love alone they cease. This is an ancient law.

Bhagawan Buddha

Neither by yoga, nor by Sankhya, nor by work, nor by learning, but by the realization of one's identity with Brahman is liberation possible, and by no other means.

Sri Sankara

Any expansion is life, all contraction is death. All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life He who loves lives, he who is selfish is dying Therefore, love for love's sake Because, it is the only law of life.

Swami Vivekananda

Truth, purity and unselfishness—wherever these are present, there is no power below or above the sun to crush the possessor thereof. Equipped with these, one individual is able to face the whole universe in opposition

Swami Vivekananda

সংসারে থাকতে গেলে কেমন করে থাকতে হয় জান? যেখানে যেমন, সেখানে তেমন; যাকে যেমন, তাকে তেমন; যখন যেমন, তখন তেমন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

Work on as if on each of you depend the whole work. Fifty centuries are looking on you, the future of India depends on you. Work on

Swami Vivekananda

Never talk about the faults of others, no matter how bad they may be. Nothing is ever gained by that. You never help one by telling about his faults, but you do him an injury, and injure yourself as well.

Swami Vivekananda

Women must be in a position to solve their own problems in their own way. No one can or ought to do this for them. And our Indian women are as capable of doing it as any in the world.

Swami Vivekananda

Leave aside your thoughts of poverty ! In what respects are you poor ? Do you feel regret because you have not a coach and a pair, or a retinue of servants at your back and call ? What of that ? You little know how you can have nothing undone in life if you labour day and night for others with your heart's blood.

Swami Vivekananda

To succeed, you must have tremendous perseverance, tremendous will. "I will drink the ocean," says the persevering soul; "at my will mountains will crumble up." Have that sort of energy, that sort of will; work hard, and you will reach the goal.

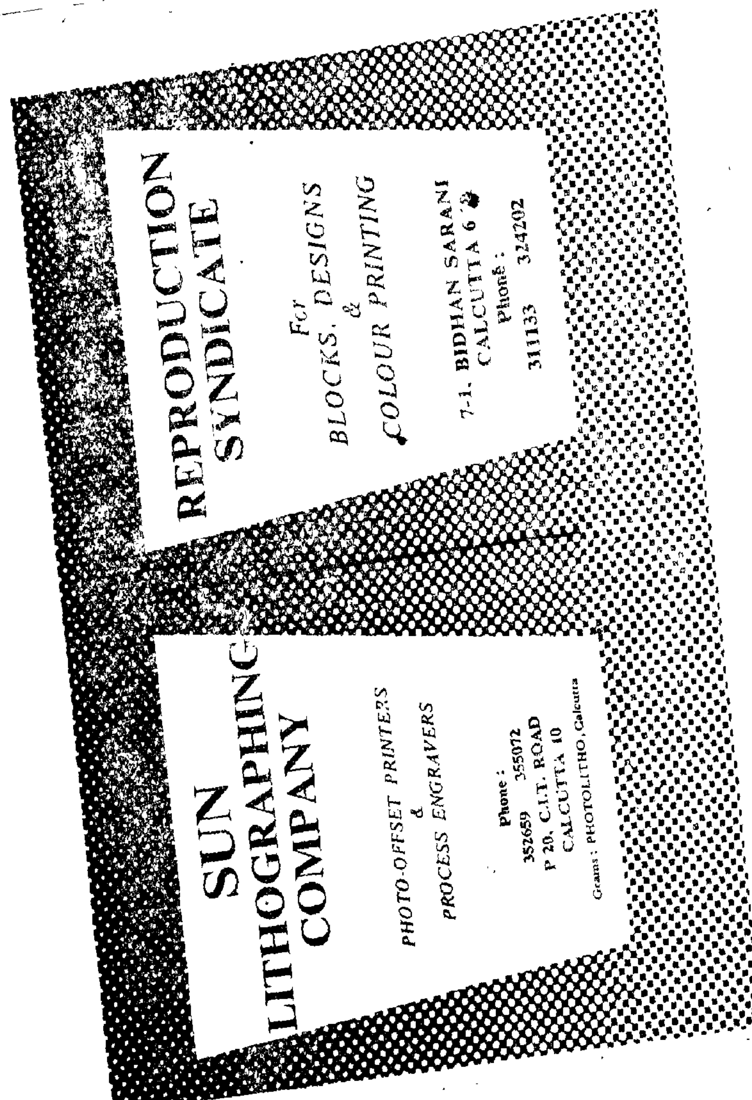
Swami Vivekananda

Man is always forgetful of God. So, whenever necessity arises, He incarnates Himself and shows the way by means of His own spiritual practices. This time He has set up the ideal of renunciation.

Sri Sri Sarada Devi

In the world take always the position of the giver. Give everything and look for no return. Give love, give help, give service, give any little thing you can, but keep out barter. Make no conditions and none will be imposed. Let us give out of our own bounty, just as God gives to us.

Swami Vivekananda


REPRODUCTION SYNDICATE
For BLOCKS, DESIGNS & COLOUR PRINTING
7-1, BIDHAN SARANI
CALCUTTA 6
Phone :
311133 324202
SUN LITHOGRAPHING COMPANY
PHOTO-OFFSET PRINTERS & PROCESS ENGRAVERS
Phone :
352659 355072
P 20, C.I.T. ROAD
CALCUTTA 10
Grams : PHOTOLITHO, Calcutta